মাওলানা আসেম ওমর

ইসলাম ও গণতন্ত্র

মাওলানা আবুজারীর আবদুল ওয়াদুদ অনূদিত

আবাবিল প্রকাশন

১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

ইসলাম ও গণতন্ত্র

মাওলানা আসেম ওমর

প্রকাশনায়

আবাবিল প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ

নভেম্বর ২০১৪

প্রচ্ছদ

হা-মীম কেফায়েত

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস

২৬/২ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০ টাকা

ISBN : 984-70160-0113-7

ISLAM O GONOTONTRO : Mawlana Asem Omar, **Published by :**

ABABIL PROKASHON : 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100

First Edition : November 2014 © by the publisher

Price : 200 Taka only

অনুবাদকের কথা

১. আলহামদুলিল্লাহ! 'ইসলাম ও গণতন্ত্র' এখন আপনাদের হাতে। বইটি পাকিস্তানের বিখ্যাত আলেমেদ্বীন হযরত মাওলানা আসেম ওমর দামাত বারাকাতুহুমের 'আদয়ান কি জঙ্গ : দ্বীনে ইসলাম ইয়া দ্বীনে জমহুরিয়্যাত' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। আল্লাহর হাজার শোকর, যিনি আমাকে দ্বীনি এই কাজটি করার তাওফীক দান করেছেন। লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুক্‌রু...।

২. আজ থেকে ঠিক এক মাসের আগের কথা। ১৯ সেপ্টেম্বর রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় ফোন পেলাম বইঘরের আমিন ভাইয়ের। সালাম বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলেন, কাজের ব্যস্ততা কেমন? কী কী কাজ হাতে আছে?...কাজগুলোর কথা তাকে জানালাম। বললাম, কাজের অনেক চাপ। দুআ করবেন আল্লাহ যেনো শরীর সুস্থ রাখেন এবং অতি দ্রুত সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেন। আমার কথা শেষ হতেই তিনি বললেন- হাতে যত কাজই থাকুক, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে এবং অতি দ্রুত করে দিতে হবে। কোনো ওজর-আপত্তি শুনতে চাই না। বললাম, কী কাজ? বললেন, সেটা তো অবশ্যই বলব, আগে কথা দিন কাজটা করে দেবেন কি না? বললাম- আপনি তো শুনলেনই কেমন চাপে আছি, এর মধ্যে নতুন কোনো কাজ কিভাবে হাতে নিই বলুন! কিন্তু তার এক কথা, কাজ আপনাকে করে দিতেই হবে এবং তাও কুরবানী ঈদের আগেই। জিজ্ঞাস করলাম কী কাজ, কত পৃষ্ঠার? বললেন, চারশ' থেকে সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠা। হিসেব করলাম, কুরবানীর আর আছেই পনের দিন। তাছাড়া যে কাজটা হাতে সেটাও ঈদের আগেই শেষ করতে হবে। এর ভেতর নতুন কাজ হাতে নেয়া প্রায় অসম্ভব। তাও চারশ' থেকে সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠা! আমিন ভাইয়ের কাছে বিনয়ের সাথে বললাম, না ভাই সম্ভব নয়। আল্লাহ তাওফীক দিলে পরবর্তী অন্য কোনো কাজ করে দেব।

এরপর শুরু হলো আমিন ভাইয়ের কথার 'অস্ত্র' প্রয়োগ। আমাকে ধরাশায়ী করতে আব্দার-অনুরোধ এবং ভয়-লোভ সবই দেখালেন। ধরাশায়ী না হলেও অবশেষে ধরা আমাকে ঠিকই দিতে হল। রাজি হলাম কাজ করে দেব, যত দ্রুত সম্ভব। তবে কুরবানীর আগে সম্ভব হবে কি না তা বলতে পারছি না। তিনি বললেন- শুরু করেন, শেষ হবেই।

এরপর তিনি বইটি সম্পর্কে সব বললেন । জানালেন- বই একটা নয়, দুটো । আর দুটোই খুব দ্রুত প্রয়োজন । আমি আজই নেটে (পিডিএফ ফাইল) পাঠিয়ে দিচ্ছি, কাল থেকে কাজ শুরু করে দেবেন । বললাম, ঠিক আছে । দুআ করেন, আল্লাহ যেনো তাওফীক দেন ।

বই দুটি তিনি সেদিন পাঠাতে পারলেন না । পরদিন বিকেলে অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর পাঠালেন । রাতে একটি বই প্রিন্ট করি এবং এরপর দিন ২১ সেপ্টেম্বর থেকে কাজ শুরু করি । আলহামদুলিল্লাহ, আজ ২০ অক্টোবর সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠার দুটি বইয়ের অনুবাদ সম্পন্ন হল । হল না, বলা উচিত আল্লাহ তায়ালা করালেন । তাঁর তাওফীক শামেলেহাল না হলে কখনোই এটা সম্ভব ছিল না । এত দ্রুত কাজ দু'টি সম্পন্ন হওয়ার পেছনে আমিন ভাইয়ের তাড়া-তাগাদা আর কাছের কিছু আপন মানুষের দুআর কথা স্বীকার না করলেই নয়। যারা প্রতিদিনই একাধিকবার খোঁজ নিয়েছেন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে । জাযাকাল্লাহু খায়রান কাসিরা... ।

বক্ষ্যমাণ বইটি বাংলা ভাষায় রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তাবোধ-সিদ্ধান্ত কতটা যথার্থ, মূল বইটির প্রকাশকের কৈফিয়ত পড়লেই আশা করি উত্তর পাওয়া যাবে। মূল বইয়ের প্রকাশকের কৈফিয়তটুকু এখানে পত্রস্থ করা হল ।

৩. 'এই উম্মতের যখন উত্থানকাল ছিল, উম্মতের ওলামায়ে কেরাম এবং ফুকাহায়ে কেরামের মনোনিবেশের কেন্দ্র ছিল তখন বহিরাগত বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ থেকে ইসলামী আকিদাকে নিরাপদ রাখা, ইলম ও আমলের ময়দানে কাফেরদের আক্রমণের মোকাবেলা করা, দ্বীনে হকের পবিত্র দাওয়াতকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করা। এই দাওয়াতকে দলিল-প্রমাণ এবং তীর ও অসির মাধ্যমে বিজয়ী করা। আহলে সুন্নাতের ভেতর গোমরাহ ফেরকাগুলোর তাহরিফ ও বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ব্যবস্থা নেয়া এবং কালপরিক্রমায় দ্বীনের শুভ্র অবয়বে যে ধুলোবালি পড়ে, তা পরিস্কার করতে থাকা । যাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীন হেফাজতের যে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি করেছেন, তার পূর্ণতায় তাদের অংশও লিখিত হয়। তাই এই উম্মতের ওলামায়ে কেরামকে কখনো রোম ও পারস্যের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়, কখনো খারেজী এবং রাফেজী ফিতনার ইলমী এবং আমলী মোকাবেলায় নিমগ্ন পাওয়া যায়। কখনো তারা গ্রিক দর্শনের বিষাক্ত আক্রমণ থেকে উম্মতের আকিদা-বিশ্বাস রক্ষা করেছেন, কখনো বাতেনি ফেরকাগুলোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। কখনো জালেম শাসকদের সম্মুখে কালেমায়ে হক ও

সত্য কথা বলে নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করেছেন, কখনো বা তাতারি আক্রমণ এবং ক্রুসেডের মোকাবেলায় উম্মতকে সজাগ করেছেন। সেসব ওলামায়ে কেরাম এবং আয়েম্মায়ে কেরামের উপর আল্লাহর অবারিত রহমত বর্ষিত হোক!

আর একইভাবে যখন কোথাও-কোনোদিক থেকে উম্মতের পতন শুরু হয়, তাদের মনোনিবেশের দিকও পরিবর্তন হয়ে যায়। উম্মত বহিরাগত বিপদ থেকে মুখ ফিরিয়ে অভ্যন্তরীণ টানাপড়েন এবং পারস্পারিক মতানৈক্য ও মতবিরোধের শিকার হয়। উম্মতের ওলামায়ে কেরামের সারিতেও মুসলমানদের সর্বসম্মত উসুল-মূলনীতি এবং আকিদা-বিশ্বাস রক্ষা থেকে বেশি আগ্রহ সৃষ্টি হয় মুসলমানদের ভেতরের শাখাগত বিষয়ে রণসজ্জার প্রতি। শরীয়তের শাসন প্রতিষ্ঠার চেয়ে বেশি উদ্যম দেখা যায় নিজ নিজ দর্শন ও চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াইয়ে। ফলশ্রুতিতে এই উম্মত নিজেদের অভ্যন্তরীণ মতানৈক্যে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, বহিরাগত সব ধরনের আক্রমণের দার খুলে যায় এবং এসব দার-দুয়ারে কোনো পাহারাদার, উম্মতের মোহাফেজ এবং কোনো পাসেবান ও নেগাহবান অবশিষ্ট থাকে না। অল্প সংখ্যক আহলে ইলম ও আহলে দরদ যাও বা ছিলেন, তারা এত বড় রণাঙ্গন সামলানোর জন্য যথেষ্ট ছিলেন না। ফলে পাশ্চাত্য শুধু আমাদেরকে সামরিক ও রাজনৈতিকভাবেই পরাজিত করেনি বরং পাশ্চাত্যের দূষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত শিরেকী বিশ্বাস ও চিন্ত-চেতনাও উম্মতের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। ইসলামের বুনিয়াদী মূলনীতির সাথে সাংঘার্ষিক দর্শন ও চিন্তাধারাকে খাঁটি ইসলাম হিসেবে সাব্যস্ত করা শুরু হয়। ইসলামের এমন এক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা শুরু হয়, যা 'সমকালীন ও বর্তমান' জীবনব্যবস্থা এবং বিজয়ী সভ্যতার সাথে আপোষকামিতার ভিত্তিতে রচিত হচ্ছিল। এবং এটা সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা চলতে থাকে যে, সে ব্যাখ্যার প্রতিটি মূল্যায়ন, প্রতিটি বিশ্বাস এবং রূপকল্প ইসলাম দ্বারাই প্রমাণিত। নিকট অতীত পর্যন্ত এই দাসসুলভ মানসিকতা এবং পতিত জাতির নির্দেশক এই পন্থা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে বিরাজমান ছিল। অথচ এর বিপরীতে প্রতিরোধ ও বাধাদানকারীদের আওয়াজ ক্রমাগত দুর্বল ও ক্ষীণ হতে থাকে।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই দ্বীন হেফাজত করার ওয়াদা করেছেন। এটা আল্লাহ তায়ালার আখেরী দ্বীন। এর স্বভাবেই কাফেরদের বিশ্বাস থেকে অনেক বেশি বিরোধিতা ও প্রতিরোধের শক্তি এবং ঘুরে দাঁড়ানোর গতি এবং সক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহর অপার

অনুগ্রহে বিগত কয়েক বছর থেকে, বিশেষত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ এবং ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর উম্মতের ভেতর ব্যাপকভাবে জাগরণ শুরু হয়েছে। বাহির থেকে আসা বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ক্ষীণ স্বরগুলো উচ্চকিত হতে শুরু করেছে। মুজাহিদদের দুরাবস্থা ও অবমূল্যায়ন দ্রুত দূর হয়ে যাচ্ছে। আহলে হক ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উম্মত আলহামদুলিল্লাহ, আবারো উত্থানের পথে যাত্রা শুরু করেছে। এই যাত্রা শুরু হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হল, উম্মতের আহলে ইলমের মধ্যে, আরব-আজমের দ্বীনদার শ্রেণীর মধ্যে, আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন, যারা আসলাফের ওলামায়ে কেরামের মত উম্মতের সামনে আসা প্রকৃত বিপদের দিকে মনোনিবেশ শুরু করেছেন। বহিরাগত আক্রমনের বিরুদ্ধে প্রাচীর নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছেন। উম্মতকে শাখাগত ও চিন্তাধারাগত বিতর্ক থেকে বের করে গুরুত্বপূর্ণ উসুলী ও আমলী কাজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন। বিশেষত পাশ্চাত্যের বিষাক্ত যে চিন্তা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তা চিহ্নিত করা, এর ভ্রান্ততা প্রমাণ করা এবং ইসলামের পবিত্র শিক্ষাকে তার আদি রঙে উপস্থাপন করার জন্য তারা যথেষ্ট আন্তরিক।

হযরত মাওলানা আসেম ওমর দামাত বারাকাতুহুমও এমনই একজন মুজাহিদ আলেমে দীন। উপমহাদেশের ইলমী মহলে তিনি অতি পরিচিত একটি নাম। ইতিপূর্বে তাঁর অনেকগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলোতে তিনি অত্যন্ত মর্মপীড়ার সাথে উম্মতকে কঠিনভাবে আক্রান্ত বিপদগুলো সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সেই সাথে তাদেরকে নিজের দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং দ্বীনকে মজবুতভাবে ধারণ-গ্রহণেরও পাঠ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রচনাবলীকে খুসুসি মকবুলিয়াত দান করেছেন ফলে সেগুলো সর্বমহলে সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে।

হযরতের এই রচনাকর্মটিও সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি মিটিয়েছে। বর্তমান সময়ের সব চেয়ে বড় ফিতনা, গণতন্ত্রের ফিতনার রূপ এতে উন্মোচিত হয়েছে। বইয়ে সবিস্তারে গণতন্ত্রের শরয়ী বিচার প্রার্থনা করা হয়েছে এবং বুদ্ধি ও বিবেক– উভয়কে কার্যকর প্রমাণাদির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক চিন্তা, দর্শন এবং গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার অনিষ্ট ও অপূর্ণতা এবং ইসলামের সাথে তার স্পষ্ট বৈপরিত্ব ও সাংঘর্ষিক চিত্র পরিষ্কার করা হয়েছে। একই সাথে শরীয়তের আইন এড়িয়ে রাষ্ট্রীয় আদালতগুলোর মন্দকার্য ও বিপদের কথাও কুরআন হাদীস এবং আয়েম্মায়ে কেরামের মতের আলোকে খুব সুন্দর রূপে উপস্থাপন করা

হয়েছে। লেখক একজন মুহাব্বতকারী দাঈর মত উম্মতকে গণতন্ত্রের ফিতনার অনিষ্টতা বুঝিয়েছেন। গণতন্ত্র ব্যবস্থার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা তাদের এই কাজের স্বপক্ষে বৈধতাদানের লক্ষ্যে যেসব দলিল-প্রমাণ পেশ করে থাকেন, তার উত্তর দেয়ারও চেষ্টা করেছেন এবং সম্ভাব্য সন্দেহ দূর করার সাথে সাথে প্রতিটি আপত্তির সন্তোষজনক জবাব দিতে সচেষ্ট থেকেছেন। যাতে পাঠক নিজেকে এই ফিতনা থেকে নিজেকে দূরে রাখে। এরপর লেখক প্রচলিত ভ্রান্ত জীবন-ব্যবস্থাসমূহকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে দ্বীনের প্রকৃত রাস্তা তথা সশস্ত্র জিহাদের শরয়ী ও যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তাও বর্ণনা করেছেন। যাতে গণতন্ত্র ব্যবস্থা থেকে সম্পর্ক ছিন্নকারীদের যোগ্যতাকে সঠিক গতি দেয়া যেতে পারে।

আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেনো হযরতের এই রচনাকে গণতন্ত্রের প্রতিমা সংহারের মাধ্যম বানান এবং বিশেষত আহলেদ্বীন তথা ধার্মিক শ্রেণীকে এর যাদুময়তা থেকে বের করার মাধ্যম বানিয়ে দেন। আল্লাহ তায়ালা এই রচনার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ঘাড়ে চেপে থাকা বাতিল ও ভ্রান্ত জীবনব্যবস্থার অনিষ্ট, ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের বৈপরিত্ব এবং ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের সাথে পশ্চিমা চিন্তা-চেতনার সংঘার্ষিকতা প্রতিটি মুসলমানের মন ও মগজে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিন। যাতে তারা তাদের জীবন থেকে এই ব্যবস্থা উৎপাটন, পশ্চিমা বিশ্বাস, চিন্তা এবং পশ্চিমা লাইফ স্টাইল বা জীবনধারা থেকে মুক্তি লাভ এবং এর স্থলে ইসলামী আকিদা বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে ব্যাপক করতে, ইসলামী জীবনযাপন পদ্ধতি প্রচলন করতে এবং শরয়ী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ওয়াক্‌ফ করেন। আমীন।'

৪. আল্লাহ! আপনি তাওফীক দিয়েছেন বলে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আপনার নিকট প্রার্থনা, আপনি আমাদের এই কাজকে কবুল করে নিন। বইটি সুন্দর, নির্ভুল ও পরিশিলিতরূপে পেশ করার জন্য অনেকেই সহযোগিতা করেছেন, অনেকে দুআ করেছেন এবং প্রেরণা যুগিয়ে গেছেন। আল্লাহ! আপনি তাদের সবাইকে কবুল করে নিন এবং আমাদের সবাইকে এই বইয়ের সবক আপন জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দিন। আমীন।

আবুজারীর আবদুল ওয়াদুদ
বেজগাতী, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ
২০.১০.২০১৪

মুহতারাম পাঠকের প্রতি কয়েকটি নিবেদন

তারিখে ফিতান তথা ফিতনার ইতিহাস অধ্যায়ন করার পর এ কথা বলা ভুল হবে না যে, গণতন্ত্রের ফিতনা ইসলামের ইতিহাসে হাতে গোণা সেই ফিতনাগুলোর একটি যার চপেটাঘাত মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। এটি এমন একটি ঘোর তমাশাচ্ছন্ন ফিতনা, যেখানে শুধু জ্ঞানের প্রদীপই যথেষ্ট নয় বরং নূরে নবুওয়াতই কেবল হক পথের সন্ধান দিতে পারে।

গণতন্ত্রের ফিতনা আল্লাহর বিপরীতে এই জীবনব্যবস্থাকে প্রভু বানানোর ফিতনা। আইন প্রণয়নের অধিকার আল্লাহর থেকে নিয়ে এই ব্যবস্থাকে দেয়ার ফিতনা। আল্লাহর আইন অনুমোদনের জন্য গায়রুল্লাহর মুখাপেক্ষী বানানোর ফিতনা। এটি মুসলমানদেরকে আল্লাহর ইবাদত থেকে বের করে গায়রুল্লাহর ইবাদতে এমনভাবে প্রবেশ করানোর অপচেষ্টা যে, চট করে তা বোঝাই দুস্কর। এটা এমন এক তমাশা ও অমানিশার ফিতনা, যেখানে হাতকে হাত মনে হয় না। কোনো দলিল-প্রমাণাদি বুঝে আসে না। অথচ কুফরিতে পূর্ণ এই ফিতনাকে ইসলামের সাথে দৃশ্যত অসাংঘর্ষিক এবং ক্ষতিহীন মনে হয়।

সুতরাং এ কথা বলা হলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, গণতন্ত্র শুধু একটা ফিতনাই নয় বরং শত ফিতনার জন্মদাতা এক সংক্রামক ব্যাধি। যা উম্মতে মুসলিমার অস্তিত্বের সাথে জোঁকের মত লেপ্টে আছে।

অধমের ইলম ও জ্ঞান যেহেতু এ বিষয়ে বই লেখার মোটেও উপযুক্ত নয়, তাই এই স্পর্শকাতরতাকে উপলব্ধি করে অধম আমি চূড়ন্ত পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করে আসছি। কলমের বলগা কখনো নিজের হাতে নিইনি। বরং পুরো সফর এই অবস্থায় অতিক্রম করেছি যে, এর বলগা সালফে সালেহীনের শিক্ষার সাথে বেঁধে রেখেছি এবং নিজে সেই অনুগামী আরোহীর মত রেখেছি, যে নাকি কোনো অভিজ্ঞ ড্রাইভারের গাড়িতে আরামে ভ্রমণ করতে থাকে।

বইটি রচনায় অধম ওলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনের (ফুকাহা, মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিসীন) কিতাব থেকে দলিল গ্রহণের পরিপূর্ণ চেষ্টা করেছি। যাতে কোনো চিন্তকের সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থকে।

সুধী পাঠকবর্গের সুবিধার্থে বইটিকে পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে মাসায়েলে তাকফির এবং আহলে সুন্নাতের মাসলাক ও

পন্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গণতন্ত্রের আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ে কুরআনের আইন উপেক্ষা করে ফয়সালাকারী আদালতগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা। চতুর্থ অধ্যায়ে গণতন্ত্রের সাথে জড়িত দল ও ব্যক্তির হুকুম। আর পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থার জন্য সশস্ত্র আন্দোলনের শরয়ী দিক এবং গুরুত্ব ও মর্যাদার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একদিকে এ বিষয়ের উপর ইলমী দালায়েলের দারকার ছিল, অন্যদিকে এই চিন্তাও আঁকড়ে ছিল যে, অধিক 'ইলমী আন্দাযে'র হলে, সাধারণ জনগণের মেজায কবুল নাও করতে পারে। এজন্য সাধারণ মানুষের মেজায-মানসিকতা ও প্রকৃতির দিকে খেয়াল রেখে বিষয়টিকে সহজভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোথাও ইলমী আলোচনা এলে তা বুঝে পড়বেন, প্রয়োজনে তিনবার পড়বেন। কারণ বিষয়টা শুধু নলেজ বৃদ্ধির জন্য নয় বরং সরাসরি আকিদার মাসআলা। আহনাফ হযরতদের পক্ষ হতে সাধারণত এ কথা শোনা যায় যে, মুজাহিদদের পক্ষ হতে এ বিষয়ে অধিকাংশ হওয়ালা ও উদ্বৃতি আহলে হাদীস আলেমদের কাছ থেকে ধারকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু অধম আহনাফ ওলামায়ে কেরামের দলিলাদি একত্রিত করার চেষ্টা করেছি। যাতে মুসলমানরা এ কথা জানতে পারেন যে, এটা কোনো ইখতিলাফি মাসআলা নয়। এগুলো শুধু আহলে হাদীস ওলামায়ে কেরামই বর্ণনা করেননি বরং এই আলোচনাগুলো আকিদার সেসব মাসায়েলের অন্তর্ভুক্ত, যাতে প্রায় সকল সালফে সালেহীন একমত রয়েছেন।

বক্ষ্যমান বইয়ে আলোচিত যে কোনো বিষয়ে আহলে ইলম হযরতগণের আপত্তি ও জিজ্ঞাসা থাকলে বইয়ের শুরুতে দেয়া ই-মেইলে যোগাযোগ করতে পারবেন। আমাদের উদ্দেশ্য যেহেতু ওলামায়ে কেরাম বিশেষভাবে এবং অপারাপার মুসলমান সাধারণভাবে আলোচনাগুলো খোলা মনে পড়বেন, তাই দ্বিমত পোষণ করার অধিকার তাদের রয়েছে। এর খণ্ডনে তাদের নিকট দলিল থাকলে তা অবশ্যই পেশ করবেন। ইনশাল্লাহ আমি এবং আমার সঙ্গীগণ সুবিবেচনার সাথে তা পাঠ করব। তবে সে সব 'আহলে কলম'-এর নিকট মা'যুরাত প্রকাশ করছি, যাদের কলমের প্রবিত্রতা 'কেরিলুগার বিল'-এর আমেরিকান অনুদান অর্জন করে মুসলমানদের রক্তের সাথে একাকার হয়ে গেছে। যারা হক ও বাতিলের এই যুদ্ধে তাদের কলমকে তাগুতি জোটের হাতে নিলাম করেছে। যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রবকে ছেড়ে আমেরিকা এবং তার জোট ও মিত্রশক্তিকে রব বানিয়েছে।

আর সে সব আহলে কলমকে আমরা মা'যুর মনে করি, অপারগ বিবেচনা করি, 'পিস্তলের ডগায়' যাদের থেকে এই বাতিল ব্যবস্থার পক্ষে বই ও ফতোয়া লেখানো হয়। প্রতিটি দেশের ক্ষমতাবান শক্তি তাগুতি ব্যবস্থাকে বাঁচানোর জন্য 'মৃত্যুর ধমকি' দিয়ে এ সব আহলে. কলমকে বাধ্য করে যে, তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় কিতালকারীদের বিরুদ্ধে শব্দের বোমা বর্ষণ করে।

তবে সেই সব ওলামায়ে হক, যারা এখনো জিহাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কলম ধরেননি, কোনো ফতোয়া রচনা করেননি কাড়ি কাড়ি ডলারের লোভ দেয়া সত্ত্বেও; আমরা জানি- তাদেরকেও জানে মারার হুমকি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এরপরও তারা বাতিলের সামনে মাথা নোয়াতে প্রস্তুত নন। এসব হক্কানী আলেম আমাদের গর্ব, আমাদের অহঙ্কার। আমাদের অন্তরে তাদের ভালোবাসা অহর্নিশ তরঙ্গায়িত হতে থাকে। তাদের স্মরণ আমাদের আবেগ ও স্পৃহাকে উষ্ণতা দেয়, আমাদের কর্মে ও চিন্তায় উত্তাপ ছড়ায়। মারাকিশ থেকে ফিলিপাইন, দাগিস্তান থেকে মালদ্বীপ প্রতিটি মুজাহিদ তাদেরকে নিজেদের রাহবার ও রাহনুমা মানে। চাই সে যে দেশেরই হোক, যে মাসলাকেরই হোক। রফে ইয়াদাইন করে, তারাও তাদেরকে মুহাব্বত করে, যারা করে না, তারাও। আমিন যারা জোরে বলে, তারাও তাদেরকে মুহাব্বত করে, যারা বলে না, তারাও...। প্রতিটি মুজাহিদ তাঁদেরকে মুহাব্বত করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত তাঁদের নূরে নবুওয়াতের আলোয় মুজাহিদরা তাদের জিহাদী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের সবার জান ও ঈমানের হেফাজত করুন এবং তাদেরকে নিজ চোখে খেলাফত প্রতিষ্ঠা হওয়া দেখার সুযোগ দান করুন।

হিদায়াত আল্লাহরই হাতে। তাই আল্লাহর নিটক দুআ করি, তিনি যেনো এই মেহনতকে তাঁর রেযা ও সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন এবং এর প্রতিটি বর্ণকে উম্মতে মুসলিমার জন্য জান্নাতের দরজা বুলন্দির মাধ্যম বানান। আল্লাহ তায়ালা এই বইয়ের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ব্যাপক উপকার পৌঁছে দিন এবং উপমহাদেশে মুসলমানদেরকে ইসলামী খেলাফতের জন্য জাগ্রত করার কারণ ও মাধ্যম বানান। আমীন!

লেখকের ভূমিকা

আজকের মুসলিম বিশ্ব কি ততটাই দুর্বল যতটা আজ থেকে দশ বছর পূর্বে ছিল? কুফরি বিশ্বের সেই প্রতাপ ও দাপট, জৌলুশ ও চমক, ঔদ্ধত্য ও স্বেচ্ছাচারিতা কি তেমনই রয়েছে? পৃথিবীতে 'আনা রব্বুকুমুল আ'লা'র ঘোষণাকারী শক্তির জাঁকজমক কি আজও তেমনই রয়েছে, যা এই খ্রিস্টশতাব্দীর সূচনালগ্নে ছিল? গতকালও যারা জীবন ও মৃত্যু বন্টনকারীর দাবিদার ছিল, তারা কি আজো সেই অবস্থাতেই আছে?

ইসলামের পুনর্জীবন ও প্রতিরক্ষার জন্য যাত্রাকারী মুষ্টিমেয় মুজাহিদ কি আজও সেই দুরাবস্থাতেই রয়েছে, যেমন আজ থেকে দশ বছর পূর্বে ছিল? পৃথিবীর বুকে কোনো দেশ কি আজো তাদেরকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত নেয়? আজও কি তাদের যাচ্ছেতাইভাবে অপদস্থ করা হচ্ছে, নাকি তারাই এখন দুশমনদের অপদস্থ করে চলেছে?

ইনসাফের সাথে দেখা হলে বলতে হবে, তালেবানের মাত্র দশ বছরের জিহাদ পৃথিবীর মানচিত্র, শক্তির ভারসাম্যতা এবং বিশ্বশক্তির অড়াই পাল্টে দিয়েছে।

ঈমানদারগণ যারা কুফরির গোলামী এই অক্ষমতার সাথে গ্রহণ করেছিল যে, কাফেরদের সাথে আমাদের আর কিসের মোকাবেলা, আমাদের উপর জিহাদ ফরয নয়! কারণ কাফেরদের সাথে লড়াই করার মত আমাদের শক্তি নেই। তালেবানদের কুরবানীর বদৌলতে মুসলিম বিশ্বের শিশু, যুবক, বৃদ্ধ এমনকি নারীরাও এই বাস্তবতা বুঝে ফেলেছে যে, মুসলমানরা যদি কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর জন্য বের হয়, তবে আজকের এই যুগেও বদর ও হুনাইনের স্মৃতি তাজা করা সম্ভব। মুসলিম উম্মাহ, যারা বিগত শতাব্দীতে মার খাওয়া, অপদস্থ হওয়া এবং মাতৃভূমি থেকে বঞ্চিত হওয়াই নিজেদের নিয়তি মনে করে বসে ছিল; আজ আলহামদুলিল্লাহ, উম্মাহর নারীরাও পৃথিবীর বুকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিযাম ও জীবনব্যবস্থার কথা আলোচনা করছে। উম্মতের নওজোয়ানরা, যারা কাল পর্যন্ত তাদের বাড়ি-ঘর জ্বলতে, জনবসতি বিরান হতে এবং সম্ভ্রম লুণ্ঠন হতে দেখে হাঁটুর ভেতর মাথা লুকিয়ে কাঁদা ছাড়া কিছু করতে পারত না, আজ

তারা নিজ ঘরের আগুন দ্বারা উম্মতের দুশমনদের ঘর-বাড়িও ভস্মস্তূপে পরিণত করছে।

এক মিলিয়নের চেয়েও বেশি সংখ্যক উম্মতে মুসলিমা সত্তর বছর পর্যন্ত তাদের অধিকারের জন্য দুয়ারে দুয়ারে হোঁচট খেয়েছে, জাতি সংঘের কাছে ভিক্ষা চেয়েছে, আজ সেই উম্মতের মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুজাহিদ যখন আল্লাহর পথে কিতাল শুরু করেছে, তো কুফরের ঝাণ্ডাবাহীরা 'শান্তিপূর্ণ' মাধ্যমে নিজেদের দাবি আদায়ের উৎসাহ দেয়ার জন্য রীতিমত দৌড়ঝাঁপ করে ফিরছে।

ফেরাউনী কণ্ঠে হুমকিদাতা আমেরিকা আফগানিস্তান এবং ইরাকে নিজদের ক্ষতস্থানকে সেই জীর্ণ কুকুরের মত চাটতে বাধ্য, যার ঘাড়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। আর তার জিহ্বা সেই ক্ষত পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম। যার কারণে সে বারবার ভেউ ভেউ করে। তাগুতি শক্তিগুলো, যারা ন্যাটোর পতাকাতলে একত্রিত হয়ে খোরাসানের মুজাহিদদেরকে নিশ্চহ্ন করার জন্য এসেছিল, এখন তারা একে একে এমনভাবে পালাচ্ছে যে, নিজেদের পিতৃপুরুষের 'বাহাদুরি'কেও কলঙ্কিত করে ফেলেছে। যাদেরকে সারা বিশ্বের মিলিটারীদের শিক্ষক ও গুরু মান্য করা হত, যাদেরকে প্রাজ্ঞ সমরবিদ এবং যুদ্ধের মূলনীতি প্রস্তুতকারী স্পেশালিস্ট হিসেবে আখ্যায়িত করা হত, তালেবানরা তাদেরকে যুদ্ধের এমন কিছু স্টাইল শিখিয়েছে যে, নিজেদের যুদ্ধের জন্য তাদের সৈনিকদের ডায়াপার্স লাগানোর 'নতুন মূলনীতি' প্রণয়ন করতে হয়েছে। কোনো জাতির মায়েরা কি এমন লড়াকু সৈনিক জন্ম দিতে পেরেছে?

আপনারা কি এখনো জিহাদের এই কারামাত স্বীকার করবেন না যে, কাল পর্যন্ত আমেরিকা তার ইচ্ছেমত যুদ্ধের ময়দান নির্বাচন করত। আর আজ মুজাহিদদের বিশ্ব নেতৃত্ব তাদের মহান প্রভুর মদদে যুদ্ধের মানচিত্র এমনভাবে পাল্টে দিয়েছে যে, মুজাহিদদের নির্বাচিত ময়দানে তাদেরকে বাধ্য হয়ে আসতে হয়।

শক্তির ভারসাম্যও লক্ষ্য করুন। কাল পর্যন্ত আমেরিকার শুধু আসার ধমকি দিলেই পারমাণবিক শক্তির জেনারেলদের পিত্ত পানি হয়ে যেত। আর আজ ইসলামের মুজাহিদরা আমেরিকাকে জোরপূর্বক নিজেদের সাজানো ময়দানে টেনে হিঁচড়ে আনতে চায়। কিন্তু পেন্টাগণওয়ালাদের পিত্তই অকেজো হয়ে পড়েছে। ভাড়াটে সৈনিক সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দেশে গিয়ে কান্নাকাটি করতে থকে। কিন্তু কোনো দেশই আর সৈনিক দিতে প্রস্তুত নয়, শুধু আদি দাসগুলো ছাড়া!

সোমালিয়ার ভূমি তার অপেক্ষায়। রহমত-বরকত ও নবী-রাসূলদের পূণ্যভূমি সিরিয়া ও ফিলিস্তিনেও মাল্টিন্যাশনালের ভাড়াটে খুনি। অর্থাৎ আমেরিকাকে সেখানে আসতেই হবে। কালো পতাকাধারী মুজাহিদদের ধরণ অনেকটা এমন মনে হচ্ছে যে, বিশ্ব কুফরি শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে তারা খোরাসানী ভাইদের অনুসরণ করতে চায়। পশ্চিমা মুসলিম দেশগুলোও (তিউনিস, আলজেরিয়া, মালি, লিবিয়া ইত্যাদি) ইহুদী দাতাদের পুরনো নিমকখোর, ফ্রান্সিসিদের সমাধীস্থল বানানোর জন্য প্রস্তুত, ইনশাআল্লাহ। থাকল মিশর। কে জানে, হতে পারে ইসরাইলকে বাঁচানোর চিন্তায় ব্রিটিশ রাণীর সিংহাসনের শেষ পতন লোহিত সাগরেই (যেখানে ফেরাউন ডুবে ছিল) হবে...!

আর সেই বাজিগর, চতুর, ধূর্ত, আল্লাহ ও মানবতার দুশমন, নবীদের খুনি, যারা স্টেজের অনেক দূর থেকে কাঠের পুতুল নাড়া দিচ্ছে, আজ যখন আল্লাহর সিপাহীদের হাত তাদের গলায় পৌঁছতে শুর করেছে, এবার তারা এই যুদ্ধের উত্তাপ অনুমান করতে পারছে, যা তারা শতাব্দীকাল ধরে প্রজ্বলিত করে রেখেছে। যেই আগুনে তারা তৃপ্তি নিয়ে মানুষের লাশের উপর হাত সেঁকত। দুটি বিশ্বযুদ্ধ আল্লাহর এই দুশমনেরাই তাদের ইবলিসি ব্যবস্থাকে কোটি কোটি মানুষের হাড্ডির উপর দাঁড় করানোর জন্য প্রজ্জ্বলিত করে। কিন্তু জিহাদের মাত্র তিনটা আঘাতেই তারা তাদের শত বছরের ডেরা থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছে। আর সেই জীবনব্যবস্থা, যা তারা ছয় শ' বছরের লাগাতার এবং অক্লান্ত পরিশ্রম-সাধনার মাধ্যমে দাঁড় করিয়েছে এবং বড় করেছে, বংশানুক্রমে পানি সিঞ্চন করেছে, এমনকি নিজের আত্মসম্মান ও সম্ভ্রম পর্যন্ত তা সিঞ্চন করার জন্য বিক্রি করে ফেলেছে, মাত্র কয়েক বছরের জিহাদ এবং উম্মতের ছোট্ট একটি দলের কুরবানী তাদের স্বপ্নের এই প্রাসাদে কম্পন তুলেছে। আর এখন তো এই ব্যবস্থার দেয়ালে অসংখ্য ফাটল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ, সেই দিন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী এই উম্মতের বৈশ্বিক বিজয়ের দিন হবে, যে দিন আপনারা এই অর্থব্যবস্থার চিৎপটাংয়ের সংবাদ শুনবেন এবং কাগজি কারেন্সির সমাপ্তি ঘটবে, যা ইহুদীদের ইজারাদারির সবচেয়ে প্রভাবশালী হাতিয়ার।

আল্লাহর ফযল ও অনুগ্রহে মুজাহিদদের জিহাদী আঘাত এই নিযাম ও ব্যবস্থাকে এ পরিমাণ ভারসাম্যহীন করে ফেলেছে যে, এখন আর এটাকে বাঁচানো সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের যে ধুম্রজাল দ্বারা তারা আজ পর্যন্ত বিশ্বের চোখে ধুলি নিক্ষেপ করে আসছিল, এখন এটা এ পরিমাণ ওলটপালট হয়ে গিয়েছে যে, আর বেশি

চালানো সম্ভব নয় । শেষ পর্যন্ত মাল্টিন্যাশনালের জাদুকরদের সামনে পথ এখন দুইটাই- হয় আহলে ইসলামের মোকাবেলায় প্রকাশ্যে শেষ পরাজয় স্বীকার করতে হব, কিন্তু তা হয়তো তারা এখনো করবে না। আর দ্বিতীয় পথ হল- তারা যদি এই জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতেই চায়, তবে তাদেরকে যুদ্ধে ইন্ধন যোগানোর জন্য আসল 'মুদ্রা' অর্থাৎ স্বর্ণ, জ্বি হ্যাঁ! এখন তাদেরকে স্বর্ণ বের করতেই হবে। যা তারা গোটা মানববিশ্বকে ধোঁকা দিয়ে নিরাপদ গুহায় লুকিয়ে রেখেছে।

মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ রঙ-বেরঙের কাগজ (পেপার কারেন্সি) দ্বারা চালু রাখা যাবে না। পরিশেষে তোমাদেরকে স্বর্ণ বের করতেই হবে, সেই দিন ইনশাআল্লাহ বেশি দূরে নয়।

তাই নিজেদেরকেও জেনে রাখুন, শত্রুদেরকেও চিনে রাখুন। এটা সেই শতাব্দী নয়, যেই শতাব্দীতে খেলাফতে উসমানিয়ার সূর্য অস্ত গিয়েছিল। এটা নতুন শতাব্দী। ইসলামের উত্থানের শতাব্দী। খেলাফত পুনর্জীবনের শতাব্দী...। খ্রিস্ট একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ এবং হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক। বিশ্ব অনেক বদলে গেছে। শক্তি এবং তার অক্ষ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। পূর্বে কার যুদ্ধ কার সাথে ছিল, শীত হোক বা গরম, এই উম্মতকে কি কোনোভাবে গণ্য করা হত? কিন্তু এখন তারা এবং তাদের মিত্রজোট সবাই একদিকে, আর আহলে ঈমানরা একদিকে। তাদের যুদ্ধ এখন একটা শক্তির সাথেই, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর ব্যবস্থা প্রবর্তনকারীদের সাথে। যারা তাদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হুঙ্কার তুলেছে। অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে। চোখ থাকলে দেখা যায়। অন্ধরাও অন্তর্চক্ষু দ্বারা দেখতে পায়। হ্যাঁ কেউ যদি অন্ত রচোখের আলোই হারিয়ে ফেলে, তার জন্য তো কিছুই নেই, কিছুই নেই। না জিহাদ, না জিহাদের উপকারিতা। তাদের নিকট এগুলো আমেরিকা এবং তাদের এজেন্সিদের খেলা। দুঃখ তো অন্ধদের জন্য নয়, দুঃখ হল তাদের জন্য যাদের মাথায় তো চোখ রয়েছে কিন্তু তাদের অন্তরচক্ষু আলো হারিয়ে ফেলেছে, আলো অন্ধকার তাদের কাছে সমান। অন্তরে যদি ঈমানী নূর থেকে থাকে তো বলুন, এই যুগে কি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব? বর্তমান যুগে কোনো মুসলিম দেশে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তা চালানো সত্যি কি সম্ভব নয়?

ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হলে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো কিভাবে চালাবেন? বিচার ব্যবস্থা কেমন হবে? এই উম্মতের যে সব ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান রাখেন এবং কাদিয়ানী ও কাদিয়ানিয়্যাতকে কুফর মনে করেন, এ ধরনের দুর্বল ও

অনর্থক প্রশ্ন করা কখনোই উচিত নয়। এখন উম্মতের প্রতিটি সদস্যকে হীনমন্যতা থেকে বের হয়ে ঈমান ও ইয়াকিনের দৌলত সঞ্চয় করা উচিত। খেলাফত ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা, নতুন কোনো নাম এবং চমকওয়ালা কোনো শ্লোগানে কান দেয়া যাবে না। গণতন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। পূজিবাদি ব্যবস্থার লাশে এখন পোকা কিলবিল করছে। এখন শুধু আল্লাহর বানানো ব্যবস্থা, কুরআনের ব্যবস্থা যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন, এই বিশ্বকে জুলুম ও নির্যাতন থেকে মুক্তি দিতে পারে।

সুতরাং মুসলমানদের এখন হতাশার পথ ত্যাগ করে আশা, সাহস এবং উদ্যমের সঠিক রাজপথে আসা উচিত। যেখানে ইসলামের শাহসোয়াররা দূরন্ত গতিতে ছোটে, ভ্রান্ত ব্যবস্থা পদদলিত করে। মানবতার দুশমনদের তৈরিকৃত মূর্তি সংহার করে। প্রতিটি ব্যবস্থার শিকড় উৎপাটন করে দূরে নিক্ষেপ করে।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর জীবনব্যবস্থাকে বিজয়ী করার জন্য ময়দানে আসো হে তরুণ, তোমাকে যে আসতেই হবে!

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম ও গণতন্ত্র :: ২০

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

•

প্রথম অধ্যায়

তাকফিরের মাসআলায় আহলে সুন্নাতের পন্থা

তাকফিরে হক : আহলে সুন্নাতের মাসলাক

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে এতে দাখেল হওয়ার তরিকাও বলে দিয়েছেন। এ কারণে নামায ফরয করেছেন, সাথে সাথে এতে দাখেল হওয়ার শর্তাবলীও বর্ণনা করেছেন। তেমনিভাবে নামায শুরু করার পর যে সব কারণে নামায ভেঙ্গে যায়, যদিও সে যথারীতি রুকু সিজদা করতে থাকে... একবার নামায থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর অর্থাৎ নামায ভেঙ্গে যাওয়ার কোন পদ্ধতিতে আবার দাখেল হওয়া যায়, নামায দ্বিতীয়বার শুরুকরা যায়? এসবই বলে দিয়েছেন।

উদাহরণ স্বরূপ কোনো ব্যক্তি সহীহ তরিকায় নামায শুরু করেছে। কিন্তু নামাযের ভেতর সে এমন কাজ করেছে, যার দ্বারা নামায ভেঙ্গে যায়। এরপরও সে যথারীতি নামায পড়ে গিয়েছে। রুকু করেছে, সিজদা করেছে। এমন ব্যক্তিকে কি কেউ নামায পড়ছে বলে বলবে? কখনাই না। কারণ যদিও সে বাহ্যিকভাবে নামায আদায়কারীর মত আমল করছে, কিন্তু নামাযের ভেতর সে এমন একটা কাজ করেছে, যার কারণে বাস্তবিকই সে নামায থেকে বের হয়ে গিয়েছে। এজন্য তার জন্য জরুরি আবার প্রথম থেকে নামায শুরুকরা।

তাই জেনে রাখা উচিত যে, দুনিয়াতে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হল ঈমান, এই ঈমানে দাখেল হওয়ার তরিকা কি...? আর দাখেল হওয়ার পর এই ঈমানকে সহীহ রাখা এবং নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ রাখার জন্য কোন কোন বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি? এগুলোর ইলম অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের বিপরীত বস্তু অর্থাৎ কুফুর সম্পর্কে জ্ঞান না থাকবে, ঈমান কি করে চিনবেন? কি করে ঈমান চেনা সম্ভব? সেই বিষয়গুলো কি যা ঈমান ও কুফুরের সীমা চিহ্নিত করে দেয়। মুসলমান কে আর কাফের কে? একজন কাফের কিভাবে মুসলমান

হয়, আর সেই বিষয়গুলোই বা কি যার দ্বারা একজন মুসলমান কালেমা পড়া এবং নামায রোযা পালন করার পরও কাফের হয়ে যায়?

ইসলামে যদি এই সমস্যাগুলো না থাকত এবং সালফে সালেহীন যদি এসব বিষয় বর্ণনা না করতেন, ঈমানের সীমান্তগুলো কি করে হেফাজত করা হত? সালফে সালেহীন যদি তাকফিরের অধ্যায় গোপন করে যেতেন, ঈমান তাহলে খেলনা ও উপহাসে পরিণত হত। প্রবৃত্তিপূজারীরা যা ইচ্ছা করতে থাকত। তাদের লাগামহীন জবান আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় গতিতে চলত। রহমাতুলল্লিল আলামিনকে নিয়ে ঠাট্টা উপহাস করত। আবার জোর গলায় কালেমা পড়ে নিজের মুসলমানিত্বও জাহির করে বেড়াত।

হযরত ওলামায়ে কেরাম যদি এই বিষয়গুলো বর্ণনা না করতেন, তবে বর্তমানে বাতিল ফেরকাগুলোকে বাতিল বলার কেউ থাকত না। কাদিয়ানীদেরকেও মুসলমান মনে করা হত এবং তাদের ভক্তরা তাদেরকে 'কালেমাওয়ালা' প্রমাণ করে 'আহলে কিবলা'র মধ্যেই গণ্য করত। সবচেয়ে মারাত্মক কথা হল যেই ফেরকার উৎস ও অস্তিত্বেই মিথ্যা এবং ভ্রান্ততা নিহিত, কারণ তারা কখনো জিবরাইল আমীনকে দোষারোপ করত। কখনো রহমাতুললিল আলামীনের ত্রুটি চিহ্নত করত। কখনো উম্মাহাতুল মুমিনীনদের বিরুদ্ধে মনের জ্বালা মিটাত। কখনো আসহাবে রাসূলের বিরুদ্ধে ঘৃণার তীর বর্ষণ করত। এরপর একবার উচ্চ আওয়াজে কালেমা পড়ে নিজের মুসলমান হওয়ার প্রমাণ দিত।

কিন্তু এটা কি করে সম্ভব যে, দুনিয়ার ধন-দৌলত হেফাজত করার ব্যবস্থা করা হয়, আর দুনিয়াতে যার চেয়ে বড় কোনো দৌলত নেই, যা ছাড়া কারো কোনো আমল কবুল হয় না, তা হেফাজত করার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না!

এজন্য আল্লাহ তায়ালা ঈমান হেফাজতের উসুল ও মূলনীতি বলে দিয়েছেন। এই অমূল্য সম্পদ কিভাবে নিরাপদ থাকতে পারে, আর কিভাবে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, তা তিনি পরিস্কার বলে দিয়েছেন। ঈমানের সীমানা কি আর কুফরের সীমানা কোথায় থেকে শুরু হয়, কোন ঈমান আল্লাহর দৃষ্টিতে ঈমান, আর কোন কোন বিষয় একে নিফাক ও কপটতায় রূপান্তর করে, তা তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন।

এ কারণে হযরত ওলামায়ে কেরাম 'তাকফির অধ্যায়' বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান ও কুফরের মাঝে যেই সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, উম্মতকে তাঁরা তার পাবন্দ বানিয়েছেন। এজন্য একজন মুসলমানকে যেভাবে কাফের বলা বিপদজনক বিষয়, তেমনিভাবে কোন কাফেরকে মুসলমান বলাও গুরুতর বিপদজনক। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি, উভয় ক্ষেত্রে এ'তেদাল ও ভারসাম্য বজায় রাখা।

স্মর্তব্য, হোয়াইট হাউস যেটা বলবে সেটাই ভারসাম্যপূর্ণ নয়। লন্ডন ও প্যারিস যেটা বলবে সেটাই ভারসামপূর্ণ নয়। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল যেটাকে এতেদাল বলেছেন, ভারসাম্যপূর্ণ বলেছেন এবং সালফে সালেহীন দলে দলে আমাদের পর্যন্ত যা পৌঁছিয়েছেন, কেবল সেটাই এ'তেদাল ও ভারসাম্যপূর্ণ।

সুতরাং কারো এই ভ্রান্তির শিকার হওয়া উচিত নয় যে, আলেম সমাজ এমনিতেই একজনকে কাফের বা মুরতাদ ঘোষণা করে। মনে রাখবেন, এটা শয়তানের কথা। শয়তান তার কর্মীদের মুখে এমন কথা প্রকাশ করে থাকে। আলেম ওলামারা কাউকে কাফের বলেন না। ওই ব্যক্তি তার আমলের কারণে পূর্বই কাফের হয়ে গিয়েছিল। আলেমরা শুধু তার কুফরের কথা প্রকাশ করেন যে এই ব্যক্তি এমন কথা বলেছে, এমন কাজ করেছে, যা কালেমা পড়া সত্ত্বেও কাফের বানিয়ে দেয়। এমনকি হযরত আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

নামায, যাকাত, রোযা, এবং হজ্ব ছেড়ে দেয়া যেমন 'ফিসক', তবে শর্ত হল এগুলোর ফরয হওয়াকে স্বীকার করে, কিন্তু আমল করে না, এমনিভাবে সালাত, যাকাত, সওম এবং হজ্বের 'তা'বির' স্বীকার করা এবং গ্রহণ করার পর এগুলোকে মারুফ এবং মুতাওয়াতির শরয়ী অর্থ থেকে বের করে শরীয়ত পরিপন্থি অর্থে ব্যবহার করা এবং এমন ব্যাখ্যা করা যা শুধু কুরআন-হাদীসের খেলাফই নয় বরং চৌদ্দশত বছরের ভেতর কোন আলেমেদীনও করেননি– ইসলামের ভাষায় এবং কুরআনের পরিভাষায় তার নাম 'ইলহাদ। আর ওই ব্যক্তির নাম 'মুলহিদ'। পবিত্র কুরআনের এই শব্দগুলো– কুফর, নিফাক, ইলহাদ, ইরতিদাদকে মানুষের বিশেষ আকিদা, কথা, কাজ এবং নৈতিকতার দিক থেকে ব্যক্তি এবং দলের জন্য ব্যবহার করেছে। আর পৃথিবীর বুকে যত দিন কুরআনে কারীম বিদ্যমান থাকবে, এই শব্দগুলো, এর এই অর্থ এবং এর প্রয়োগক্ষেত্রও থাকবে।

এখন ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব হল, তারা উম্মতকে জানাবেন, এই শব্দগুলোর ব্যবহার কাদের বেলায় কোন সময় সঠিক হবে এবং কাদের বেলায় কোন সময় ভুল হবে। অর্থাৎ ওলামায়ে কেরাম বলবেন, যেভাবে একজন ব্যক্তি বা ফেরকা ঈমানের নির্ধারিত দাবি পূরণ করার পর মুমিন হয় এবং তাকে মুসলমান বলা হয়, তেমনিভাবে এই দাবি পূরণ না করার কারণে একজন ব্যক্তি ও ফেরকা ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যায়। উম্মতের আলেমদের এটাও দায়িত্ব যে তারা এই সীমানা ও এর বিস্তারিত বিবরণ অর্থাৎ ঈমানের দাবি এবং কুফরের কারণ, কুফরি আকিদা, কথা ও কাজের সীমানা নির্ধারিত করে দিবেন। যাতে কোনো মুমিনকে কাফের, বা ইসলাম তেকে খারেজ, বলতে না হয়। তেমনিভাবে কোন কাফেরকেও যেনো মুমিন এবং মুসলমান বলা না লাগে। ঈমান ও কুফরের সীমানা এভাবে নির্ধারিত ও

চিহ্নিত না হলে ঈমান ও কুফরের ভেদাভেদ এবং পার্থক্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দীন ইসলাম শিশুদের খেলনায় পরিণত হবে। আর জান্নাত জাহান্নাম হয়ে যাবে রূপকথার গল্প!

তাই উম্মতের আলেমদের উপর– যত কিছুই ঘটুক এবং কপালে গাল-মন্দ যত যাই জুটুক– কিয়ামত পর্যন্ত এই দায়িত্ব আছে এবং থাকবে। তারা ভয়-ভীতি এবং নিন্দাকারীদের নিন্দাবাদের পরোয়া না করে শরীয়তের দৃষ্টিতে যে কাফের, তাকে কাফের হওয়ার হুকুম এবং ফতওয়া দিবে। আর এ ক্ষেত্রে শতভাগ দিয়ানতদারি এবং ইলম ও গবেষণা-অনুসন্ধানের সাথে কাজ করবে। কুরআন হাদীসের নসের আলোকে যে ব্যক্তি বা যে দলই 'ইসলাম' থেকে খারেজ প্রমাণিত হবে, ওলামায়ে কেরাম তার ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং দ্বীনের সাথে তার সম্পর্কহীনতার হুকুম এবং ফতওয়া দিবে। কোনো মূল্যেই তাকে মুসলমান হিসেবে স্বীকার করবে না, যতক্ষণ না সূর্য পূর্বের পরিবর্তে পশ্চিম থেকে উদিত হয় অর্থাৎ কিয়ামত না ঘটে।[১]

সুতরাং এ বিষয়টা স্পষ্ট যে, কুফরকে কুফর বলা এবং আহলে কুফরের কুফরির কথা প্রকাশ করা আহলে সুন্নাতের মানহাজ ছিল এবং থাকবে। এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এই ময়দানে পা দিতে অধম দশ বছর পর্যন্ত ভেবেছে এবং এই অপেক্ষায় থেকেছে যে, আমাদের নির্ভরযোগ্য কোনো আলেম যদি তার এই দায়িত্ব পুরা করতেন! কিন্তু যারাই এর সূচনা করেছেন, আল্লাহর দুশমনেরা তাদেরকে শহীদ করে দিয়েছে। আর বাকি হযরতদের কাছে কেবল আশাই করে গিয়েছি।

এজন্য শুধুমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং এ বিষয়ের প্রতি পরিপূর্ণ সতর্কতার সাথে অগ্রসর হয়েছি যে, কুরআন হাদীস এবং সালফে সালেহীনের পথ থেকে সরে যেন একটা কথাও বলা না হয়। সেই সাথে কট্টরপন্থার সীমান্ত থেকে দূরে এবং চাটুকারিতার দেয়াল থেকে সরে গিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথে চলেছি। সেই সাথে এ বিষয়ের প্রতিও পরিপূর্ণ দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করেছি যে, আমর কথা যেন ইলমী আন্দাযে ও বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে হয়। যাতে পাঠকদের দলিল প্রমাণ স্বীকার করতে হঠকারিতা ছাড়া অন্য কোনো কিছু প্রতিবন্ধক না হয় এবং তারা অস্বীকার করে না বসে। এরপরও যদি কেউ অস্বীকার করে, তবে এর দুর্বলতার কারণে অস্বীকার করবে, তা নয়। বরং এজন্য অস্বীকার করবে যে দাসত্ব তাদের চিন্তা ও বোঝার যোগ্যতাই ছিনিয়ে নিয়েছে।

সালফে সালেহীনদের মধ্যে হতে যেসব ইলমের পাহাড়দের হাওয়ালা ও উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, আমানতদার যে কোনো পাঠকই শুধু তাদের নাম দেখেই কথা মেনে

---

[১] *–মুকাদ্দামা ইকফারুল মুলহিদীন : ৪৩-৪৪, মাওলানা ইউসুফ বিননূরী রহ.*

নিবে। কিন্তু যার মানার ইচ্ছা নেই, তার কাছে কুরআনও অর্থহীন। সুতরাং যে ব্যক্তি জীবিত থাকবে, দলিল-প্রমাণের উপরই জীবিত থাকবে। আর যে ধ্বংস হবে সে দলিল-প্রমাণের উপরই ধ্বংস হবে। যাতে সে এ কথা বলতে না পারে যে এ বিষয়ে তো আমি কিছু জানতাম না।

খারেজী কারা

মুসলিম বিশ্বের শাসকশ্রেণী দুইশ' বছর ধরে এই উম্মাহর রক্ত চুষছে। নিজেদের হীনপ্রবৃত্তিকে উপাসক বানিয়ে বসে আছে। তাদের কামনা বাসনা পূর্ণ করার জন্য মুসলমানদেরকে অবমাননকর জীবন যাপনে বাধ্য করেছে। নিজের সন্তানদের পেট ভরানোর জন্য সাধারণ মুসলমানদের মুখ থেকে গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছে। নিজের ক্ষমতাকে স্থায়ী করার জন্য ইসলামী মূল্যবোধকে বিক্রি করেছে। কাফেরদের হাতে মুসলমানদেরকে লাঞ্ছিত করেছে। মুসিলম বিশ্বের অমূল্য সম্পদগুলোকে গুড়া-ভূসির মূল্যে তাদের ইংরেজ প্রভুদের ঝোলায় তুলে দিয়েছে। ইসলামী আইনের জায়গায় ইবলিসি আইন বাস্তবায়ন করেছে এবং এই আইনের নিরাপত্তার জন্য নিয়মিত সেনাবাহিনী ও পুলিশ ফোর্স গড়ে তুলেছে।

আজ গোটা মুসলিম বিশ্বে জাগরণ শুরু হয়েছে। কাফের ও ইসলামের শত্রুদেরকে ঘৃণা করা আরম্ভ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, প্রতিটি দেশের সাধারণ মুসলমান এই সত্য জেনে গিয়েছে যে, শতাব্দীকাল ধরে এই উম্মাহর উপর যেই লাঞ্ছনা চেপে আছে, এর মূল কারণ এই শাসক শ্রেণীই। তারা নিজেদের ভোগ বিলাসিতার জন্য উম্মতে মুহাম্মাদীকে এতিম ও অসহায়ত্বের কয়েদি বানিয়েছে।

মুসলমানরা এখন তাদের হারানো সম্মান ফিরে নিতে চায়। আমেরিকা ও ইউরোপের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে চায়, বেরিয়ে আসতে চায়। পাপে পিষ্ঠ ও নির্যাতনে নিস্পেষিত এই পরিবেশে তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তারা চায় ইসলামের সবুজ বসন্তে বেঁচে থাকতে। একক আল্লাহর হয়ে জীবিত থাকতে। তারা মুসলমানদের ইজ্জতের যিন্দেগী দেখতে চায়। শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন উপভোগ করতে চায়। তারা আর শুনতে চায় না কোনো আফিয়া সিদ্দিকী ও ফাতেমার আহাজারি....!

এই আবেগ শুধু যুবকদের নয়, বুড়োদের নয়, শিশুদের নয়। এই আবেগ পর্দার আড়ালের মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহানী কন্যা এবং আয়েশা ও হাফসার (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আহার) জানেশিনদেরও। তারাও আজ মাথায় কাপড় বেঁধে 'হয় শরীয়ত, নয় শাহাদত' শ্লোগান দেয়।

তাই প্রবৃত্তির উপাসকদের বাঁচানোর জন্য শাসকশ্রেণী, তাদের সামরিক এবং ধর্মীয় মোহাফেজ ও রক্ষীরা, সবাই তৎপর হয়ে উঠেছে। এরা শক্তি দিয়ে জনগণকে দমন করতে চায়। এরা যুবকদের দীনি আবেগকে নিঃশেষ করতে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। এত ব্যাপকভাবে শক্তির প্রয়োগ হচ্ছে, যেন বড় কোনো শত্রু দেশের সাথে যুদ্ধ চলছে। থেমে নেই এলোপাতাড়ি ধর্মীয় অস্ত্রের ব্যবহারও। বিশাল বিশাল ফতওয়া দেয়া হচ্ছে। বক্তারা ওয়াজ করছে। বুদ্ধিজীবীদের কলম থেকে আমেরিকান জীবানুর গন্ধ বের হচ্ছে। যারা আল্লাহর দীনের জন্য জিহাদ করছে, তারা বিদ্রোহী, তারা দেশদ্রোহী। যারা হিন্দুস্তানের প্রতিমার শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে, তারা সন্ত্রাসী। যারা ব্যাভিচারের আখড়া ও মদের বৈধতা (পারমিট/অনুমোদন) দানকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছে, তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। যারা মাসাজ সেন্টার, নাইট ক্লাবের (আইনি) বৈধতা দানকারীদের সাথে কিতাল করছে, তারা খারেজী।

যারা আল্লাহর বিধান পাশ কাটিয়ে গায়রুল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে, আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে তাগুতি জীবনব্যবস্থার পূজা করে, ক্ষমতার জোরে আল্লাহর নিযামকে উপেক্ষা করে, শয়তানি নিযামকে বক্ষে ধারন করে, আল্লাহর হারামকে হালাল করে এবং হালালকে হারাম করে, এদেরকে যারা কাফের বলে- তারা হয় ধর্মদ্রোহী!

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারেজীদের যে সব নিদর্শনের কথা বলেছিলেন, ইনসাফ, আমানতদারি ও সুবিবেচনার সাথে লক্ষ্য করলে বর্তমান মুসলিম জাহানের শাসকদের মধ্যে তার সব নিদর্শনই পাওয়া যায়।

খারেজীদের নিদর্শন

খারেজীদের একটা নিদর্শন হল, তারা বিবাহিত যেনাকারী নারী-পুরুষকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করার বিষয় অস্বীকার করেছিল। আর এ কারণে হযরত ওলামায়ে কেরাম তাদেরকে কাফের বলেছিলেন। কারণ রজমের উপর উম্মতের ইজমা রয়েছে। আর তা ছাড়া 'রজম' নিশ্চিতভাবে জরুরিয়াতে দীন তথা দীনের অত্যবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

এখন আপনিই ফয়সালা করুন যে, মুজাহিদরা কি খারেজী, যারা আল্লাহর জমিনে পরিপূর্ণ দীন প্রতিষ্ঠা করতে চায়? নাকি তারা সেই দলের অন্তর্ভুক্ত, যারা বিবাহিত যিনাকারী নারী-পুরুষকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে এবং দীনের অন্যান্য 'হদ' বাস্তবায়ন করতে স্পষ্টভাষায় অস্বীকার করে?

আল্লাহর আইনের মোকবেলায় অন্য আইন প্রণয়ন করা, রাষ্ট্রক্ষমতার বলে সেগুলো বাস্তবায়ন করা, কোনো মুসলমান আল্লাহর 'হুদুদ' বাস্তবায়ন করলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য গণতন্ত্রের সকল ভিত্তির (পার্লামেন্ট, বিচার বিভাগ, প্রশাসন এবং মিডিয়া) এক জোট হওয়া এবং তাকে নাস্তনাবুদ করার জন্য উঠে পড়ে লাগা। এগুলো কি আল্লাহর নাজিলকৃত শাস্তিসমূহের অস্বীকার করা নয়? যা না-ই হয়, তাহলে তবে অস্বীকারের সংজ্ঞা কি?

খারেজীদের আরেকটি নিদর্শন হল, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, তাদেরকে তাকফীর করা এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের মুহব্বতকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

এবার আপনারাই বিচার করুন, এই যুগের খারেজী কারা? যারা সাহাবায়ে কেরামের মুহব্বতে নিজেদের শরীরকে বুলেটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করছে, তারা? নাকি যারা সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা রক্ষাকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করছে এবং যারা সে সব আসর অনুষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে, যেখানে আমাদের প্রিয়তম সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করা হয়?

এগুলো ছাড়াও খারেজীদের আরও কিছু নিদর্শন হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। সেই হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, একবার গনিমতের মাল বণ্টনের সময় যুলখুইসারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বলে–

হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করুন।

তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমিই যদি আল্লাহর নাফরমানিকারী হই, তো পৃথিবীতে আল্লাহর আনুগত্যকারী কে? আল্লাহ তায়ালা যে আমাকে পৃথিবীতে আমিন বানিয়ে প্রেরণ করেছেন, তুমি কি তা বিশ্বাস কর না? তুমি কি আমাকে আমিন মনে কর না?

এক সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। সম্ভবত তিনি খালেদ বিন ওলিদ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ছেড়ে দাও ওকে। এরপর সে যখন ফিরে যাচ্ছিল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ব্যক্তির বংশধর থেকে (অথবা বলেছেন, এই ব্যক্তির পর) একটি জাতির আর্বিভাব ঘটবে, যারা কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী হতে নিচে নামবে না। এরা দীন হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, তীর যেমন শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। এরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং

মূর্তিপূজারীদেরকে ছেড়ে দিবে। (তাদের সাথে কিতাল করবে না।) আমি তাদেরকে পেলে তাদেরকে আদ জাতির মত হত্যা করব।[২]

এই হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারেজীদের কয়েকটি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন।

১. খারেজীরা কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে নামবে না।

লক্ষ্য করে দেখুন, কুরআন কাদের কণ্ঠনালীর নিচে নামছে না। কার জন্য সূরা ইখলাস পর্যন্ত পড়া কষ্টকর? মুজাহিদদের জন্য নাকি শাসকশ্রেণীর জন্য। আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদরা তো কুরআন শুধু পড়ছে তাই নয়, বরং কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের জান-মাল এমনকি বসতবাড়ি পর্যন্ত কুরবান করছেন। আর এই অপরাধের কারণে শাসকশ্রেণী তাদের উপর ক্ষিপ্ত। এদেরকে গোপন টর্চারসেলগুলোতে নিয়ে অমানবিকভাবে নির্যাতন করা হয়। তাদের একটাই কথা বলা হয় যে, কুরআনের আইন বাস্তবায়নের পথ ছেড়ে নিরাপদ নাগরিক হও। অর্থাৎ কুফরি শাসনব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থাক।

২. এরা দীন হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, তীর যেমন শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়।

আল্লাহর জীবনব্যবস্থা ছেড়ে ইংরেজদের জীবনব্যবস্থার রক্ষী হওয়া, সারা জীবন আল্লাহর কুরআনের পরিবর্তে নিজেদের তৈরিকৃত আইনের উপর ফয়সালা করা, আল্লাহর 'হুদুদ' নিয়ে উপহাস করা, এবং যারা আল্লাহর 'হুদুদ'কে পাশবিক, অমানবিক এবং হিংস্র বলে, তাদেরকে ইজ্জত-সম্মান করা, তাদেরকে নিরপত্তা দেয়া, কাফেরদের সঙ্গী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা- এগুলো দীন থেকে বের হওয়া নয় তো কি?

৩. এরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং মূর্তিপূজারীদেরকে ছেড়ে দিবে।

আপনারাই বলুন, ভারতকে কে বন্ধু বানাচ্ছে? কাশ্মীরকে কে বিক্রি করেছে? কাশ্মীরের শহীদদের রক্তের সাথে কারা গাদ্দারী করেছে? কারা কাশ্মীর ও ভারতের মাটিতে জিহাদ করা থেকে বিরত আছে? কারা জিহাদ করতে বাধা দিচ্ছে? অথচ খোরাসানের মুজাহিদরা এখনো ভারতের সাথে জিহাদ করে যাচ্ছে। আর ভারত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ চালিয়েই যাবে তারা, ইনশাআল্লাহ। বারো বছর ধরে মুসলমানদের রক্ত ঝরিয়ে যাচ্ছে, তারা কারা? পূর্ব সীমান্ত থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে পশ্চিম সীমান্তে মুসলমানদেরকে গণহত্যা করা চালাচ্ছে? ইসলামী রাষ্ট্রে কাফেরদের আক্রমণের পরিপূর্ণ সহযোগিতা কারা করেছে? কাদের ঘাঁটি থেকে

---

[২] .اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. باب ذكر الخوارج وصفاتهم. الجزء الاول ٢٣ .

উড়োজাহাজ উড়ে গিয়ে আফগানিস্তানকে ধ্বংস্তূপে পরিণত করা হয়েছে? কারা মুসলমানদের মেয়েদেরকে বন্দি করে ডলারের বিনিময়ে আমেরিকার কাছে বিক্রি করেছে? কারা উপজাতীয় অঞ্চলগুলোর মাদরাসা মসজিদ মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে? হাট-বাজার ও জনবসতিগুলোর উপর কারা অগ্নিগোলা বর্ষণ করে শ্মশানঘাটে পরিণত করেছে? খারেজী করা, এই সিদ্ধান্ত নিতে আশা করি কারও কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

সালফে সালেহীন তো যাকাত অস্বীকার করা লোকদেরও (নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল।) কাফের বলেছিলেন। অথচ তারা দীনের অন্যান্য সমস্ত বিধান স্বীকার করত। তাহলে এদের কি হুকুম হবে– যারা নামায এবং যাকাতসহ ইসলামের অধিকাংশ বিধান নিজের জীবন থেকে দূর করে দিয়েছে। যারা আল্লাহর হুদুদ বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দুশমনদের সাথে গিয়ে একত্মতা ঘোষণা করেছে। তাদের সাথে জোট করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। মুসলমান মুজাহিদদেরকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। যারা বর্তমানে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে কাফের শক্তি এবং শয়তানী বাহিনীর সাথে একা মোকাবেলা করে যাচ্ছে এবং গোটা মুসলিমবিশ্বের জন্য যারা একমাত্র আশার আলো, এরা যদি পরাজিত হয় আর আমেরিকা যদি বিজয়ী হয়, তাহলে মুসলিম বিশ্বের দিকে ধাবমান এই শয়তানী সেনাবাহিনীকে কে প্রতিরোধ করবে? কোন সেই দেয়াল যা ইহুদীদের বিশাল ইসরাইলের অপবিত্র সঙ্কল্পের পথে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে?

আল্লাহর ঝা-া সমুন্নতকারী দলকে নির্মূল করার এই শক্তি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তাগুতি বাহিনীকে শক্তি জুগিয়ে যাচ্ছে। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের আলোকে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর অবিচল থাকবে এবং কিতাল করতে থাকবে। মুসলিম শরীফের হাদীস–

لَنْ يَبْرَحَ هٰذَا الدِّيْنُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ

> এই দীন অবশ্যই কায়েম থাকবে। আর এর হেফাজতের জন্য মুসলমানদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে।[৩]

ইনশাআল্লাহ, এ সব মুজাহিদ এই হাদীসের মিসদাক, হাদীসে এদেরকেই বুঝানো হয়েছে। এরা আল্লাহর সেই মোবারক লশকর, যারা প্রকাশ্যে শয়তানী বাহিনীকে

---

[٣] صحيح مسلم : الجزء ١٠ كتاب الامارة. باب قوله صلى الله عليه وسلم لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم س

আহ্বান করে তাদের অহমিকার প্রাসাদকে ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। ভবিষ্যতে এই লশকর যে ইমাম মাহদীর সহযোগিতায়ও ময়দানে নামবে, অসম্ভব কিছু নয়।

আমানতদারির সাথে ফয়সালা করুন, খারেজী কারা? যে সব মুজাহিদ ইসলামের দুশমনদের সাথে লড়াই করছে, উম্মতে মুসলিমার নিরাপত্তার জন্য নিজেদের জীবনকে বাজি রাখছে, তারা? নাকি যারা ইসলামের দুশমনদের সাথে মিলে ঈমানদারদের খুনকে নিজেদের জন্য হালাল করছে, তারা?

সিরিয়ার দিকে তাকান। সেখানে শিয়াদের হাতে অবিরাম মুসলমানদের রক্ত ঝরানো হচ্ছে। মুসলমানদের জনবসতি এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হচ্ছে যে, তাদেরকে দাফন করার মতও কেউ নেই। কিন্তু শাসকশ্রেণী ও তাদের তথাকথিত মুসলিম সেনাবাহিনী এ সব মজলুম মুসলমানদের সাহায্যের জন্য কি করেছে? আলহামদুলিল্লাহ, এই মুজাহিদগণই– যারা উজিরিস্তানসহ সমস্ত বিশ্ব থেকে প্রলয়ের গতিতে সিরিয়ায় পৌঁছেছে- শুধুই এই উম্মতের খাতিরে, শুধুই উম্মতে মুহাম্মাদির মা-বোনদের সম্ভ্রম রক্ষার খাতিরে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের জীবন বাঁচানের খাতিরে। কিন্তু আফসোস, তারপরও এরাই নাকি খারেজী!!!

আমেরিকা ও ভারতের সাথে বন্ধুত্ব এবং তাদের সাহায্যকারীরা শান্তিকামী ও পূণ্যবান মুসলমান হয় কি করে? আর যারা উম্মতে মুসলিমাকে বৈশ্বিক স্বৈরতন্ত্রের স্টিমরোলার থেকে মুক্তি দিচ্ছে, সারাবিশ্বের সম্মিলিত কাফের জোটের সাথে জীবনবাজি রেখে লড়াই করে যাচ্ছে, তারা খারেজী হয় কী করে?

সেসব দরবারিদের জন্য আমাদের কোনো অভিযোগ নেই, যারা ইলমের বোঝা মাথায় উঠিয়েছে এমন দিনের জন্য। এতটুকু প্রাপ্তির জন্য। যাদের স্বপ্ন ও চাওয়া পাওয়া ছিল, তাদের ইলম যেন তাদের দুনিয়াবী পদ-পদবী অর্জনের মাধ্যম হয়। সে সব জুব্বা-পাগড়ীদারদের বিরুদ্ধেও আমাদের কোনো অভিযোগ নেই, যারা এফবিআই এবং সিআইএ'র 'দাওয়াতি ফান্ড' থেকে কিতাবের আকৃতিতে বিশাল বিশাল ফতওয়া প্রকাশিত করে। শুধু তাই নয়, বরং তাদের কোলে বসে বই প্রকাশনা অনুষ্ঠানও করে থাকে। তাদের এই বিশাল বপু শরীরের ফতওয়াগ্রন্থ দেখে আমরা পেরেশান নোই। এ নিয়ে আমরা কোনো প্রকার মাথাও ঘামাই না। কারণ তাদের ও আমাদের এই টানাপড়েন তো ঐতিহাসিক। আহলে হক যখনই হকের আওয়াজ বুলন্দ করেছে, সরকারি ও দরবারি আলেমরাও জৌলুশ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তা ছাড়া রণাঙ্গণে দুশমনদের ঘাঁটি থেকে কখনো পুস্পস্তবক উপহার আসে না। জনৈক কবি বড় চমৎকার বলেছেন–

ولقد أمر على اللئيم يسبني

فمضت ثمه قلت لا يعنيني

অভিযোগ তো তাদের প্রতি, যাদের সম্পর্কে আমাদের এই সুধারণা ছিল যে, তারা আহলে হকের কাফেলার পথিক। যাদের সম্পর্কে আমাদের এই ধারণাই ছিল যে, আমরা যদি সম্মুখে অগ্রসর হই তবে পিছন থেকে এরা আমাদের পিঠকে রক্ষা করবে। আমাদের নিরাপত্তার জন্য মজবুত প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে, যারা ভাঙ্গবে তো নত হবে না। তাদের নত হওয়ার ইতিহাস নেই। কিন্তু আফসোস... শত আফসোস...

دیکھا پلٹ کے پیچھے جو کمین گاہ کی طرف
اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی

আফসোস, আপনার কলমের তীর তাদের শরীরেই বর্ষিত হয়, যাদের শরীর আগে থেকেই আমেরিকার ড্রোন, জেটবিমান এবং তোপ-ট্যাঙ্কে ঝাঝরা হয়ে গিয়েছিল। এত বড় দুনিয়ায় আপনার বাগ্মিতার আক্রমণের জন্য আর কাউকে পেলেন না, যাদের উপর বোম্বিং করে কুফরের দুর্গকে দুর্বল করে দেয়া যেত? শুধু মুজাহিদদেরকেই পেলেন? যাদের প্রতিটি গ্রন্থি আগের থেকেই ব্যথাতুর ছিল। কলম দিয়ে মুজাহিদদের অন্তর কর্তন করার পূর্বে একবার তাদের অন্তরে নেমে দেখতেন, আপনদের আঘাত সহ্য করার মত কোনো স্থান অবশিষ্ট আছে কি না? ভদ্রজন তো তরা, কবির ভাষায়–

زخم دینے میں بھی انصاف کیا کرتے ہیں

যারা আঘাত দিতেও ইনসাফ করে।

আপনি আপনার বাক্যবানের অস্ত্র নিয়ে যদি এতটাই আস্থাভাজন হয়ে থাকেন, গর্বিত হয়ে থাকেন, তো দু' চারটা আক্রমণ উম্মতের সেই সব দুশমনদের উপরও করতেন, যারা এই উম্মতকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে ফেলেছে। আমাদেরকে ছাড়া আমেরিকা, ইসরাইল, ভারতের ব্রাহ্মনেতৃত্ব, কুফরের ফ্রন্ট লাইন জোটকে কি আপনাদের চোখে পড়ে না? নিজের বর্তমানকে বাঁচানোর জন্য অতীতকে এভাবেই মুছে ফেললেন? মনে রাখবেন, আপনার লেখার একটি বর্ণও আমাদের বিরুদ্ধে নয়, বরং আপনার প্রতিটি বর্ণ আপনারই অতীতের বিরুদ্ধে। আপনি নিজেই সাক্ষী থাকবেন, অতীতের সম্পর্ক আমরা ছিন্ন করিনি, বরং আমরা আমাদের লাশের পুল বানিয়ে এই উম্মতের বর্তমানকে তার অতীতের সাথে জুড়ে দিতে চাই। অতীতের সম্পর্ককে আপনারাই ছিন্ন করছেন। আসলাফের পবিত্র আঁচল আপনার কলমই ছিন্নভিন্ন করছে!

আমেরিকান গ্রীনকার্ডকে যারা জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছে, জীবনের চাওয়া পাওয়া বানিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিসের অভিযোগ! আমাদের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে যারা শিশুদেরকে হাত ধরে চলা শিখিয়েছে, আর আজ তারা

নিজেরাই অক্ষম হয়ে বসে আছে। গতকালও যারা কাফেলার প্রাণ ছিলেন... পথপ্রদর্শক ছিলেন... যারা তাদের তেজদীপ্ত নির্দেশনার মাধ্যমে কাফেলার তনুমনে চেতনার আগুন জ্বালিয়ে দিতেন... আজ তাদের এ কি হল যে তারা নিজেরাই কোনো পথপ্রদর্শকের অপেক্ষায় আছেন? আর যারা এই কাফেলার মোহাফেজ ছিলেন, পাহারাদার ছিলেন... দেখুন তো কাশ্মীরের কাফেলাগুলোকে মোশাররফ ও তার বাহিনী লুটে নিয়েছে। শুহাদায়ে কাশ্মীরের খুন দিল্লির বাজারে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। কাশ্মীরের বোনদের কণ্ঠও চিৎকার করতে করতে বসে গিয়েছে। চিৎকার কান্না ও ফুফানিতে রূপান্তরিত হয়েছে...। ঝিলামের তরঙ্গমালা আজও পাকিস্তানীদের নামে কাশ্মীরদুহিতাদের অভিযোগ বহন করে আসে। আসাম, গুজরাট, ইউপি, হায়দারাবাদ আজও আমাদের পথ চেয়ে আছে। দিল্লি ও সোমনাথ বিজয় তো অনেক দূরের বিষয়, ভারতের দখল এখন করাচি ও ইসলামাবাদ পর্যন্ত অগ্রসর হচ্ছে। সেই মুসাফিরের চেয়ে অধিক করুণার পাত্র আর কে, যে সারাটা জীবন সফর করল, আর মনজিলের সন্নিকটে এসে ঘুমিয়ে পড়ল। কিংবা পথের ছাউনিকেই মনজিল ভেবে বসে পড়ল?

ইনসাফ করুন... ইনাসাফ! ভদ্রজনেরা দুশমনির ক্ষেত্রেও আমানতদারির সাথে কাজ করে। ইনসাফ করুন! আপনারা আসলাফের বর্ণনাকৃত তাকফীরের অধ্যায়ের (সেই সব মাসআলা যাতে এ কথা আলোচনা করা হয়েছে যে একজন মুসলমান কালেমা পড়া সত্ত্বেও কোন কোন কথা ও কাজের দ্বারা কাফের হয়ে যায়।) আলোকে ফয়সালা করুন যে, ক্ষমতার দাপটে যারা আল্লাহর শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে কি ঈমানদার বলে গণ্য করা যেতে পারে? যারা কাফেরদের সাথে জোট করে ঈমানদারদের হত্যা করাকে আইনসম্মত (হালাল) বলে, তাদেরকে কি মুসলমান বলা ঠিক হতে পারে? যারা ভারতের সাথে মিতালি করে আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তারা কি মুসলমান থাকতে পারে? কুফরি ব্যবস্থায় ফয়সালাকারী আদালতের ব্যাপারে অনড় থাকা, এর হেফাজত করাকে ফরয মনে করা এবং ঈমানদারদেরকে জোরপূর্বক তার অধীনে ফয়সালা মেনে নিতে বাধ্য করা, কুফর ও কাফেরকে সম্মান করা, শাআয়িরুল্লাহ্ (জিহাদ ইত্যাদি) এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপহাস করা, এগুলোই যদি ঈমান হয় তবে কুফর কি? এগুলোই যদি আহলে সুন্নাতের মাসলাক হয় তবে মরজিইয়্যা কারা?

আমাদেরকে একটু বুঝান যে, দীন থেকে যারা খারেজ হয়ে গিয়েছে তাদেরকে কাফের বলাই যদি খারেজী হওয়ার নিদর্শন হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম খলিফা, রফিকে গার, হযরত আবু বুকর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সম্পর্কে আপনারা কি বলবেন, যিনি যাকাত না দেয়ার কারণে তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছিলেন।

অথচ তারা কালেমা পড়ত এবং নামাযও আদায় করত। পরে অন্যান্য সাহাবীও এর সমর্থন করেন। দরবারি ফতওয়াবাজদের নিকট জিজ্ঞাসা, (নাউযুবিল্লাহ) তারা সবাই কি খারেজি ছিলেন?

ইমাম আবু হানিফা রহামতুল্লাহি আলাইহি আবু জাফর মনসুরের বিরুদ্ধে অপসারণের সিদ্ধান্তকে বৈধ ঘোষণা করেন এবং নিজেও কার্যত (আমলি) সহযোগিতা করেন। বলুন, ইমাম আবু হানিফা রহামতুল্লাহি আলাইহিও কি খারেজি ছিলেন? তিনিও কি বর্তমান শাসকের বিরুদ্ধে অপসারণের জন্য জনগণকে উত্তেজিত করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হবেন?

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাতারিদের ইসলাম কবুল করার পরও তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি কি তবে আপনাদের নিকট খারেজী?

ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহির এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী একটা ফরয ত্যাগকারীও কাফের। বলুন, কেউ কি তাকে খারেজী বলেছে?

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি নামায ত্যাগকারীকে কাফের বলতেন। অথচ তাঁর যুগে কেউই তাঁকে খারেজী বলেননি। তাঁর সম্পর্কে আপনাদের রায় কি? তিনি কি খারেজী?

ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

'যে ব্যক্তি জেনে বুঝে নামায ছেড়ে দিবে এমনকি যোহর থেকে মাগরিব এবং মাগরিব থেকে অর্ধ রাত্রি পার হয়ে গেলে সে কাফের হয়ে যাবে। তিন দিন পর্যন্ত তাকে তাওবার সুযোগ দেয়া হবে। এরপরও যদি রুজু না করে এবং এ কথা বলে যে নামায না পড়া কুফরি নয়, তবে তার শিরোচ্ছেদ করা হবে। যখন সে নিজে নামায না পড়বে। আর যদি নামায পড়ে এ কথা বলে, তাহলে এটা ইজতিহাদী মাসআলা। *[মজমু' আল ফতওয়া : ৭/৩০৭]*

এঁর সম্পর্কে আপনাদের অভিমতটা একটু বলুন। আপনাদের দৃষ্টিতে ইনিও কি খারেজী?

হে ওলামায়ে কেরাম! আপনারাই বলুন, খারেজী করা? যারা ভারতের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি করে, তারা? যারা ভারতকে এ সব সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দেয় যে, তারা মুসলমানদের নদীর উপর ড্যাম নির্মাণ করুক? যারা হিন্দুদের সাথে পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে থাকতে চায়? আর অন্যদিকে মুজাহিদদের সাথে যুদ্ধ করে। আল্লাহর দুশমনদের সাথে সমঝোতা করে, তাদেরকে মিত্র বানায় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সঙ্গ দেয়, তাদেরকে সহযোগিতা করে? মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পৌত্তলিকবাহিনীদের সাহায্য করে? ইসলামের মুজাহিদদের

বিরুদ্ধে বদদুআ করে, অভিশাপ দেয়? আমেরিকান সৈনিকদের সহযোগিতার ফতওয়া দেয়। আমেরিকান সেনাবহিনীর সাথে বসে প্রেমের কাব্য রচনা করে এবং তাদের টাকায় বই লেখে। এমনকি মুসলমানদের হত্যা করার জন্য আমেকিরাকে পরামর্শও দেয়। ইনসাফের সাথে বলুন, খারেজী করা?

দ্বিতীয় অধ্যায়

গণতন্ত্রের আলোচনা

গণতন্ত্র সম্পর্কে ভারসাম্যপূর্ণ বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা

গণতন্ত্রের ইসলামী ও অনৈসলামী হওয়ার বিতর্ক নতুন কোনো বিষয় নয়। গণতন্ত্রের জন্মলগ্ন থেকেই ওলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে লেখালেখি আরম্ভ করেছেন। তবে আমাদের যুগে এসে এই বিতর্কের পালে ব্যাপকভাবে হাওয়া লেগেছে। গণতন্ত্র সম্পর্কে চিন্তা ও মতামতে পারস্পারিক দ্বন্দ্বাত্মক মতের অধিকারী দল আমাদের সম্মুখে এসেছে। এক দল শরীয়তের আলোকে গণতন্ত্রকে কুফরি বলেন এবং গণতন্ত্রের কাজে অংশগ্রহণ করাকে সঠিক মনে করেন না। আর অন্য দলের একটি অংশ এতে শাখাগত সংযোজন করে এটাকে ইসলামীকরণ করতে প্রাণন্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আকেরটি অংশের বক্তব্য হল, ইসলামই দুনিয়াকে গণতন্ত্রের শিক্ষা দিয়েছে। পশ্চিমারা ইসলাম থেকেই গণতন্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করেছে। সারকথা হল, দ্বিতীয় দলের দর্শন হল, এই যুগে ইসলামী বিপ্লব এবং মুহাম্মাদি শরীয়ত বাস্তবায়নের কার্যক্রম ও তৎপরতা গণতন্ত্রের মাধ্যমে করাই সঠিক পন্থা।

যে কোনো শিক্ষার্থীর জন্য এই ইখতিলাফ ও মতানৈক্যে একক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কিংবা কোনটা হক কোনটা বাতিল, কার চিন্তাধারা ইসলামী আর কার চিন্তাধারা অনৈইসলামী– এর ফয়সালা করা কঠিন হয়ে যায়। এই জটিলতা আরও বেড়ে যায় যখন দেখা যায় গণতন্ত্রের কুফরির প্রবক্তার মধ্যে শীর্ষ আলেমগণও রয়েছেন। যাদের ইলমী ইসতিদাদই নয় বরং তাদের তাকওয়া ও সততা-সাধুতারও কসম করা যায়। কিন্তু এটাও বাস্তবতা যে অপর পক্ষে যারা এটাকে ইসলামী সাব্যস্ত করেন এবং এতে অংশগ্রহণ করাকে জরুরি মনে করেন, এদের মধ্যেও এমন সব ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যাদের অনুসারী প্রথম দলের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এদের মধ্যেও এমন আহলে ইলম রয়েছেন, যাদের ইলমী মাকাম ও সততা-সাধুতা সবাই স্বীকার করেন।

যে কোনো বিতর্কে যার নিকট দলিল-প্রমাণ বেশি থাকবে অথবা শরীয়তের আলোকে যে দলের কথা হক ও সত্য প্রমাণিত হবে– এটা একটা ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে– মানুষ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে এসব দলিল-প্রমাণের চেয়েও যে বিষয়টাকে অধিক গুরুত্ব দেয় তা হল 'জাতির বড়রা' কাদের সাথে রয়েছেন। এমনকি নবীগণের মত মহান ও পবিত্র ব্যক্তিত্বগণকেও এ ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অথচ দলিল-প্রমাণের আলোকে দেখা হলে তো নবীগণের হক ও সত্যবাদি হওয়ার ক্ষেত্রে কারও সন্দেহ হতে পারে না। নবীদের উপর তো সরাসরি ওহী নাযিল হয়ে থাকে।

সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষের সম্মুখে যখন কোনো দাওয়াত পেশ করা হয়, গ্রহণ করা বা না করার ক্ষেত্রে তারা বড়দের দিকে দেখে। বড়রা যদি সেই দাওয়াত গ্রহণ করেন, সমাজের সাধারণ মানুষও তা গ্রহণ করে। আর সমাজের বড়রা যদি সেই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন, তখন দাওয়াতদাতারা প্রথমেই হোঁচট খায়, জটিলতার সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় দাঈরা বারবার যে প্রশ্ন ও আপত্তির সম্মুখীন হয়ে থাকেন তা হল, আপনি বেশি বোঝেন নাকি বড়রা বেশি বোঝেন। আপনার কথা যদি হকই হত তবে আমাদের বড়রা কেনো গ্রহণ করছেন না?

কিন্তু 'জাতি'র বড়রা কি সব সময় হকের উপর থাকেন? যুবকরা কি সব সময় ভ্রান্তির শিকার হয়ে থাকে? তাদের কাজ ও কর্মপদ্ধতি কি কখনোই সঠিক হয় না? এটা কি ইসলামী শরীয়তের মানদণ্ড যে– বড় ও ছোটদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে বড়দের কথাই গ্রহণযোগ্য এবং আমলযোগ্য হবে? আর হককে কেবল এজন্যই প্রত্যাখ্যান করা হবে যে সমাজের বড়রা ও বিখ্যাতজনেরা তা গ্রহণ করেননি? হক প্রত্যাখ্যানকারীরা কি এ ধরনের আপত্তি পূর্ব থেকেই করে আসছে না? সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমনরাও এমন আপত্তি করত।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

> আর তারা বলল, 'এ কুরআন কেন দুই জনপদের (মক্কা ও তায়েফ) মধ্যকার কোন মহান ব্যক্তির উপর নাযিল করা হল না'? *[সূরা যুখরুফ : ৩১]*

আল্লাহ তায়ালা তিরস্কারের ঢঙে উত্তর দেন–

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

> আপনার রবের রহমতের বণ্টন কি এরা (কাফের) করে? *[সূরা যুখরুফ : ৩২]*

ফয়সালা কি কাফেররা করবে, যে আল্লাহর রহমত কাকে দান করা হবে? আল্লাহর রহমতের উপযুক্ত কে? তারা যাকে বড় মনে করে সে বড়, নাকি আল্লাহ যাদেরকে বড় মনে করেন এবং বড় করতে চান, সে বড়? তাদের কাছে বড়'র মানদণ্ড হল দুনিয়া। দুনিয়ার সুখ্যাতি, চাকচিক্য, বিশাল বিশাল উপাধি এবং টিভি, পত্রপত্রিকা ও কনফারেন্সে যাদের মুখ বেশি দেখা যায়, আল্লাহ তায়ালা এদের মধ্যে দুনিয়া বণ্টন করে দিয়েছেন। আল্লাহর রহমত তাদের ধরাছোয়ার বাইরে। আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন তাকেই কেবল তাঁর রহমত দান করেন।

এমনিভাবে নবীদের দাওয়াতের ইতিহাস খুললে দেখা যাবে বাস্তবে এই আপত্তির কোনো ওজন নেই। কারণ পৃথিবীতে যুগে যুগে যত নবী এসেছেন এবং দাওয়াতের কাজ শুরুকরেছেন, সর্বপ্রথম তাদের সমাজের 'বড়'রাই তাঁর বাধা দিয়েছে। প্রতিবন্ধক হয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে নবীগণ কম বয়েসেরই হতেন। নবীগণের বিরোধিতার ক্ষেত্রে সময়ের বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণই সামনের সারিতে থাকত। অর্থ, মেধা, খ্যাতি এবং জনবলের দিক থেকে সমাজে নবীদের বিরোধীদের মর্যাদা অনেক বেশি হত। আর যারা নবীদের দাওয়াত সর্বপ্রথম গ্রহণ করতেন, তাদের সম্পর্কে এসব বড়দের ভাষ্য হল–

وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا

> তোমাকে কেবল তারাই অনুসরণ করে, (মর্যাদায়) যারা আমাদের চেয়ে ছোট। *[সূরা হুদ : ২৭]*

অনেক সময় এই বড়রা ঈমানদারদেরকে বেওকুফও বলত–

قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ

> মোনাফেকরা বলত, আমরা কি এসব বেওকুফদের মত ঈমান আনব। *[সূরা বাকারা : ১৩]*

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন মূর্তি ভাঙ্গেন তখন তার বয়স (ইবনে কাসিরের বর্ণনা অনুযায়ী) ষোল বছর ছিল। আর চলমান জীবনব্যবস্থার কুফরি হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আরও আগে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন।

এবার চিন্তা করুন, একদিকে 'যুবক' (বড়রা যাদেরকে আবেগীও বলেন।) আর অন্যদিকে জাতির মেধাবী, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিগণ। কিন্তু কার বুকের পাটা রয়েছে যে, খলিলুল্লাহকে আবেগী তরুণ বলে তার কাজকে ভুল বলবে আর জাতির প্রবীণদের কাজকে সঠিক বলবে?

ইমাম ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার তাফসীরে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমার এই হাদীস বর্ণনা করেছেন–

'আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীকে যুবক বয়সে প্রেরণ করেছেন। আর আল্লাহ তায়ালা যেই আলেমকে ইলমে ভূষিত করেন, যৌবনকালেই ভূষিত করেন।' *[তাফসীরে ইবনে কাসির]*

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যায়ন করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে ছিলেন যে, হক ও বাতিলের মাপকাঠি ছোট বড় নয়, হকের মাপকাঠি হল শরীয়তে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট সাহাবা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাঈন মিয়ারে হক, হকের মাপকাঠি। অথচ তাদের অনেকে বয়সে ছোট ছিলেন, অনেকে বড় ছিলেন। এর কারণ সেই হক যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব মহান ব্যক্তিত্তগণকে শিখিয়েছিলেন।

হযরত সাহাবায়ে কেরামের জীবনী খুলে দেখুন। আল্লাহ কম বয়সী অনেক সাহাবীকেই ইলমের দৌলত দান করেছিলেন। ইখতিলাফি মাসআলাগুলোতে বড় বড় সাহাবীরা তাদের দিকে রুজু করতেন। তাদের মতকে গ্রহণ করতেন।

হানাফী মাসলাকে অসংখ্য মাসআলা এমন রয়েছে, যাতে উস্তাদের (ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মতের বিপরীতে শিষ্যের (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মত অনুযায়ী আমল করা হয়। অন্যান্য মাসলাক ও মাযহাবেও একই চিত্র দেখতে পাবেন। এমনকি আহলে হাদীসদের বেলায়ও এমন চিত্র দেখতে পাবেন।

সুতরাং এটি কি পরিমাণ অন্যায় যে আজ আমরা হক বিষয়কে জানা সত্ত্বেও শুধু এজন্য তা প্রত্যাখ্যান করছি যে, 'আমাদের বড়রা' এই হকের সাথে নেই। তবে কি আল্লাহর রহমতের বন্টনের দায়িত্ব মানুষ নিজ হাতে তুলে নিয়েছে? কিয়ামতের দিন কি এরা আল্লাহর সামনে কোনো হুজ্জত কায়েম করতে পারবে? প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবে? বড়দের অনুসরণ করার যুক্তি ও দলিল কি তাদের কোনো কাজে আসবে সেদিন?

এজন্য সুধী পাঠকবর্গের নিকট আমার বিনীত আবেদন, আপনারা এই বিতর্ক পাঠ করার পূর্বে দয়া করে কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের মাথায় বড়দেরকে আনবেন না, যারা বর্তমানে গণতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। বরং উভয় পক্ষের দলিল প্রমাণ নিরপেক্ষভাবে অধ্যায়ন করুন। যাতে হক কবুল করার ক্ষেত্রে হঠকারিতা ও পক্ষপাতিত্ব প্রতিবন্ধক না হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

কোন কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর। *[সূরা মায়েদা : ৮]*

আর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন–

اعرف الرجال بالحق ولاتعرف الحق بالرجال

তোমরা ব্যক্তির মাধ্যমে হক চিনো না বরং হকের মাধ্যমে ব্যক্তিকে চেনো। *[মুখতাসারুত তুহফা আল ইসনা আশারিয়্যাহ]*

সেই সাথে এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট থাকা চাই যে, আদবের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপনায় সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করে আকাবির আহলে ইলমের কারো কোনো ইজতিহাদী ভুল চিহ্নিত করা হলে এর দ্বারা কোনোভাবেই তার মর্যাদাহানী হয় না। আর এর দ্বারা তার ইলমী মাকামকে ছোট করে দেখাও উদ্দেশ্য হয় না। বস্তুত এমনটি কাম্য হওয়া কাঙ্ক্ষিতও নয়। ইসলামের ইতিহাসে বড় বড় ইমামগণ এবং ইলমের স্তম্ভও অনেক সময় দুর্বল মত পেশ করেছেন অথবা তাদের থেকে ইজতিহাদী ভুল হয়ে গিয়েছে। এমন ক্ষেত্রে আমাদের আসলাফের পদ্ধতি এটাই ছিল যে, তারা তাদের ইলমী মাকাম এবং তাদের শান ও মর্যাদা পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করে তাদের ভুলের উত্তম ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন এবং ভুলকে ভুল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

একক কোনো মাসআলায় কোনো আলেমকে ভুল করতে দেখে তার ইলমী মাকাম এবং দীনি খেদমত তুড়ি মেরে উড়ে দেয়া এবং ভদ্রতার মাথা খেয়ে তার ব্যক্তিত্বকে কালিমা লেপন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়া অথবা এর বিপরীতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের পর ব্যক্তি বিশেষকে হক ও বাতিলের মানদণ্ড বানানো এবং তার ভ্রান্তি স্পষ্ট হওয়ার পরও তার প্রতিটি ভুল ইজতিহাদের অনুসরণ করা– প্রান্তিকতা মানসিকতার ফল। প্রান্তিকতা থেকে বেঁচে আসলাফের ভারসাম্যপূর্ণ পথকে আঁকড়ে থাকার মাঝেই মুক্তি। এটাই আমাদের নাজাতের কিশতি।

আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ জলিলুল কদর ব্যক্তিত্বদের ভুল থেকে আমলের সঠিক পদ্ধতি বুঝাতে গিয়ে বলেন–

قد تكون منه هفوة أو زلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده. فلا يجوز أن يتبع فيها. ولا يجوز أن تهدر مكانته وامامته ومنزلته في قلوب المسلمين

জলিলুল কদর কোনো ব্যক্তিত্বের ভুলের শিকার হওয়া অথবা কোনো ক্ষেত্রে তার পদস্খলন ঘটা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু (এই ভুল ও পদস্খলন যেহেতু কোনো ওজরের কারণে হয়েছে, এজন্য) তাকে মাজুর মনে করা হবে। বরং এমনও হতে পারে যে ইজতিহাদী গলতি ও ভুল হওয়ার ভিত্তিতে ইজতিহাদের একটি প্রতিদানও তিনি পাবেন। তবে হ্যাঁ, তার এই ভুলের উপর তার অনুসরণ করা জায়েয হবে না। আবার এ কারণে তার মাকাম ও মর্যাদাকে কালিমা লেপনের চেষ্টা করা এবং মানুষের অন্তরে বিদ্যমান ভক্তি-শ্রদ্ধাকে শেষ করে দেয়াও জায়েয হবে না।[৪]

এই বিষয়ের অধ্যায়নের পূর্বে সুধী পাঠকবর্গের নিকট আরও একটি দরখাস্ত রয়েছে। বইটি এখানেই বন্ধ করুন এবং অযু করে দুই রাকাত সালাতুল হাজাত পড়ুন (নফল নামায পড়ার সময় থাকলে, অন্যথায় শুধু অযু করুন।) এবং রাব্বে কারীমের সামনে সিজদায় পড়ে যান। অন্তরের সমস্ত জানালা হকের জন্য খুলে দিন এবং নিজের অসহায়ত্বের কথা স্বীকার করে আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করুন।

হে আল্লাহ! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। উভয় দিকে বড় বড় ব্যক্তিত্বগণ রয়েছেন। এ অবস্থায় আমি কি করব? এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত?

হে আল্লাহ! আমার অন্তরে হক ঢেলে দিন এবং তা মজবুতভাবে বসিয়ে দিন। এর জন্য আমাকে গোটা দুনিয়ার সাথে লড়তে হলেও।

হে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের রব! আপনি যাকে মূর্তির নগরীতে সৃষ্টি করেও মূর্তি ভাঙ্গার হিম্মত ও সাহস দান করেছিলেন, অথচ তার মোকাবেলায় তার পিতা, চাচা এবং বংশের বড় বড় ব্যক্তিত্ব ও নেতাদের অবস্থান ছিল। আর তিনি ছিলেন তাঁর বড়দের দৃষ্টিতে কম বয়সি আবেগী শিশু।

---

[٤] العمل الاسلامي بين دواعى الاجتماع ودعاة النزاع. اعداد : مركز الدراسات والبحوث الاسلامية في باكستان. مع تقديم الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله. صـ٦٤

হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রব! আমরা স্বীকার করছি আমাদের অন্তরে আমাদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আপনি আপনার হাবীব প্রিয়তম নবীর ভালোবাসা সব ভালোবাসার উপর বিজয়ী করে দিন। আর যেটা হক, যেটা সত্য- আমাদেরকে তা কবুল করার তাওফীক দান করুন। বাতিলের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও দ্রোহ আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিন এবং এগুলোর অনুসরণ করা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন।

আপনি তো সেই সত্ত্বা, যিনি হযরত সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে হকের অনুসন্ধিৎসা দান করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় হক সন্ধান করতে করতে ক্লান্ত হতে থাকেন। হে আল্লাহ! আপনি তো সেই সত্ত্বা, যিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ ও ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, এতাআত-আনুগত্য এবং ভয় ও আশা কেবল আপনার জন্য নির্দিষ্ট। এতে কেউই আপনার শরিক নেই। হে আল্লাহ! আমরাও বিভিন্ন দল, গ্রুপ, ফেরকা ও ব্যক্তিত্বের পিছনে পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে মদদ করুন। বিশেষভাবে আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রাহনুমায়ী করুন, যেমন মদদ করেছিলেন আসহাবে কাহাফকে। হে আল্লাহ! আপনি তো সেই সত্ত্বা, যিনি খালেক, আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আবার আইন ও নিয়ম-নীতিও তৈরি করেছেন আপনিই। দয়া করে আপনি এই উম্মতের প্রতি রহম করুন, করম করুন। হকের জন্য আমাদের সবার অন্তরকে উন্মুক্ত করে দিন। এই হক আমাদের নফসের জন্য যত তিক্তই হোক না কেনো। আমীন।

গণতন্ত্র (Democracy) কি

এটা যেহেতু একটা পরিভাষা (Terminology), যাকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়, এজন্য পরিভাষার মূলনীতি হল, এর সেই সংজ্ঞাই ধর্তব্য হবে যা এর প্রণয়নকারীরা বর্ণনা করেছেন।

Democracy এর অর্থ

শব্দটি মূলত গ্রীক। Demos এবং Kratos দু'টি শব্দের সমন্বয়ে এই শব্দটি গঠিত হয়েছে।

Demos এর অর্থ : People বা জনগণ।

আর Kratos এর অর্থ Rule বা শাসন।

অর্থাৎ Rule of the people জনগণের শাসন।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

Democracy : Free and equal representation of people.

A government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation usu. involving periodically held free elections.

Democratic System of Government : A system of government based on the principle of majority decision-making. *[Encarta 2009; Encyclopaedia Britannica 2012.]*

গণতন্ত্র : মানুষের স্বাধীন ও যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব

এটি এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যাতে মূল ক্ষমতা সাধারণ জনগণের নিকট থাকে। সাধারণ জনগণই পরোক্ষভাবে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধি থাকে। যারা সাধারণত নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা : এটি এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এটি এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা যাতে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব মহান আল্লাহর পরিবর্তে সাধারণ জনগণের হাতে ন্যস্ত হয় (নাউযুবিল্লাহ) এবং সর্বসাধারণের রায়ের ভিত্তিতে সরকার নির্বাচন করা হয়। রায়ের ক্ষেত্রে ইলম ও তাকওয়ার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্রে তা উপেক্ষিত থাকে। এখানে সবাই সমান (অর্থাৎ একজন আলেম ও একজন জাহেল, একজন পাপিষ্ঠ ও একজন নেককার সমান গুরুত্ব বহন করে)। এটি এমন একটি সরকারব্যবস্থা যাতে মানবজ্ঞানই জীবনব্যবস্থা তৈরিকারী এবং মানুষের জন্য জীবনবিধান প্রণয়নকারী, ওহীর এখানে কোনোই দখল নেই। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি যাকে উপকারী সাব্যস্ত করে, তা উপকারী। আর যাকে ক্ষতিকর বলে, তা ক্ষতিকর। যাকে হারাম (বেআইনী) সাব্যস্ত করে তা হারাম, আর যাকে হালাল (আইনসম্মত) সাব্যস্ত করে, তা হালাল। ওহী (কুরআন ও হাদীস) কখনো এই জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির চাওয়ার সাথে মিলে

যেতে পারে। কিন্তু কুরআন ও হাদীস এই জীবনব্যবস্থায় (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ ও তার রাসূলের ফরমান হিসেবে আমলযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়নি। বরং মানুষ এটাকে আমলযোগ্য মনে করেছে বলে এটাকে আইনে পরিণত করা হয়েছে। এমনকি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা এ কথা প্রমাণ করে যে, এই জীবনব্যবস্থায় মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি এবং জনমানুষের প্রত্যাশাকে কুরআন সুন্নাতেরও (ওহী) উর্ধ্বের মনে করা হয় এবং এর চেয়ে অনেক বেশি মূল্যায়ন করা হয়।

গণতন্ত্র ও ইসলাম কি এক জিনিস

গণতন্ত্রকে যারা ইসলামী বলেন অথবা ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যম বানানোর পক্ষে, তাদের দলিলসমূহ

১. গণতন্ত্রকে অনেকে হুবাহু ইসলাম বলেন। তাদের দলিল হল, ইসলামও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রবক্তা। আর গণতন্ত্রও এই কথাই বলে। সুতরাং গণতন্ত্রই ইসলাম এবং ইসলামই গণতন্ত্র।

২. তারা বলেন, শরীয়তও শূরা ব্যবস্থার অধীনে খলিফা নির্বাচন করে। আর গণতন্ত্রও এই কথাই বলে। সুতরাং উভয়টি একই জিনিস। ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

৩. গণতন্ত্র ব্যবস্থায় জড়িত, যাদেরকে ধার্মিক মনে করা হয়, তাদের আকিদা হল- তারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে শরীয়ত প্রবর্তন করবেন। অর্থাৎ এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করবেন। তাদের আকিদা অনুযায়ী গণতন্ত্র ছাড়া এমন আর কোনো পথ-পন্থা নেই, যার মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা যেতে পারে। সব পথ-পন্থাই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সুতরাং গণতন্ত্রই একমাত্র পথ, যে পথে সারা বিশ্বে শরীয়ত প্রবর্তন হতে পারে। যাহোক, এই শ্রেণীও গণতন্ত্রকে কুফর মনে করেন না। তাদের বক্তব্য হল, গণতন্ত্রের যে বিষয়গুলো কুফরি, আমরা সেগুলো মানি না। আমরা কুরআন ও সুন্নাহ সম্মত গণতন্ত্র মানি।

৪. গণতন্ত্রের সাথে জড়িত কোনো কোনো ধার্মিক ব্যক্তিত্ব এই ব্যবস্থাকে এ পর্যায়ের কুফরি তো মনে করেন কিন্তু তাদের বক্তব্য হল, তারা অপারগ হয়ে এই ব্যবস্থায় জড়িত হয়েছেন। যাতে এর মাধ্যমে মুসলমানদের হক ও অধিকারসমূহ রক্ষা করা যেতে পারে। হিন্দুস্তানের ধর্মীয় রাজনৈতিক লিডারদেরও দাবি এই যে, তারা এই ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে

পার্লামেন্টে না গেলে মুসলমানদের অধিকারের পক্ষে আওয়াজ তুলবে কে? মুখ খুলবে কে?

৫. এই ব্যবস্থায় জড়িত একটি শ্রেণী এ কথা বলে যে, দেশের আইন ইসলামী হলে গণতন্ত্র ব্যবস্থায় শরিক হওয়া পাপের কোনো বিষয় নয়। মানে এরাও গণতন্ত্রকে কুফর মনে করেন না।

গণতন্ত্রকে যারা কুফর বলেন তাদের দলিলসমূহ

পূর্বেই বলেছি যে, গণতন্ত্র বিশেষ একটি পরিবভাষা। সুতরাং এর সে সংজ্ঞাই বিশ্বাসযোগ্য হবে, যা পরিভাষা রূপদানকারীরা করেছেন। কেউ ইচ্ছামাফিক সংজ্ঞা দিলে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কারণ পরিভাষার সেই অর্থই বিশ্বাসযোগ্য হয়, যার জন্য সেটাকে তৈরি করা হয়েছে।

সুতরাং যখনই গণতন্ত্র শব্দটি বলা হবে, এর সেই অর্থ-মর্মই উদ্দেশ্য হবে, যা এর প্রণয়নকারীরা বর্ণনা করেছেন। আর তা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। সেই সাথে এ কথাও স্পষ্টভাবে জেনে রাখা উচিত যে, এখানে আমরা 'ইসলামী গণতন্ত্র' নামক কোনো কাল্পনিক দর্শনের কথা বলছি না, যা গণতন্ত্রের সাথে জড়িত কোনো কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের বক্তব্য অনুযায়ী তারা ক্ষমতায় এসে বাস্তবায়ন করবেন। কারণ ৬৫ বছর ধরে এই কাল্পনিক রূপ বইয়ের ভেতর মলাটবদ্ধ রয়েছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও তার রূপ দাঁড়াতে পারেনি। তাই এটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। (যদিও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং পরিপূর্ণ ঈমান হল গণতন্ত্রকে ইসলামী বানানো তেমনই অসম্ভব, যেমন অসম্ভব মূর্তিঘরকে ইসলামী মূর্তিঘর এবং মদ্যশালাকে ইসলামী মদ্যশালা বানানো।) আমরা এখানে প্রচলিত সেই গণতন্ত্র ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছি, যা ৬৫ বছর ধরে কার্যত বাস্তবায়ন হয়ে আসছে। যাতে এসব ধর্মীয় দলগুলোও শরিক রয়েছে। নিঃসন্দেহে দেশে আক্ষরিক আর্থে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত এই গণতন্ত্র সেই অর্থেরই ধারক গণতন্ত্র, যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি।

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পরিভাষাসমূহ ও তার মর্ম

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রণয়নকারীরা সাধারণ মুসলমানদেরকে বেশি ধোঁকা দিয়েছে তাদের প্রণয়নকৃত পরিভাষার মাধ্যমে। এরা এগুলোকে অত্যন্ত চতুরতার সাথে ব্যবহার করে থাকে। কোনো মুসলমান এই পরিভাষাগুলোর অর্থ ও মর্ম বুঝলে গণতন্ত্রের তাৎপর্য তার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

শরীয়ত অর্থে আইন

ইসলামে 'শরীয়ত' শব্দটি যেই অর্থে ব্যবহৃত হয়, গণতন্ত্রে একই অর্থে 'আইন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বলে থাকি, এ কাজটি শরীয়ত সম্মত, এ কাজটি শরীয়ত পরিপন্থি। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বলা হয়, এ কাজটি আইন সম্মত এবং এ কাজটি আইন বিরোধী। শরীয়তে মুহাম্মাদী অস্বীকারকারী যেমন শরীয়ত থেকে খারেজ হয়ে যায়, তাওবা না করলে তার শাস্তি মৃত্যু। তেমনিভাবে গণতন্ত্রের শরীয়ত (আইন) অস্বীকারকারীকেও এই শরীয়তের বিদ্রোহী বলা হয়। তাওবা না করলে ভারতে তার শাস্তি সেটাই যা কাশ্মিরের মুসলমানদেরকে দেয়া হচ্ছে। পাকিস্তানে তার শাস্তি সেটাই যা সোয়াতবাসী এবং জামেয়া হাফসার ছাত্রীদেরকে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই শরীয়তের রক্ষী সেনাবাহিনীর হাতে জনগণের সম্পদকে গণিমতের মাল সাব্যস্ত করে লুট করা আর বিদ্রোহীদেরকে হত্যা করা।

আকিদা অর্থে চিন্তাধারা (নজরিয়া)

'আকিদা' শব্দটি শরীয়তে যেই অর্থে ব্যবহৃত হয়, গণতন্ত্রে একই অর্থে 'চিন্তাধারা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এজন্য গণতন্ত্রী কোনো ব্যক্তি যখন এ কথা বলে যে, আমার চিন্তাধারা এই, তার অর্থ সে বলছে, আমার আকিদা এই।

হালাল অর্থে 'আইন সম্মত'

মুহাম্মাদী শরীয়তে যেভাবে 'হালাল' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তেমনিভাবে গণতন্ত্রের শরীয়তে 'আইন সম্মত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় যদি বলা হয় 'মদ বিক্রি করা এবং মদ পান করা আইন সম্মত', এর অর্থ হল গণতন্ত্রের সমাজে মদ পান করা এবং মদ বিক্রি করা হালাল। এমনিভাবে সুদী লেনদেন করাও হালাল।

হারাম অর্থে 'বেআইনি'

মদ্যপায়ীর সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও আশি বেত্রাঘাত করা 'বেআইনি'। এ কথার অর্থ হল, সাক্ষী থাকার পরও মদ্যপায়ীকে আশি বেত্রাঘাত করা হারাম। শরীয়ত সম্মত সাক্ষী বিদ্যমান থাকার পরও বিবাহিত যেনাকারি নারী-পুরুষকে প্রস্তারাঘাত করা বেআইনি। এ কথার অর্থ হল, গণতন্ত্রের শরীয়তে এমন করা হারাম। এমনিভাবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য জিহাদ করা বেআইনি, অর্থাৎ জিহাদ করা হারাম।

ফরয অর্থে ডিউটি (Duty)

গণতন্ত্রের শরীয়তে যখন ডিউটি শব্দটি বলা হয়, এর অর্থ হল এই কাজ করা তার উপর ফরয। এমনকি এই ফরয আদায় করাকে ইবাদতও বলা হয়। এই দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার ক্রটি হলে অথবা একেবারে বাদ দিলে, পুলিশ ও সেনাবাহিনী এটাকে শাস্তিযোগ্য মনে করে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে এই অর্থের জন্য 'ফরয' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো বিষয়কে নিজের উপর এমন আবশ্যক জ্ঞান করা যে, তা করার দ্বারা 'লাভ ও প্রতিদান' প্রাপ্তির ইয়াকিন করা, আর না করার কারণে 'ক্ষতি, গুনাহ ও শাস্তি' পাওয়ার আকিদা রাখা।

ভোট কি শরীয়ত সম্মত পরামর্শ

বর্তমানে কোনো কোনো ব্যক্তি এই কুফরি ব্যবস্থাকে ইসলাম প্রমাণের জন্য গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে ইসলাম প্রদত্ত শূরাদর্শনের সমার্থক প্রমাণ করতে চান এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত শোনান–

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

> আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা আমনতকে তার প্রাপকের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। *[সূরা নিসা : ৫৮]*

আর ভোটও একটা আমানত। এজন্য এই আমানতও তার প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।

আসুন, নির্বাচন ও শরীয়ত প্রদত্ত পরামর্শের দর্শনের মাঝে কতিপয় মৌলিক পার্থক্য জেনে নিই। এতে আমরা জানতে পারব যে, ভোট সত্যিই কোনো আমানত অথবা পরামর্শ কি না। নাকি এটি একেবারেই ভিন্ন একটা দর্শন।

১. ইসলামে পরামর্শ নিছকই একটি রায়। এই রায় গ্রহণও করা যেতে পারে প্রত্যাখ্যানও করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে যে ভোট গ্রহণ করা হয়, এতে সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

২. ইসলামে যাদের সাথে পরামর্শ করতে বলা হয়েছে, তারা এমন ব্যক্তি হবেন, আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে পরামর্শ ও রায় প্রদানের যোগ্যতা দান করেছেন। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় ভোট সবার অধিকার। জ্ঞানী-মূর্খ,

ব্যাভিচারী-আল্লাহর ওলী, কাফের-মুসলমান সবাই সমান। গণতন্ত্রে এদের সবার মান এক বরাবর।

৩. শরীয়তের আলোকে মুসলমানদের বিষয়ে কাফের, মুরতাদ ও জিন্দিক পরামর্শ দিতে পারে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় এরা সবাই সামান অধিকার রাখে। মুসলমানদের বিষয়েও এরা পরামর্শ দিতে পারে।

৪. কোন কোন বিষয়ে পরামর্শ করা হবে, ইসলামে তা নির্দিষ্ট রয়েছে। যেমন দ্বীনের মৌলিক নীতিমালাগুলোর উপর পরামর্শ করা যায় না। বরং এগুলোর উপর হুবাহু আমল করতে হবে। পক্ষান্তরে নির্বাচনে তো একদিকে ইসলাম বাস্তবায়নের দাবিদার, অন্যদিকে খাঁটি সেকুলারেজমের ধ্বজাধারী দাঁড়ায়। আর জনগণ যদি সেকুলারকে গ্রহণ করে এবং সেকুলারদলকে বেশি ভোট দেয়, তবে 'জনগণের ম্যান্ডেট'কে সম্মান জানানো আবশ্যক হয়ে যায়। (নাউজুবিল্লাহ–আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।)

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দৃষ্টান্ত

কতিপয় বখাটে হারাম ও অবৈধ কোনো কাজ করার জন্য একত্রিত হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, এবার এই হারাম কাজ কে করবে? এর ফয়সালা জনগণ করবে। যাহোক, জনগণকে বলা হল, আপনারা যাকে এই হারাম কাজের জন্য ভোট দিবেন, এবার সেই করবে। এখন যদি কোনো ব্যক্তি এখানে দাঁড়িয়ে এ কথা বলে যে, ভাই এটা পরামর্শ। আর পরামর্শ আমানত। আপনিই বলুন, হারাম কাজে পরামর্শ দেয়া কি জায়েয আছে? এটাকে কি আপনি আমানত বলবেন?

শরীয়ত ও গণতন্ত্রে চুক্তি এবং সমঝোতা দর্শন

কুফরির দাসত্ব, জিহাদের প্রতি ঘৃণা আর জীবনের প্রতি মায়া– মুসলমানদেরকে এ পরিমাণ হীনমন্য করে দিয়েছে যে উসূল ও ইকদারই (Principles & Values) উল্টে গিয়েছে। লাঞ্ছনাকে সম্মান বলে দেয়া হয়েছে আর পরাধীনতাকে স্বাধীনতা।

বর্তমানে গণতান্ত্রিক লোকেরা বিধর্মীদের দাসত্ব এবং তাদের সাথে জোট করাকে সমঝোতা ও চুক্তি বলে থাকে এবং সীরাতের বিভিন্ন ঘটনার সামনে-পেছনে কর্তন করে দলিল দেয় যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মদীনার ইহুদীদের সাথে চুক্তি করেছিলেন। বলা বাহুল্য, আসলাফ চুক্তি ও সমঝোতার সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন–

হানাফী মাযহাবের সংজ্ঞা

الصُّلحُ تَرْكُ الْقِتَالِ مُؤَقَّتًا

একটা সময় পর্যন্ত কিতাল না করার সমঝোতা করা। *[বাদায়ে সানায়ে : ৭/১০৮]*

মালেকী মাযাহাবের সংজ্ঞা

صلح الحربي مدة ليس هو فيها تحت حكم الاسلام

হরবিদের সাথে একটা সময় পর্যন্ত সমঝোতা করা, যেখানে তারা ইসলামের আইনের অধীন হবে না। *[আশশারহুল কাবীর মাআ হাশিয়াতুদ দাসুকী : ২/২০৬]*

শাওয়াফেদের সংজ্ঞা

مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره سواء

فيهم من يقر منهم على دينه ومن لم يقر

হরবি কাফেরদের সাথে একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কিতাল বন্ধ রাখার উপর সমঝোতা করা, কোনো জিনিসের পরিবর্তে অথবা বিনিময় ছাড়া। চাই তাদের মধ্যে কেউ তার ধর্ম স্বীকার করুক বা না করুক। *[মুগনিউল মুহতাজ : ৬/৮৬]*

হাম্বলীদের সংজ্ঞা

أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة عوض وبغير عوض

হরবিদের সাথে একটা সময় পর্যন্ত কিতাল না করার উপর সমঝোতা করা, কোনো জিনিসের পরিবর্তে অথবা বিনিময় ছাড়া। *[১২) –মুগনী : ৯/২৩৮]*

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম রহ. এর সংজ্ঞা

مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره

- হরবি কাফেরদের সাথে একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কিতাল বন্ধ রাখার উপর সমঝোতা করা, কোনো জিনিসের পরিবর্তে অথবা বিনিময় ছাড়া। *[আলখুলাসাহ ফি আহকামি আহলিযযিম্মাহ: প্রথম খণ্ড আবু হামযাহ আশশামী]*

এজন্য হযরত ফুকাহায়ে কেরাম সমঝোতাকে 'মুয়াদাআত'ও (موادعت) বলেছেন। যার অর্থ একটা সময়ের জন্য কাফেরদের সাথে কিতাল ও জিহাদ বন্ধ রাখা অথবা আকস্মিক জিহাদ বন্ধ করা। এরপর আয়েম্মায়ে আরবা–চারো ইমাম এ বিষয়ে এক মত যে, এই চুক্তি ও সমঝোতা নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত হবে। সেই সাথে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখা উচিত যে, সমস্ত ইমামের নিকট সমঝোতা কেবল সেই অবস্থায় বৈধ, যেখানে ইসলামের কোনো ফায়দা ও উপকার রয়েছে। এ ছাড়া সমঝোতা করা জায়েয নেই। অর্থাৎ শাসকশ্রেণী যদি শুধু তাদের বিলাসিতার জন্য এবং তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য এই সমঝোতা করে, তবে এটা কোনোভাবেই বৈধ হবে না।

উদাহরণ

এবার এই সমঝোতাকে কল্পনা করুন যা হযরত ফুকাহায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন। ইসলামী লশকর কাফেরদের দেশের পর দেশ জয় করে সেখানে ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করে চলছে। এক পর্যায়ে খলিফা উপলব্ধি করলেন যে, এখন মুজাহিদদের কিছু সময় বিশ্রাম প্রয়োজন। অথবা রসদ সঞ্চয়ের জন্য কিছু সময় যুদ্ধ বিরতি দেয়া প্রয়োজন। অথবা যে কওমের উপর আক্রমণ করতে হচ্ছে, তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা রয়েছে। অথবা তারা ট্যাক্স দিতে রাজি আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কাফেররা তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য সমঝোতা চুক্তির আবেদন করে। খলিফা তাদেরকে বলেন, আমি তোমাদেরকে এই শর্তে কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি যে, তোমরা অধীনস্থ হয়ে আমাদেরকে ট্যাক্স দিবে। কিন্তু তোমাদের দেশে আমাদের ইসলামী আইন চলবে। অথবা এই সূরত হতে পারে যে, খেরাজ বা খাজনা দাও আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু দিনের জন্য কিতাল মূলতবি করছি।

এটা হল ফুকাহায়ে কেরামের কিতাবে বর্ণিত সমঝোতার রূপ।

আর বর্তমানের অবস্থা হল এই যে, আমরা কাফের বিধর্মীদের কাছে মিনতি করতে থাকি যে, আমাদেরকে বেঁচে থাকতে দাও। আমাদেরকে জানে মেরো না। আমরা তোমাদের দাজ্জালী নিউওয়ার্ল্ড অর্ডারের অধীনে জীবন যাপন করতে রাজি আছি। আমরা তোমাদের আনুগত্য করব। আল্লাহর কুরআনের পরিবর্তে জাতি সংঘের শয়তানী চার্টারকে মনে প্রাণে মেনে নেব। বৈশ্বিক সম্পর্ক ইসলামের পরিবর্তে জাতিসংঘের সংবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা করব। আন্তর্জাতিক শয়তানী প্রতিষ্ঠান কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করলে সেখানকার মুসলমানদেরকে সহযোগিতা করা আমাদের জন্য হারাম। আমরা পার্থিব স্বার্থে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সঙ্গ দেব। আমাদের দেশে সুদি ব্যবস্থা জারি করব এবং এগুলোর নিরাপত্তার জন্য আমাদের পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করব। আমরা কাফেরদের দেশে থাকব এবং কাফের দেশের সব শর্ত মেনে নেব। আপনারা শুধু আমাদেরকে একটু জানে বেঁচে থাকতে দিন।

একটু কল্পনা করুন, কোথায় ইসলামী সমঝোতা এবং চুক্তি আর কোথায় বর্তমানের কাফেরদের জোট! কাফেরদের সাথে জোট গঠনকে সমঝোতা ও চুক্তি বলা ইসলামী পরিভাষার স্পষ্ট বিকৃতি (তাহরিফ)।

গণতন্ত্রের পরিভাষা না বোঝার ভয়ানক ফল

গণতন্ত্রের পরিভাষাগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা না করার কারণে এই ক্ষতি হচ্ছে যে, ওলমায়ে কেরামের নিকট যখন কোনো মাসআলা বা ফতওয়া জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা গণতান্ত্রিক পরিভাষাগুলো সামনে রাখে না, যা এই ব্যবস্থায় প্রচলিত রয়েছে। বরং তারা শরীয়তের পরিভাষা সামনে রেখে ফতওয়া দেন। বিষয়টি বোঝার জন্য এখানে কয়েকিট দৃষ্টান্ত পেশ করছি। যার দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝে আসবে যে ওলামায়ে কেরাম যে ফতওয়া দেন, সাধারণত এ ক্ষেত্রে তাদের অসাধুতা না থাকলেও পরিভাষার পরিবর্তনের কারণে সাধারণ মানুষ ধোঁকা খাচ্ছে।

প্রশ্ন : ওলামায়ে কেরামের নিকট যদি ফতওয়া জিজ্ঞাসা করা হয় যে নিম্নোক্ত হারাম কাজে সহযোগিতা করা কেমন :

১. পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর কুফরি ব্যবস্থা এবং সুদি কারবার রক্ষায় ভূমিকা পালন করা কেমন?

২. পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর নাইট ক্লাব, মদ্যশালা, পতিতালয় এবং নাচগানের আসরে নিরাপত্তা দেয়া কেমন?

৩. পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কেমন?

বলার অপেক্ষা রাখে না, ওলামায়ে কেরাম উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর এই উত্তরই দিবেন যে, উল্লেখিত কাজগুলো হারাম এবং কবিরা গুনাহ। আর কবিরা গুনাহে সহযোগিতা করা হারাম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

গুনাহ ও অন্যায়ের (ভিত্তির) উপর পরস্পরে সহযোগিতা করবে না। *[সূরা মায়েদা : ২]*

সুতরাং হারাম ও অবৈধ কোনো কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করাও কবিরা গুনাহ।

ফতওয়ায় সাধারণত এতটুকুই উত্তর দেয়া হয়, যতটুকু প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে বা প্রশ্নের সাথে যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে। প্রশ্নে যেহেতু শুধু এই কাজগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সুতরাং এই কাজগুলো কবিরা গুনাহ। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হল–

لايكفر مسلم بذنب مالم يستحله

কবিরা গুনাহ করার কারণে কোনো মুসলমানকে কাফের বলা হবে না, যতক্ষণ না সে ওই কাজকে (কবিরা গুনাহকে) হালাল ও বৈধ মনে করে।[৫]

প্রশ্নকারী প্রশ্নই করেছে অসম্পূর্ণ। এজন্য উত্তরও পেয়েছে অসম্পূর্ণ। বিদ্যমান কুফরি ব্যবস্থা সামনে রেখে পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন এভাবে হওয়া উচিত ছিল:

এমন 'কালেমাওয়ালা' ব্যক্তি, যার আকিদা হল বিশেষ একটা শ্রেণীতে প্রবেশ করার পর অথবা বিশেষ একটা চাকরি নেয়ার পর নিম্নোক্ত কাজ তার জন্য শুধু হালালই নয় বরং পবিত্র ফরয (Duty) এর মর্যাদা রাখে। আর এ সব কাজ করতে গিয়ে কখনো মুসলমানের জীবন নেয়াও কি তার জন্য বৈধ এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করা তার দায়িত্ব এবং সৌভাগ্য ও শাহদতের বিষয় হয়? কাজগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল–

১. সুদি কারবারী এবং সুদি কেন্দ্রের (যেমন ব্যাংক ইত্যাদির) নিরাপত্তা বিধান করা এবং নিরাপত্তা বিধান করাকে নিজের জন্য ফরয জ্ঞান করা? এর হেফাজতের জন্য যে কোনো মুসলমানের জীবন নেয়া কিংবা নিজের জীবন দেয়াকে পবিত্র দায়িত্ব মনে করা?

---

[৫] الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والاكبر للامام أبي حنيفة رحمه الله عليه : الجزء الاول. بيان أصول الايمان. باب لايكفر مسلم بذنب مالم يستحله

২. নাইট ক্লাব, মাসাজ সেন্টার, মদ্যশালা, পতিতালয়, নাচগানের কনসার্টের পাহারাদারী করাকে নিজের জন্য আইনসম্মত বা হালাল মনে করা এবং এটাকে নিজের ডিউটি বা ফরয বলা কেমন?

৩. এমন আসর-অনুষ্ঠানের পাহারাদারীকে নিজের জন্য আইনসম্মত (হালাল) মনে করা যেখানে মহান ব্যক্তিত্বদেরকে (হযরত সাহাবায়ে কেরাম) গালি দেয়া হয়, যাদেরকে ভালোবাসা প্রতিটি মুসলমনানের আকিদার অংশ, তা কেমন?

৪. অফিসার বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে শরীয়তের আইন বাস্তবায়নের দাবিদার এবং কুরআন পড়ুয়া মাসুম নিঃস্পাপ-নিরাপরাধ মেয়েদেরকে হত্যা করা, মসজিদে আক্রমণ করাকে নিজের জন্য হালাল ও আইন সম্মত মনে করা, খতমে নবুওয়াতের আকিদার হেফাজত এবং সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার হেফাজতের জন্য পথে নেমে আসা মুসলমানদের উপর গ্যাস নিক্ষেপ, গরম পানি নিক্ষেপ এবং লাঠি চার্জ করাকে নিজেদের জন্য আইন সম্মত বা হালাল মনে করা কেমন? এবং এ কথা বলা যে, আমরা তো আমাদের অফিসারদের নির্দেশ পালন করছি?

উত্তর : এইভাবে যদি প্রশ্ন করা হয় এবং বাস্তবতাকে সঠিকভাবে বর্ণনা করা হয়, তো উত্তরের ভেতরও নিঃসন্দেহে ভিন্নতা আসবে।

উপরে উল্লেখিত কাজগুলো যে কবিরা গুনাহ, এতে ওই সব সরকারি ও দরবারি আলেমদেরও সন্দেহ নেই যারা প্রতিদিন এমন সব ফতওয়া প্রদান করে থাকে। যার পুরো ফায়দা আমেরিকা, ভারত এবং তাদের মিত্ররা লাভ করে থাকে। সুতরাং এই সব কাজ যখন সর্বসম্মতক্রমে কবিরা গুনাহ, তো এ বিষয়ে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত যে, কবিরা গুনাহকে যে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা দ্বারা নিজের জন্য হালাল ও বৈধ মনে করা কুফরি। এমন কুফরি যা মিল্লাত থেকে খারেজ করে দেয়, বের করে দেয়।

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার যেই রূপটি দাঁড়ায় তা হল, পুলিশ হোক কিংবা সেনাবাহিনী, তারা যে ডিউটিই দিক না কেন, বিশেষত গণতন্ত্রের শরীয়ত যেই ডিউটিকে জায়েয এবং হালাল (আইন সম্মত) সাব্যস্ত করেছে, সৈনিকরাও সেই ডিউটিকে নিজের জন্য জায়েয এবং হালাল (আইন সম্মত) মনে করে থাকে। ইমারতে ইসলামীয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার সঙ্গী হওয়া, মুসলমানদেরকে হত্যা করার ক্ষেত্রে কাফরদেরকে সাহায্য করা, এই সৈনিকেরা নিজেদের জন্য আইন সম্মত বা হালাল মনে করত। এমনিভাবে জামেয়া হাফসা এবং সোয়াতে শরীয়তের আইন প্রবর্তনের দাবিদারদেরকে হত্যা করা, তাদের ধন-সম্পদ লুট করা, তাদের মেয়েদেরকে তুলে নেয়া– এসব সৈনিকেরা নিজেদের জন্য আইনসম্মত বা হালাল মনে করে করেছে। কোনো সৈনিক যদি মুসলমানের রক্তকে এই অপব্যখ্যায় বৈধ মনে করে যে এরা সন্ত্রাস, তবে তাদের এই ব্যখ্যা তাদেরকে কুফরি থেকে বাঁচাতে

পারবে না। এর বিস্তারিত আলোচনা এবং দলিল প্রমাণ আরো পরে সংশ্লিষ্ট আলোচনায় আসবে।

তবে কোনো পুলিশ বা সৈনিক যদি এসব শরীয়ত পরিপন্থি পদক্ষেপকে হারাম মনে করে, নিজেকে অপরাধী স্বীকার করে এবং হারামকে হালাল সাব্যস্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত না হয়, তবে তাকে কাফের বলা যাবে না। বরং তাকে শুধু ফাসেক বলা হবে।

হ্যাঁ, তাকে এ কথা ভাবতে হবে যে, আমি অনেক বড় কবিরা গুনাহে লিপ্ত, যার কারণে আল্লাহ তায়ালা আমার উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হবেন! সেই সাথে তাকে এ বিষয়টিও মনে রাখতে হবে যে, অনেক ক্ষেত্রে এই অপরাধগুলো এতই ভয়ঙ্কর যে, এগুলোকে হালাল ও বৈধ মনে না করলেও– শুধু লিপ্ত হওয়াটাই কুফরি। যেমন কাফেরদেরকে খুশি করার জন্য মুসলমানদেরকে হত্যা করার ঘৃণ্য অপরাধ। এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক।

আলোচনার সার নির্যাস

ইবলিসি এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুসলমানদেরকে ফাঁসিয়ে দেয়ার কাজটি সাধারণ মস্তিস্কের কোনো মানুষের ছিল না। সে এমন ধূর্ত এবং চতুর ছিল যে, শয়তানী তার মস্তিস্কে বিদ্যুৎ গতিতে চলত। সে ইসলামের পরিভাষা, ইসলামী আকিদা এবং মুসলমানদের মেজায-প্রকৃতি গভীরভাবে অধ্যায়ন করেছে। এরপর সে এই গণতন্ত্রের জন্য এমন সব পরিভাষা চালু করেছে, বাহ্যত যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয় না। আর তারা এক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ সফলতাও অর্জন করেছে। সাধরণ মানুষ তো পরের কথা, তারা অনেক আলেমকে পর্যন্ত ধোঁকা দিতে সফল হয়েছে। ইসলাম ও গণতন্ত্রের মাঝে যেসব জায়গায় শব্দিক ও বাহ্যিক সাদৃশ্যতা বা মিল (Similarity) ছিল, সেখানে তারা ইসলামকে গ্রহণ করেছে। আর যেখানে উভয়ের মাঝে বৈপরিত্ব (Contradiction) ছিল, সেখানে পুরো কাঠামোটাই বদলে ফেলেছে এবং এমন সব পরিভাষা ব্যবহার করেছে যে, বাহ্যিকভাবে ইসলামী মূলনীতির সাথে কোনো প্রকার বিরোধ ও বৈপরিত্ব দেখা যায় না।

এ কারণেই একজন সৈনিক, পুলিশ, জজ, উকিল, পার্লামেন্ট মেম্বর একদিকে এ কথা স্বীকার করে যে, উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো হারাম। কিন্তু অন্যদিকে এই হারামকে মেনে নেয়া, এর সম্মান করা এবং ক্ষমতাবলে এই হারামকে যখন বাস্তবায়ন করার পালা আসে, সাথে সাথে এই পরিভাষাকে পরিবর্তন করে ফেলে এবং বলে, এটা 'আইনি ও কানুনী' বিষয়। অথচ এই একই অর্থ-মর্ম ইসলামী

পরিভাষা 'হালালের'ও। তারা অতি সহজে ও অতি সাবলিলভাবে আল্লাহ কর্তৃক হারামকে হালাল মনে করে। এরপর আমল করা ও আমল করানোকে ফরয সাব্যস্ত করে। এর মোকাবেলায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ও সশস্ত্র লড়াইকে জিহাদ বলে। আর এর জন্য যে কোনো কালেমাওয়ালা মুসলমানকে হত্যা করা, মসজিদে গুলি বর্ষণ করা, মাদরাসার উপর আক্রমণ করা, কুরআন পড়ুয়া নিঃস্পাপ ও নিরাপরাধ মেয়েদেরকে রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে দেয়া– নিজের জন্য শুধু আইন সম্মত ও হালালই মনে করে না বরং ফরয এবং ইবাদত মনে করে।

এটা শুধু তাদের আমলই নয় বরং তাদের চিন্তাধারাও (আকিদা) বটে। এই আইনের আনুগত্য, এই আইনকে পবিত্র জ্ঞান এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ তার ঈমানের (গণতান্ত্রিক মতবাদের উপর ঈমানের) অংশ।

এবার চিন্তা করুন, শুধুমাত্র পরিভাষার পরিবর্তনের দ্বারা এই গণতন্ত্র কত অসংখ্য কুফরিকে তার বক্ষে লুকিয়ে রেখেছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামদেরকে কিভাবে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। এখানে একটা কুফরি নয়, সহস্র কুফরি বিদ্যমান। তবে তারা এই কুফরির নাম পরিবর্তন করেছে। কিন্তু বাস্তবতা স্পষ্ট এবং পরিস্কার।

একটি প্রশ্ন : আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিধিবিধান প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে যেভাবে প্রেরণ করেছেন, পুলিশ, সেনা সদস্য এবং অন্যরা আল্লাহর বিধিবিধান সেভাবেই স্বীকার করে। এই আকিদা লালন করা সত্ত্বেও তাদের আমলকে কিভাবে কুফরি বলা যেতে পারে? কবিরা গুনাহ করার কারণে বেশির চেয়ে বেশি ফাসেক বলা যেতে পারে?

প্রশ্নের উত্তর : আমরাও এ কথা মেনে নিচ্ছি যে, আল্লাহর সমস্ত বিধি-বিধানের উপর এদের ঈমান রয়েছে। কিন্তু আপনাকেও এ হাকিকত ও সত্যতাও স্বীকার করতে হবে যে, সেই শরীয়তের (আইন) উপরও তার ঈমান রয়েছে, যা তাকে পড়ানো হয়েছে। সেই আইনের প্রতিটি হুকুমের উপর আমল করা এবং জনগণকে আমল করতে বাধ্য করাকে ফরয এবং দায়িত্ব মনে করে। তাদের আকিদা ও বিশ্বাস হল, এই আইনের জন্য জীবন দেয়া এবং যে কোনো কালেমাওয়ালা মুসলমানের জীবন নেয়া তার জন্য হালল এবং বৈধ। যদিও এই দায়িত্ব সুদি কারবার রক্ষা করা, যেনার আসর হেফাজত করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন আমেরিকানদেরকে পাহারাদারি করা হোক। এমতাবস্থায় আমলী সূরত (কার্যরূপ) এই হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি একই সময়ে অন্য কোনো শরীয়তও মানে, তবে কি সে মুসলমান হতে পারে?

সেই সাথে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, ইসলামের উপর এই শ্রেণীর ঈমান কতটুকু, আর এই গণতান্ত্রিক সুদি ব্যবস্থার শরীয়তের উপর ঈমান কতটুকু? আল্লাহর নিযামের জন্য জীবন দেয়া তো দূরের কথা, যারা আল্লাহর নিযামের কথা বলে, শরীয়ত প্রবর্তনের দাবি করে, এরা তাদের জীবন নেয়াকে ফরয মনে করে। এরা এই কুফরি নিযাম ও কুফরি সরকার ব্যবস্থা রক্ষা করাকে ইবাদত মনে করে, মুখে তা স্বীকারও করে। তাদের সমস্ত আনুগত্য এই সুদি সরকার ব্যবস্থার প্রতি। এর রিট বাকি রাখার জন্য তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করাকে ইবাদত মনে করে। যারা এই রিটের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে, তাদের জীবন নেয়াকে হালাল ও বৈধ বলে। হোক সে তার বাপ, ভাই কিংবা রক্তের আত্মীয়।

এবার বলুন, কোন ধর্মের উপর এদের ঈমান বেশি? নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক সুদি শরীয়ত বা সদি আইনের প্রতিই এদের ঈমান বেশি। আর এটা শুধু এদের আমল ও কর্মই নয়, এটা এদের চিন্তাধারা ও আকিদাও। যার উপর সে শপথও করে। এই আকিদার অস্বীকারকারী তখনই বলা যেতে পারে যখন সে গুনাহকে গুনাহ মনে করে এবং এই কাজ থেকে নিজের বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ করে। কিন্তু এখানে তো বিষয়টা পুরো বিপরীত, তারা এই কবিরা গুনাহকে ইবাদত এবং পবিত্র দায়িত্ব মনে করে করে থাকে।

দাওয়াতে পরিভাষার ব্যবহার

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের ঈমানদারগণ যখনই তাগুতি গণতন্ত্রের ঈমানদারদের সাথে কথা বলবেন, তাদের গণতন্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষা ব্যবহার করবেন না। বরং এগুলোকে ইসলামী পরিভাষায় পরিবর্তন করুন। যাতে আমাদের সরলমনা সাধারণ মুসলমানগণ জানতে পারেন যে, ইসলামের নামে তাদের সাথে কত বড় প্রতারণা করা হচ্ছে। এই পরিভাষাগুলো খুব বেশি বেশি ব্যবহার করুন, যাতে মানুষ এর বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়।

এখানে আরও একটা বিষয় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদী শরীয়তে আমল আর আকিদা একমাত্র ধর্তব্যের বিষয়। কেউ এগুলোকে যত সুন্দর নামই দিক। মদকে জুস, সুদকে ব্যবসা, তাগুতকে আমিরুল মুমিনীন ইত্যাদি। শরীয়তে মুতাহহারার শান হল, সে এই মুখোশকে খামচে তুলে ফেলে দেয় এবং আসলের উপর হুকুম জারি করে।

ওলামায়ে কেরামের নিকটও আমাদের আবেদন, আপনারা এই কুফরি বিষয়ে আপনাদের ভক্ত-অনুরক্ত ও অনুসারীদেরকে অবগত করুন যে, কুফরিকে কুফরি বলুন। যাতে কেউ কুফরিকে ইসলাম প্রমাণ করে ইসলামী মূলনীতি ও ভিত্তির সাথে

ইচ্ছামত আচরণ করার দুঃসাহস না করে। শাআয়িরে ইসলাম ও ইসলামের প্রতীক ও নিদর্শন নিয়ে উপহাস করার এবং আল্লাহর 'হদ'কে হিংস্রতা ও পাশবিকতা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে না পারে।

মূল কাজ হল, 'সুরতে মাসআলা' গভীরভাবে বোঝা অত:পর পবিত্র শরীয়তের আলোকে তার বিধান স্পষ্ট করা।

আসলাফে উম্মত ও কালের মনীষীদের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

এখন দেখা যাক, গণতন্ত্র সম্পর্কে আসলাফে উম্মত ও কালের মণীষীগণ, যারা আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা, তারা কি বলেছেন। তারা দীন আমাদের চেয়েও অনেক বেশি বুঝেছে এবং দীন সম্পর্কে অনেক বেশি জ্ঞান রাখতেন।

১. হযরত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' (حجة الله البالغة) গ্রন্থের 'সিয়াসাতুল মদীনা' (سياسة المدينة) অধ্যায়ে বলেছেন–

ولما كانت المدينة ذات اجتماع عظيم لايمكن أن يتفق رأيهم جميعا على حفظ السنة العادلة....

শহর যখন জনবহুল হয়ে পড়বে, তাদের সবার রায় সুন্নাতের হেফাজতের উপর একমত হওয়া সম্ভব নয়...।

বোঝা গেল, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা, যা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত বা পক্ষাবলম্বনের মুখাপেক্ষী, এখানে ইসলাম ও মুসলমানদের সফলতা প্রমাণিত করা ধোঁকবাজি ছাড়া আর কিছু নয়।

১. হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

ইসলামে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে কোনো জিনিস নেই। নব্য আবিস্কৃত ও সুবিদিত এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিছকই প্রতারণা। বিশেষত এমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যা মুসলমান ও বিধর্মী সদস্যদের দ্বারা গঠিত, সেটা তো অবশ্যই অমুসলিম রাষ্ট্র। *[মালফুজাতে থানভী : ২৫২, আহসানুল ফতওয়া : কিতাবুল জিহাদ/ সিয়াসতে ইসলামীয়া অধ্যায়]*

২. মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

এরা বলে, এটা নাকি মজদুর ও জনগণের রাষ্ট্র। এটা নিঃসন্দেহে কুফরি রাষ্ট্র।। *[আকায়িদুল ইসলাম : ২৩০]*

৩. সাইয়িদ সুলাইমান নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইসলামী গণতন্ত্রের দর্শন প্রত্যাখ্যান করে লেখেন–

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের কি সম্পর্ক? ইসলামী খেলাফতের কি সম্পর্ক? (এগুলোর সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই।) প্রচলিত গণতন্ত্র তো সপ্তদশ শতাব্দীর পরে সৃষ্টি হয়েছে। গ্রীকের গণতন্ত্রও বর্তমানের গণতন্ত্রের থেকে ভিন্ন ছিল। সুতরাং ইসলামী গণতন্ত্র একটি অর্থহীন পরিভাষা। আমি ইসলামের কোথাও পশ্চিমা গণতন্ত্র পাইনি। তা ছাড়া ইসলামী গণতন্ত্র বলতে তো কোনো জিনিসই নেই। জানি না মরহুম ইকবাল ইসলামের রূহের ভেতর এই গণতন্ত্র কোথায় দেখতে পেয়েছেন? গণতন্ত্র একটা বিশেষ সভ্যতা ও ইতিহাসের ফল। ইসলামী ইতিহাসে একে খোঁজা অক্ষমতা প্রকাশ।[৬]

৪. হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তাইয়িব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

এটা (গণতন্ত্র) আল্লাহ তায়ালার সিফাতে মিলকিয়াতে শিরক, সিফাতে ইলমেও শিরক।[৭]

শিরকের পথ অবলম্বন করে কি কেউ ইসালামের শির বুলন্দ করতে পারে? কখনোই না।

৫. হযরত মুফতী রশিদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

এসব ফল ফসল পশ্চিমা গণতন্ত্রের নিকৃষ্ট বৃক্ষের(শাজারায়ে খবিসা) উৎপাদন। ইসলামে এই কুফরি ব্যবস্থার কোনোই অবকাশ নেই। *[আহসানুল ফতওয়া : ৬/২৬]*

৬. হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের মিল নেই, তায় নয়। বরং গণতন্ত্র ইসলামের একদম বিপরীত বস্তু। *[আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল: ৮/১৭৬]*

হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির 'আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল' গ্রন্থে এই মাসআলাটিও রয়েছে-

প্রশ্ন : হারামকে ইচ্ছাকৃতভাবে হালাল বলা, এমনকি ইসলামী বলার পরিণতি কি? আমি ১৯৯১ এর মে মাসে আমাদের জাতীয় এসেম্বলীতে পাশ হওয়া শরীয়ত

---

[৬] *–মাহনামা সানাবিল- করাচি : মে ২০১৩, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা ২৭-২৮, সম্পাদক মাওলানা হাফেয আহমাদ সাহেব। এ ছাড়াও দেখুন, মানামা সাহেল-করাচি, সংখ্যা জুন ২০০৬, সংকলন : মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদ রহ.*

[৭] *ফিতরি হুকুমাত, – মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তাইয়্যিব রহ.*

বিলের ৩য় অনুচ্ছদের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। এই অনুচ্ছদে বলা হয়েছে যে, শরীয়ত অর্থাৎ ইসলামের বিধিবিধান, যা কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণনা করা হয়েছে, পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ও মৌলিক আইন হবে। তবে শর্ত হল, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সরকারের বর্তমানের অবকাঠামো যেন প্রভাবিত না হয়। তার মানে, দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সরকারের বর্তমান অবকাঠামো প্রভাবিত হলে কুরআন ও হাদীস প্রত্যাখ্যাত হবে। কুরআন-হাদীসকে তখন মানা হবে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সরকারি অবকাঠামোর ক্ষেত্রে সুপ্রিম ল' আইন ১৯৭৩-ই বলবৎ থাকবে।

মাওলানা সাহেব! যারা এই বিল বানিয়েছেন, অনুমোদন করেছেন, এই দেশে বাস্তবায়ন করছেন এবং এই বিল তৈরিতে যে সব ওলামায়ে কেরাম সহযোগিতা করেছেন, তারা কোন দলে পড়বেন?

উত্তর : একজন মুসলমানের কাজ হল, শর্তহীন এবং কোন প্রশ্ন বা কিন্তু ব্যতীত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহকাম ও বিধি-বিধান মনে-প্রাণে স্বীকার করা, মেনে নেয়া। কিন্তু এমন কথা বলা, 'আমি কুরআন ও সুন্নাতের বিধান মানি, তবে আমার অমুক দুনিয়াবী স্বার্থ যেন প্রভাবিত না হয়, ক্ষতিগ্রস্ত না হয়'– এটা ঈমানের কথা নয়, পাক্কা নেফাকি। আল্লাহর বান্দা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত না হওয়ার স্পষ্ট ঘোষণা। *[আপকে মাসায়েল আওর আনকা হল : ১/৪৯]*

১. প্রখ্যাত আলেমে দীন মুফতী হামিদুল্লাহ খান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ফতওয়াতে বলেন–

   পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রচলিত পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুধু ধর্মহীনতায় নয় বরং নির্লজ্জতা ও সব ধরনের দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা ও অনিষ্টের মূল। বিশেষত এতে এসেম্বলীকে আইন ও সংবিধান প্রণয়নের অধিকার প্রদান করা কুরআন, হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মাতের স্পষ্ট লঙ্ঘণ। আর ভোটাধিকার প্রয়োগ করা পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যত (আমলান) স্বীকার করা এবং এর সমস্ত খারাবিতে অংশীদার থাকা। এজন্য প্রচলিত পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয।[৮]

২. মাওলানা সাইয়িদ আতাউল মুহসিন শাহ বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

---

[৮] *–মাহনামা সানাবিল, করাচি : মে ২০১৩, সংখ্যা : ১১, পৃষ্ঠা : ৩২*

কোনো কবরকে সমস্যার সমাধানকারী মানা ও বিশ্বাস করা যদি শিরক হয়ে থাকে, তবে অন্য কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা Imperialism ইম্পেরিয়ালিজম, ডেমোক্রেসি, কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম এবং অন্যা সমস্ত ভ্রান্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে মানা কিভাবে ইসলাম হতে পারে? কবর সিজদাকারী মুশরিক। পাথর, কাঠ এবং গাছকে সমস্যার সমাধানকারী ও প্রয়োজন পূরণকারী বিশ্বাস করা শিরক। আর গায়রুল্লাহর নিযাম ও ব্যবস্থা সংকলন করা, রূপ দেয়া, এর জন্য দৌড়ঝাপ করা ও এই নিযাম ও ব্যবস্থা কবুল করা কি করে তাওহীদ হতে পারে? ইসলামের কোথায় গণতন্ত্র রয়েছে? ইসলামের কোথাও ভোট নেই। কোথাও আপসকামিতা নেই। ইসলাম এর অস্তিত্ব মেনে নেয়নি, এর অবদানও স্বীকার করেনি।

ইসলাম আপনার নিকট আনুগত্য চায়, ভোট চায় না। আপনার রায় চায় না। مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।[১]

৩. মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ হাকিম আখতার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

ইসলামে গণতন্ত্র বলতে কোনো জিনিস নেই। যেদিকে বেশি ভোট পড়বে সেদিকেই সবাই যাবে, এমন কোনো বিষয় ইসলামে নেই। বরং ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, গোটা বিশ্ব একদিকে চলে গেলেও মুসলমান আল্লাহর পক্ষেই থাকে। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাফা পাহাড়ে নবুওয়াতপ্রাপ্তির ঘোষণা করে ছিলেন, তখন নবীজির পক্ষে একটা ভোটও ছিল না। নবীজির কাছে মাত্র একটা ভোটই ছিল, সেটা তার নিজের ভোট। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আল্লাহর পয়গামের এলান করা থেকে বিরত ছিলেন? তিনি কি এ কথা ভেবে ছিলেন যে, গণতন্ত্র যেহেতু আমার বিপক্ষে, অধিকাংশ ভোট যেহেতু আমার বিরুদ্ধে, সুতরাং আমি নবুওয়াতপ্রাপ্তির ঘোষণা থেকে বিরত থাকি? *[খাযায়েনে মারেফাত ও মুহাব্বত : ২০৯]*

৪. দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতীয়ে আযম মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. এর ফতওয়া :

প্রশ্ন : আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? খোলাফায়ে আরবা'ও কি এই গণতান্ত্রিক

---

[১] *তাওহীদ ও সুন্নাত কনফারেন্সে প্রদত্ত ভাষণ, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ ব্রিটেন, সৌজন্যে: সানাবিল করাচি*

ব্যবস্থার উপর চলেছেন, নাকি তারা এতে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছেন?

উত্তর : হযরত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি গণতন্ত্রের খণ্ডন (তারদিদ) করেছেন। গণতন্ত্রে আইন ও বিধি-বিধানের মূলভিত্তি দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে হয় না, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। অর্থাৎ অধিকাংশের রায়ের উপর ফয়সালা হয়ে থাকে। সুতরাং অধিকাংশের রায় যদি কুরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধে হয়, তবুও সেটার উপরই ফয়সালা হবে। পবিত্র কুরআনে অধিকাংশের আনুগত্যকে ভ্রষ্টতার কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। *[সূরা আল আনআম : ১১৬]*

বিজ্ঞ, বোধসম্পন্ন ও জ্ঞানীদের সংখ্যা কমই হয়ে থাকে। খোলাফায়ে আরবা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ পদাঙ্কানুসরণ করে চলতেন। তাঁরা এর বিপরীত অন্য কোনো পথ গ্রহণ করেননি।[১০]

৫. বিফাকুল মাদারিস পাকিস্তানের চেয়্যারম্যান মাওলানা সালিমুল্লাহ খান দামাত বারাকাতুহুমের অভিমত :

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা সালিমুল্লাহ খান দামাত বারাকাতুহুমকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'নির্বাচনী রাজনৈতিক ব্যবস্থা অথবা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কি না?'

উত্তরে তিনি বলেন, 'না, এটা সম্ভব নয়। নির্বাচনের মাধ্যমেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, গণতন্ত্রের মাধ্যমেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ধর্তব্য হয়। আর সংখ্যাগরিষ্ঠতা মূর্খদের হয়ে থাকে। যারা দীনের গুরুত্বের ব্যাপারে অবগত নয়। তাদের দ্বারা ভালো কোনো কিছুর আশা করা যায় না।'[১১]

৬. হযরত মুফতী নিজামুদ্দীন শামযায়ী শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

---

[১০] *ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া চতুর্থ খণ্ড, কিতাবুস সিয়াসাহ ওয়াল হিজরাহ, গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের আলোচনা অধ্যায়*

[১১] *মাহনামা সানাবিল, করাচি, মে ২০১৩, সংখ্যা : ১১*

পৃথিবীতে আল্লাহ্ তায়ালার দীন ভোটের মাধ্যমে কিংবা পশ্চিমা গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিজয়ী হবে না। কারণ পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দুশমনদের সংখ্যাই বেশি। ফাসেক ফাজেরদের সংখ্যাই বেশি। আর গণতন্ত্র হল মানুষের মাথার সংখ্যার নাম, মানুষের ব্যক্তিত্বের ওজনের নাম নয়। পৃথিবীর বুকে ইসলামের বিজয় লাভ করার একটাই পথ– যে-ই পথ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেছিলেন। সেটা হল জিহাদের পথ।

আফগানিস্তানে তালেবান সরকার ও ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কখন হয়েছে? যখন ষোলো লাখ মানুষ শহীদ হয়েছে। দশ লাখ মানুষ প্রতিবন্ধি হয়েছে। কেউ হাত হারিয়েছে, কেউ পা হারিয়েছে, কেউ চোখ হারিয়েছে, কেউ কান হারিয়েছে... এরপর ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কুরবানী না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা কাউকে মুফতে কিছু দেন না। পাকিস্তানের মানুষ তো এই তামান্না করে যে, পাকিস্তানেও তালেবান সরকার আসুক কিংবা তালেবান সরকারের মত সরকার হোক। কিন্তু এর জন্য যে পরিমাণ কুরবানী দেয়ার প্রয়োজন, এর জন্য তারা প্রস্তুত নয়।'[১২]

গণতন্ত্র : কুরআন ও হাদীসের আলোকে

গণতন্ত্রের ভিত্তিই কুফরির উপর

আল্লাহর নিকট হিদায়াত কামনা করে এই আলোচনায় আমরা এ কথা জানার চেষ্টা করব যে, গণতন্ত্র সম্পর্কে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত আমাদেরকে কি ফয়সালা দেয়। যে-ই ব্যক্তি শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করে এবং মানে, তার উচিত শরীয়তের ফয়সালাকেই গ্রহণ করা। এই আলোচনায় আমরা শরীয়তে মুতাহহারার দালায়েল ও প্রমাণাদিই শুনব, কোনো ব্যক্তি বিশেষের আমল দেখব না। গণতন্ত্রের পক্ষে কারও নিকট মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের কোনো দলিল-প্রমাণ থাকলে, সে যেনো তা পেশ করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, গণতন্ত্রের সংজ্ঞার দিক থেকে এতে গণমানুষের বুঝ-বুদ্ধি ও চাওয়া-পাওয়াকে (মানুষের সংখ্যাকে) ওহীর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এজন্য এই গণতন্ত্র সরাসরি কুফরি। গণতন্ত্র কেবল সেটাই, যাতে মানুষের

---

[১২] *মহনামা সানাবিল করচি, মে ২০১৩, সংখ্যা : ১১, পৃষ্ঠা : ২৩-২৪*

ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হয় এবং শাসনের অধিকার মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। এ ছাড়া কোনো গণতন্ত্রই গণতন্ত্র হতে পারে না।

গণতন্ত্র কি ভিন্ন কোনো ধর্ম?

সামনে গিয়ে কুরআন, হাদীস এবং ফুকাহায়ে কেরামের ভাষ্য দ্বারা এ কথা প্রমাণ করা হবে যে, গণতন্ত্র ও ইসলাম একটা আরেকটার বিপরীত। না ইসলাম গণতন্ত্রের সাথে থেকে ইসলাম থাকতে পারে, না গণতন্ত্র ইসলামের প্রকৃত রূহের সাথে থেকে গণতন্ত্র থাকতে পারে। সুতরাং গণতন্ত্রের সাথে থেকে একজন মুসলমান কতটুকু মুসলমান থাকতে পারে, তা বোঝা কষ্টকর কিছু নয়। কিছুটা আল্লাহর উপর ঈমান, আর বেশিটা গায়রুল্লাহর উপর ঈমান। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগতদেরকে পুরোপুরি তাঁরই অনুগত দেখতে চান। কোনো মুসলমান সরিষার দানা পরিমাণও যদি অন্যের হয়, তবে সে সে-ই অন্যেরই হয়ে যায়। আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না। তেমনিভাবে আল্লাহওয়ালা হওয়ার জন্য জরুরি হল, বান্দা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে-ই ভাবে তার নবী মানবে, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা হুকুম করেছেন, মানতে বলেছেন।

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ কুফরি

প্রতিটি মুসলমানের জানা উচিত যে, ইসলাম ইসলামই আর কুফর কুফরই। একটার সাথে আরেকটার সামান্যতম সম্পর্ক নেই। আপনার যদি ঈমান থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা এই দীনকে তাঁর প্রিয়তম নবীর উপর মুকাম্মাল করে দিয়েছেন, পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তবে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, দুনিয়ার কোনো আলেমই, হোক সে যত বড়, সে ইসলামকে কুফর আর কুফরকে ইসলাম প্রমাণ করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা সেই সব ফকীহদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিন, যারা তাদের জীবনকে এই দীন বোঝার জন্য কুরবান করে দিয়েছেন। এরপর এই দীনের সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম প্রতিটি বিষয় খুলে খুলে উম্মতকে বুঝিয়েছেন।

ইসলাম কি আর কুফর কি?

হিদায়াত কি আর গোমরাহী কি?

আল্লাহর পথ কোনটি আর শয়তানের পথ কোনটি?

প্রতিটি বিষয়ই তাঁরা স্পষ্টভাবে উম্মতকে বুঝিয়ে দিছেন। কোথাও সামান্য পরিমাণ অস্পষ্টতা রাখেননি।

কিন্তু বর্তমানে দীনের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, দুনিয়ার স্বাদ-মজায় আকণ্ঠ ডুবন্ত প্রবৃত্তিপূজারী শ্রেণী– চায়, হক আর বাতিল, হিদায়াত আর গোমরাহী, আলো আর অন্ধকার... এগুলোকে এমনভাবে গোঁজামিল দেয়া, এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলা, যাতে ইসলাম ও কুফরের মাঝে কোনো পার্থক্য অবশিষ্ট না থাকে। আর প্রবৃত্তি পূজারীর এই দল যা ইচ্ছা করতে পারে। এরা চায় ইসলামের উপহাসকারীদের কুফরির কথা আলোচনা না করা হোক। আমাদের প্রিয়তম নবীজির সুন্নাত অবমাননাকারীদের হুকুম বলা না হোক। এমনকি তারা এ দাবিও করে যে, কাফেরদেরকেও কাফের বলা না হোক। যারা আম্মাজান আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছে, তাদেরকেও কোনো কিছু বলা না হোক।

নাউযুবিল্লাহ! এরা কোন দীনের দাওয়াত দিচ্ছে, যেখানে ইসলাম ও কুফরির কোনো সীমানা নির্দিষ্ট নেই? কুফর কি আর ইরতিদাদ কাকে বলে? ইলহাদ কি আর শিরকের সংজ্ঞা কি? মুসলমান হওয়ার জন্য জরুরি কি আর কিভাবে ঈমান হেফাজত করতে হয়? কোনো কিছুই স্পষ্ট নয়, পরিস্কার নয়। এটা কেমন দীন যেখানে মুরতাদ ও যিন্দিক কাদিয়ানীরাও যিম্মি সাব্যস্ত হয়? অথচ এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে যে, মুরতাদ ও যিন্দিকরা যিম্মি হতে পারে না।

এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কিতাবে যে বিষয়গুলোকে কুফরি লিখেছে, আমরা সর্বাবস্থায় সেগুলোকে কুফরি বলব এবং এর আলোচনা করে যাব। এর কারণে যদি কেউ আমাদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে, করবে। আমরা যদি নিজেদের পক্ষ হতে কোনো কথা বলে থাকি, তবে আমরা সেই অপবাদের অবশ্যই উপযুক্ত হব। কিন্তু এসব মাসআলায় আমরা আমাদের আসলাফের ভাষ্যই পেশ করব। এরপর যার ইচ্ছা সে যেন এসব আসলাফের বিরুদ্ধে অপবাদ লাগিয়ে তার ঈমান ও আকিদা বরবাদ করে এবং নিজেকে তাদের কাতার থেকে বের করে দাজ্জাল ও তার মিত্রদের কাতারে দাঁড় করায়। সবাইকে আল্লাহর নিকটই ফিরে যেতে হবে। সে দিন মুখে তালা লাগিয়ে দেয়া হবে। ছোট বড় প্রতিটি আমলকে সবার সম্মুখে উপস্থাপন করা হবে। সেদিন কোনো জেনারেল কাজে আসবে না, কোনো মন্ত্রী কাজে আসবে না, সরকারি মিডিয়াও সেদিন সঙ্গে থাকবে না। যে-ই সব শয়তান আজ সাহায্য করছে, ডলার দিচ্ছে, নিজেদের খরচে বহিঃদেশে ভ্রমণ করাচ্ছে, তারাও সেদিন পাশে থাকবে না।

এজন্য সমস্ত আহলে ইলমের উপর ফরয হল, গণতন্ত্রের ভেতর যেসব কুফরি পাওয়া যায় তা আলোচনা করা। অন্যথায় হক কথা না বলার অপরাধে কিয়ামতের

দিন পাকড়াও করা হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে এর থেকে হেফাজত করুন।

গণতন্ত্রের বক্ষে লুকায়িত কুফরি

১. মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি ও চাওয়া-পাওয়াকে ওহীর উপর প্রাধান্য দান।

গণতন্ত্রে মানবজ্ঞানকে ওহীর চেয়েও বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় ওহী ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণীয় নয়, যতক্ষণ না মানবজ্ঞান (সংসদ সদস্য) তা অনুমোদন না করে। আর ফুকাহায়ে উম্মত এমন কাজকে স্পষ্ট কুফরি বলেছেন। এমনকি গণতন্ত্র আরও এক ধাপ এগিয়ে মানব প্রবৃত্তিকেও ওহীর উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এটা যে কুফরি, তাতে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে?

আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো বিধানই ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিবুল আমল হতে পারে না যতক্ষণ না সংসদ সদস্যরা তার অনুমোদন না করেন। এটা নিঃসন্দেহে এমন কুফরি, যা মানুষকে মিল্লাত থেকে খারেজ করে দেয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বিবাহিত ব্যাভিচারী নারী-পুরুষের শাস্তির বিধান তাঁর কিতাবে তাঁর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাজিল করেছেন। আর এই বিধান এই উম্মতের জন্য আইন হিসেবে রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আল্লাহর দেয়া এই বিধান (নাউযুবিল্লাহ) সংসদ সদস্যদের অনুমোদন ছাড়া আমলযোগ্য মনে করা হয় না। বোঝা গেল, এই ব্যবস্থায় কোনো আইন যদি ইসলাম সম্মতও তৈরি করা হয়, তো সেই আইন এজন্য তৈরি করা হয়নি যে যে, এটা আল্লাহর আইন। বরং এই আইন এজন্য মেনে নেয়া হয়েছে যে, মানবজ্ঞান তথা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কর্মীরা এটাকে উপযুক্ত মনে করেছেন বিধায় এটাকে আইনে পরিণত করা হয়েছে। কারণ আল্লাহর হুকুমই যদি যথেষ্ট হত, তবে সেটা মানুষের অনুমোদন ও বিল হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়ত না। বরং এ প্রক্রিয়া ছাড়াই এই আইন মেনে নেয়া হত, যা আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাজিল করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এই ঘৃণ্যকর্মের আলোচনা এভাবে করেছেন যে–

ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُۥ كَفَرۡتُمۡ وَإِن يُشۡرَكۡ بِهِۦ تُؤۡمِنُواْۚ فَٱلۡحُكۡمُ لِلَّهِ ٱلۡعَلِيِّ ٱلۡكَبِيرِ

(তাদেরকে বলা হবে) 'তোমাদের এই অবস্থা (জাহান্নামে চিরদিনের জন্য অবস্থান) তো এজন্য যে, যখন আল্লাহকে এককভাবে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে আর যখন তাঁর সাথে শরিক করা হত তখন তোমরা বিশ্বাস করতে। সুতরাং (দুনিয়াতে) যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আলাহর'। *[সূরা গাফির : ১২]*

এই গণতন্ত্রের কুফরিও এটা যে, আল্লাহর শরীয়তকে কেবল আল্লাহর শরীয়ত মনে করে মানা হয় না, গ্রহণ করা হয় না। হ্যাঁ, আল্লাহর সঙ্গে এই পার্লামেন্টকেও যদি অংশীদার বানানো হয়, তখন তারা আল্লাহর শরীয়তকে মেনে নেয়। এখন হক্কানী ওলামায়ে কেরামই বলুন, এই হাকিকত ও বাস্তবতা জানার পরও আল্লাহর শরীয়তকে অনুমোদনের জন্য মানুষের সামনে পেশ করা কেমন?

সেই সাথে এখানে এ বিষয়টিও খুব ভালো করে বুঝে নেয়া উচিত যে, যে-ই পার্লামেন্টে শতভাগ দীনদার ও শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী ব্যক্তিত্বগণ বসেন, কিন্তু ওই পার্লামেন্ট অনুমোদন না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহর শরীয়ত আইনে পরিণত হয় না, এমন পার্লামেন্টেরও একই হুকুম।

কেউ যদি এ কথা বলে যে, আমরা এই প্রক্রিয়া ছাড়াই আল্লাহর শরীয়তকে আইনের অংশ বানিয়ে দেব, তাদের এই বুঝ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা, প্রকৃতি এবং তার নিযাম ও ব্যবস্থার প্রকৃত মোহাফেজদের না বোঝারই দলিল। এ ধরনের লোকেরা গণতন্ত্রকে এক ফোঁটাও বোঝেনি। এরা পুরোপুরি ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। গণতন্ত্রকে ওই সময় পর্যন্ত গণতন্ত্রই বলা যাবে না, যতক্ষণ না প্রতিটি জিনিসে মানবজ্ঞানের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা না হবে। চাই সেটা ওহীই হোক না কেন, যা ফেরেশতাদের সরদার নবীকুলের সরদারের নিকট আনতেন।

২. আধুনিক শয়তানি জীবনব্যবস্থা, যাতে প্রবৃত্তিকে উপাসক বানানো হয়।

গণতন্ত্রে দস্তুরে হায়াত তথা জীবনব্যবস্থা (আইন) প্রণয়নের অধিকার পার্লামেন্টের। তারা তাদের খায়েশ অনুযায়ী যা ইচ্ছা সংবিধানে রূপ দিবে এবং আইনের মর্যাদা দিবে। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে এই অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই।

সুতরাং এমন আকিদা বিশ্বাস লালন করা আল্লাহর সাথে কুফরি করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

তাদের জন্য কি এমন কিছু শরিক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? *[সূরা আশ-শূরা : ২১]* (এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।)

৩. গণতন্ত্র আল্লাহর আইন প্রণয়নের সিফাতকে গায়রুল্লাহর (অর্থাৎ পার্লামেন্ট) কাছে অর্পণ করে।

এটাই গণতন্ত্রের রূহ বা আত্মা। এতে যদি কেউ এ কথা সংযোজন করে যে, আইন প্রণয়ন কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া উচিত, তবে এটা শুধুই কথার কথা, যা মুখ ফসকে বের হয়েছে। অন্যথায় গণতন্ত্রের রূহ ও আত্মা ওহীর কোনো ধরনের পাবন্দি করা কবুল করে না। এর স্পষ্ট প্রমাণ শরীয়ত পরিপন্থি সে সব আইন যা এই 'মূর্তি'র মাধ্যমে করা হয়। পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য যেটাকে হালাল (আইন সম্মত) বলে, সেটা হালাল। চাই সেটা সুদ, ব্যাভিচার এবং মদের মত অভিশপ্ত বস্তুই হোক না কেন? অথবা আল্লাহর 'হুদুদ'ই হোক না কেন? যেগুলো নিশ্চিহ্ন করা তো পরের কথা, সংযোজন বিয়োজন করাও কুফরি। এমনিভাবে পার্লামেন্ট যেটাকে হারাম (বেআইনি) বলে, সেটা হারাম। হোক সেটা জিহাদের মত মহান ইবাদতই হোক না কেন?

এখন এর সম্মান করা, এটাকে পবিত্র মনে করা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রতিটি সংসদ সদস্যের জন্য ফরয। যারা এটাকে হারাম (বেআইনি) বলবে এবং এর বিরোধিতা করবে, তাদেরকে এই আইনের বিদ্রোহী বলা হবে। এখন কেউ যদি এই আইন বাদ দিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আইন অনুযায়ী ফয়সালা করতে এবং করাতে চেষ্টা করে, তবে সে এই গণতান্ত্রিক শরীয়তের (জীবনব্যবস্থার) রিটকে চ্যালেঞ্জকারী সাব্যস্ত হবে। আর রাষ্ট্র তাকে দেশদ্রোহী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে পুলিশ ও সৈনিক থেকে নিয়ে বিমান বাহিনী পর্যন্ত লেলিয়ে দেয়া বৈধ মনে করবে। এমন লোকদেরকে হত্যা করা এবং এদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে নিজেদের জীবন দেয়া সৈনিকদের জন্য ফরয হয়ে যাবে। এজন্য এই ব্যবস্থায় জড়িত ধর্মীয় লোকদের মুখেও আপনি একটা বাক্য অবশ্যই শুনতে পাবেন– 'আমরা আইনের সীমানার ভেতর থেকে শরীয়ত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের তৎপরতা চালিয়ে যাব।'

হ্যাঁ, আইনের সীমা সেটাই যা গণতন্ত্র প্রণয়ন করেছে। অর্থাৎ কোনো আইনকেই (চাই তা আল্লাহরই আইন হোক না কোনো) ততক্ষণ পর্যন্ত আইন মনে করা হবে না, যতক্ষণ না তা গণতান্ত্রিকভাবে আইনে পরিণত করা না হবে। অর্থাৎ এখানে আল্লাহর 'আমর' (নির্দেশ) নয় বরং মানুষের 'আমর' চলে!

৪. এই পার্লামেন্টে অনুমোদিত জীবন বিধানকে মানুষের জন্য বাস্তাবায়ন করা, মানুষদেরকে এর নিয়মানুবর্তী করা, পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগ ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগ থেকে এর উপর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা এবং এর উপর কাজ করার আকিদা ও চিন্তাধারা লালন করা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তের স্পষ্ট অস্বীকার।

৫. গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থায় মুসলমান ও কাফের উভয়ে সমান। অথচ এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে এবং কুরআনে কারীমের বহু জায়গায় এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমান আর কাফের বরাবর হতে পারে না, সমান হতে পারে না।

৬. গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট এবং কতিপয় পদাধিকারী ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকেন। আইনের উর্ধ্বে থাকেন। প্রশ্ন হল, আপনাদের আইন যদি ইসলামীই হয়ে থাকে, তো এর অর্থ হয় এটা ইসলাম থেকে বাদ দেয়ার নামান্তর। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার কতিপয় ব্যক্তিকে ইসলামী জীবনব্যবস্থা (শরীয়ত) থেকে উর্ধ্বের সাব্যস্ত করা। এদেরকে এ পরিমাণ পবিত্র জ্ঞান করা হয় যে, ইসলামী আইনও এদের অপরাধের শাস্তি দিতে পারে না! অথচ শরীয়তে মুহাম্মাদীতে তো তার কন্যাও ব্যতিক্রম ছিলেন না। গণতান্ত্রিক এই চিন্তাধারাও ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থি।

৭. কোনো দেশের আইন যদি শত করা ৯৯ ভাগ ইসলামী হয় আর একটিমাত্র অনুচ্ছেদ অইসলামীক হয়, যা নিয়মতান্ত্রিকভাবে আইনের অংশ, তো শরীয়তে মুতাহহারা এই শিরককে কবুল করে না। সুতারং এই আইনকে ইসলামী বলা যাবে না, বরং এটিকে কুফরি আইনই বলা হবে। বিধায় কোনো মুসলমান যদি এই আইনকে জীবনবিধান ও এ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা আবশ্যক সাব্যস্ত করে, তবে এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দীনকে ত্যাগ করা হবে। কারণ বান্দার জন্য এমন একটা বিষয় আবশ্যক করছে, যা আল্লাহ তায়ালা আবশ্যক করেননি।

৮. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে কোনো কাফের মুসলমানের অফিসার, শাসক এবং জজ হতে পারবে না। এমন কি কোনো যিম্মি কাফেরও (যে কাফের খেলাফতের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে কর দেয় আর রাষ্ট্র তার জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করে।) অফিসার হয় তবে তার 'যিম্মিয়াত' শেষ হয়ে যাবে এবং তার খুন মুবাহ হবে। ইমাম আবু বকর জাসসাস তাঁর আহকামূল কুরআনে এমনটিই বলেছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক শরীয়তে (জীবনব্যবস্থায়) হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান অথবা যে কোনো বিধর্মীই শাসক ও জজ হতে পারে। যার বাস্তবায়ন আমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি।

৯. গণতন্ত্রের পার্লামেন্ট যেই শরীয়ত (সংবিধান) তৈরি করে, তার আলোকে নারীরাও রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে। এই আকিদাও ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থি।

১০. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইহুদীরা তাঁর নিকট কোনো কোনো বিষয় ফতওয়া নিত জিজ্ঞাসা করত যে, এ বিষয়ে আপনার শরীয়ত কি বলে, এ বিষয়ে আপনি কি হুকুম দেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফতওয়া যদি তাদের মনমত হত, তখন তারা ফয়সালার জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসত। আর তাদের মনমত না হলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফতওয়াকে প্রত্যাখ্যান করত। আল্লাহ তায়ালা সূরা মায়েদায় তাদের এই কর্মের আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ

তারা বিধানাবলিকে আপন স্থান থেকে সরিয়ে ফেলে। *[সূরা মায়েদা : ৪১]*

প্রচলিত গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থাও যেহেতু ইহুদীদের সৃষ্টি, তাই এখানেও ইহুদী খাসলত পুরোদমে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ইসলামের যে সব আইন ও নিয়ম-নীতি তাদের মনমত হয়েছে, তাদের চাওয়া-পাওয়ার সাথে মিলেছে, সেগুলোকে মানুষের মাধ্যমে অনুমোদন করানোর পর আইনে রূপ দেয়া হয়েছে। যাতে 'ইসলাম প্রিয়'রাও এই কুফরি জীবনব্যবস্থাকে ইসলামী প্রমাণ করার দলিল পেয়ে যায়, আবার নিজেদের প্রবৃত্তি প্রতিমাও সন্তুষ্ট থাকে। আর খয়েশাত ও প্রবৃত্তি যেখানে আল্লাহর আইনকে সমর্থন করে না, মেনে নেয় না, সেখানে আল্লাহর হুকুমকে অস্বীকার, হঠকারিতা, ঔদ্ধত্য, তালবাহানা ও গোঁজামিল দিয়ে কাজ চালিয়ে যায়।

পার্লামেন্ট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

যারা সংসদে বসে সেখানে উপস্থাপিত ইসলামী বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেয় এবং গণতান্ত্রিক পন্থায়ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাকে বরদাশত করে না, তাদের কাফের হওয়ার বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ রয়েছে? এটা কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তের প্রকাশ্য প্রত্যাখ্যান করা নয়? তারা জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে দিচ্ছে না, আবার সংসদেও ইসলামের নাম শুনতে ইচ্ছুক নয়।

ভাবার বিষয় হল, বিরোধিতার এই 'অধিকার' তাদেরকে দিয়েছে কে? নিঃসন্দেহে এই গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা ও এই পার্লামেন্টই তাদেরকে এই অধিকার দিয়েছে। সুতরাং এমন জীবনব্যবস্থা ও পার্লামেন্ট, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শরীয়তের বিরোধিতা করা এবং তা প্রত্যাখ্যান করাকে আইনী অধিকার সাব্যস্ত করে, এর চেয়ে বড় কুফরি ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান আর কী হতে পারে?

এই ব্যবস্থা কি শরীয়ত বিলের বিরোধিতাকারীদেরকে হেফাজত করে না? অথচ তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে কারও মতানৈক্য থাকা উচিত নয়। তবে তাওবা না করা অবস্থায় তাদেরকে হত্যা করা কি আইন সম্মত (হালাল-বৈধ) হতে পারে? ইসলামী বিল প্রত্যাখ্যানকারীদের সংসদ সদস্য পদ কি অপসরণ করা হয়? তাদের সাথে কি মুরতাদের মত আচরণ করা হয়? কখনোই না। কারণ গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে এরা এখনো সম্মানিত এবং পবিত্র। আর কেউ যদি তাদের সাথে তর্ক করে, তবে রাষ্ট্রীয় মিশনারী তাদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করবে।

আপনারাই লক্ষ্য করুন, যারা আল্লাহর কানুনকে প্রত্যাখ্যান করছে, তাদেরকে কেউ কিছুই বলতে পারে না। গণতন্ত্র তাদেরকে এই অধিকার দিয়েছে। কিন্তু কোনো নাগরিক যদি গণতন্ত্রের আইন মানতে অস্বীকার করে, তবে তাকে দেশদ্রোহী বলা হয়। সংসদ সদস্যরা নিজেদের মতামতের ভিত্তিতে তাদেরকে হত্যা করতে এবং তাদের বিরুদ্ধে সেনা অপারেশন চালাতে আইন পাশ করে। এর থেকে বোঝা গেল যে, 'দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম' ইসলাম নয় বরং ধর্মহীনতা (ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র।)

গণতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতাও নেই

এই ভ্রান্ত ব্যবস্থা তৈরিকারীরা মানুষদেরকে বিরাট এক ধোঁকা এও দিয়েছে যে, গণতন্ত্রে ইসলামের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। গণতন্ত্র ইসলামের কোনো নির্দেশের বিরুদ্ধে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না। প্রতিটি মুসলমান নামায, রোযা এবং

অন্যান্য ব্যক্তিগত ইবাদত করতে পারে। প্রতিটি মুসলমানেরই এই অনুমতি রয়েছে। আর এই স্বাধীনতাকে ইসলামী স্বাধীনতা মনে করে অনেকে হিন্দুস্তানকেও দারুল হরব মানে না। তারা বলেন, হিন্দুস্তানে মুসলমানদের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

এটি শয়তানী ধোঁকা। শব্দের হেরফের করে এক্ষেত্রেও ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা করা হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন হল, ইসলাম এখন নাউযুবিল্লাহ এতই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে যে, তাকে কুফরি জীবনব্যবস্থা থেকে স্বাধীনতা ভিক্ষা করে বেঁচে থাকতে হবে? আর আমাদেরকে এও দেখতে হবে যে, এই গণতন্ত্র সত্যি সত্যি মুসলমানদেরকে নামায রোযা ইত্যাদির সেই স্বাধীনতা দিয়েছে কি না যা আল্লাহ তায়ালার তার বিশ্বাসীদেরকে দান করেছেন? এই ব্যবস্থার অধীনে সেই আকিদার সাথে নামায আদায় করা হয় কি না, যেই আকিদা লালন করা আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক করেছেন?

গণতন্ত্রে নামাযের স্বাধীনতা নেই

আমাদেরকে নামায 'কায়েম' করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শুধু রুকু-সিজদা করার নামই নামায নয়। বরং নামাযের ফরয়িয়াতের আকিদা রাখা, নামায আদায়ের জন্য 'নিযামে সালাত' বা নামায ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যারা নামায পড়বে না তাদেরকে বাধ্য করা, যারা নামায ত্যাগ করার প্রতি অটল থাকে অথবা এর পক্ষে শক্তি সঞ্চয় করে, তাদের সাথে কিতাল করা ফরয মনে করা– এসবই নামায কায়েম করার অন্তর্ভুক্ত এবং জরুরি। অথচ গণতন্ত্রে এর কোনো প্রকার অনুমতি নেই। শুধু এতটুকু সুযোগ রয়েছে যে, কেউ ইচ্ছা করলে পড়বে। আর যারা পড়বে না, রাষ্ট্র কিংবা কোনো মুসলমান তাকে কিছু বলতে পারবে না। সুতরাং গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থায় নামাযের ফরযের স্বাধীনতা নেই, বরং নামাযের মুবাহ (বৈধ হওয়া) হওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। অর্থাৎ গণতন্ত্র একজন মুসলমানকে এই আকিদা লালন করতে বাধ্য করে যে, নামায ফরয নয় বরং মুবাহ। যার ইচ্ছা হবে পড়বে, আর যার ইচ্ছা হবে না সে পড়বে না। অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রেও এই একই কথা। আর ফরযকে মুবাহ মনে করার আকিদা কেমন? ওলামায়ে কেরামের নিকট এর হুকুম জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

গণতন্ত্রের অবদান: কাদিয়ানীদেরকে কাফের ঘোষণা

যারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকিদা ও বিশ্বাস লালন করেন, তাদের একটা দলিল এটাও যে, আমরা এই জীবনব্যবস্থায় শরিক হয়ে

কাদিয়ানীদেরকে কাফের ঘোষণা করিয়েছি। এমনিভাবে এক সময় ইসলামী শরীয়তও বাস্তবায়ন করব।

কাদিয়ানীদেরকে কাফের ঘোষণা করাকে ধর্মীয় রাজনীতি শক্তির অনেক বড় অবদান মনে করা হয় এবং এটাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার দলিল হিসেবে পেশ করা হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করেছেন, তাদের নিয়ত ভালো ছিল। কাদিয়ানী ফিতনার মূলৎপাটন করাই ছিল এদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার ধূর্ত ও চতুর কর্মীরা এখানেও ওলামায়ে কেরামকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছে এবং কাদিয়ানীদেরকে বাঁচানোর জন্য তাদের শয়তানী মস্তিস্ক পুরোপুরিই কাজে লাগিয়েছে।

এ ক্ষেত্রে এই প্রশ্নও আসে যে, ইসলামের আলোকে কাদিয়ানীরা আদি কাফের (কাফেরে আসলি) নাকি মুরতাদ না যিন্দিক?

হযরত ওলামায়ে কেরাম জানেন, ইসলামের এই পরিভাষাত্রয় ভিন্ন ভিন্ন মর্মের জন্য ব্যবহার করা হয়। আর এগুলোর বিধানও ভিন্ন ভিন্ন।

কাদিয়ানীরা কখনোই আদি কাফের নয়। কারণ তারা পূর্ব থেকেই নিজেদেরকে মুসলমান বলত। আবার মুরতাদও নয়। মুরতাদ এজন্য নয় যে, তারা কুফরিতে লিপ্ত থাকার পরও নিজেদেরকে কাফের বলত না। বরং ভ্রান্ত চিন্তাধারা লালন করা সত্ত্বেও নিজেদেরকে মুসলমান প্রমাণ করতে অনমনীয় ও একগুঁয়ে ছিল। বিধায় তাদের উপর কেবল যিন্দিকের সংজ্ঞাই প্রযোজ্য হয়।

এখন প্রশ্ন হল, শরীয়তে যিন্দিকের হুকুম কি? সমস্ত আহলে ইলমের নিকট এর হুকুম হল, গ্রেফতারীর পূর্বে তাওবা করলে তার তাওবা গৃহীত হবে। গ্রেফতারীর পর তাওবা করলে তা গৃহীত হবে না। গ্রেফতারীর পর তাকে হত্যা করা হবে।

কিন্তু আমাদের দেশে কাদিয়ানীদেরকে কাফের ঘোষণা করে তাদেরকে যিম্মীদের মান দেয়া হয়েছে। তাদের জান-মালের জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ শরয়ী হুকুম ছিল, প্রথমে তাদের আকিদা থেকে তাওবা করার নির্দেশ দেয়া। তাওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গেলে তো ঠিক ছিল। অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা। তাদেরকে কাদিয়ানী হিসেবে বাকি রাখা এবং রাষ্ট্রীয় ও আইনী নিরাপত্তা প্রদান করার অর্থ তাদের ইলহাদের উপর রাজি থাকা এবং দলীয়ভাবে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ করা। অথচ এ বিষয়ের উপর উম্মতের ইজমা রয়েছে যে, রহমাতুললিল আলামীন, খাতামুন নাবিইয়িন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যারা বেয়াদবী করবে, তারা ওয়াজিবুল কতল। তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। ইসলামী রাষ্ট্রের

অনুমতি ছাড়াও যদি কোনো ব্যক্তি এদেরকে হত্যা করে, তবে এর জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হবে না।

এবার একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন, যাদের ব্যাপারে শরীয়তের এই নির্দেশ ছিল যে, তাদের জান-মাল মুসলমানদের জন্য মুবাহ, কোনো মুসলমান রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়াও যদি তাদেরকে হত্যা করে, তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে, এ কারণে সে শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরাধী হবে না। এখন এই শ্রেণীর জান-মালকে সম্মানিত ঘোষণা করে রাষ্ট্রের উপর তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। অথচ এখনো তারা পূর্ববৎ যিন্দিক এবং মুলহিদই রয়েছে। তাদের ইবাদতখানা পূর্বের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের ধর্মপ্রচার পূর্বের তুলনায় আরও প্রকাশ্যে হচ্ছে। এবার আপনারাই ভাবুন, কাদিয়ানীদের জন্য মন্দ হয়েছে নাকি ভালো হয়েছে? আপনারা এমন একটা দলকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যারা কোনো অবস্থাতেই দেশে থাকার অনুমতি পেতে পারে না। এরা আদি কাফের থেকেও নিকৃষ্ট। কারণ আদি কাফেররা যিম্মি হয়ে মুসলিম দেশে থাকতে পারে। কিন্তু যিন্দিক ও মুরতাদরা তা থাকতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় হল এরা শুধু দেশে আছে তাই নয়, বরং এরা অন্য সবার মত রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সাথেও জড়িত রয়েছে।

যদি এ কথা বলা হয় যে, কাদিয়ানীরা আগে মুরতাদ ছিল, আর এখন তাদের সন্তানেরা আদি কাফেরের হুকুমে। তাদের এই ধারণাও ভুল। কাদিয়ানীরা না আগে মুরতাদ ছিল, না এখন আদি কাফের। শরীয়তের দৃষ্টিতে তারা আগেও যিন্দিক ছিল, এখনও যিন্দিক রয়েছে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমে পাগলপারা মুজাহিদরা যখন লাহোরে কাদিয়ানীদের কেন্দ্রে আক্রমণ করে, তখন কতিপয় মানুষ এ কথা বলে আক্রমণের নিন্দা জানিয়েছিল যে, কাদিয়ানীদেরকে যেহেতু কাফের ঘোষণা করা হয়েছে, সুতরাং তারা এখন যিম্মি। এমনকি কতিপয় ইলমের বোঝা বহনকারী এ কথা পর্যন্ত বলেন যে, কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাদিয়ানীদের সাথে দাঁড়াবেন, তাদের সাথে থাকবেন। (আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। 'নকলে কুফর কুফর নাবাশাদ'–কুফরি কথা-উদ্ধৃতি কুফরি হবে না।) অথচ আহলে ইলমগণ জানেন যে, কাদিয়ানীরা যিন্দিক। আর যিন্দিকরা যিম্মি হতে পারে না। সুতরাং যেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে এত বড় অপবাদ আরোপ করেছে যে– খাতামুন নাবিইয়িন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন মালউন ও অভিশপ্তদের সাথে থাকবেন, যারা খতমে নবুওয়াতের আকিদাকে রক্তাক্ত করেছে, যে-ই ফেরকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট দুশমন।

যারা এমন মারাত্মক কথা বলেছেন, তাদের তাওবা করা উচিত। অন্যথায় কাদিয়ানীদেরকে ভালোবাসার অপরাধে তাদের সাথেই হাশর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গণতান্ত্রিক সংবিধান ও ইসলাম

গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা মানুষকে এই অধিকার দেয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিজেদের জন্য যে-ই জীবনব্যবস্থা ও সংবিধান পছন্দ করবে, তারা তা গ্রহণ করতে পারবে। এই অধিকার তাদের রয়েছে। তারা যা ইচ্ছা হালাল করবে, যা ইচ্ছা হারাম করবে। যেই দেশ মানুষের এই অধিকার মেনে নিবে, সেটাই আইনী রাষ্ট্র। কোনো রাষ্ট্রে যদি মানুষের এই অধিকার মেনে নেয়, এমন রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক আইনী সাংবিধানিক রাষ্ট্র বলার অধিকার রাখে না।

সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করা সর্বসম্মতক্রমে কুফরি। অথচ এই ব্যবস্থায় আল্লাহর সাথে শুধু সমকক্ষই সাব্যস্ত করা হয় না, বরং আল্লাহর থেকে এই অধিকার– নাউযুবিল্লাহ– পার্লামেন্টকে দেয়া হয়।

আল্লাহ তায়ালা সংবিধানে তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করাকে স্পষ্ট অপরাধ ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

> আর তিনি (আল্লাহ তায়ালা) তার হুকুমে (আইনে) কাউকে শরিক করেন না। *[সূরা কাহাফ : ২৬]*

ইমাম বাগবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

ইবনে আমের এবং ইয়াকুব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর আরেক কিরাত وَلَا تُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا এর কথা বলেছেন। যার অর্থ, তোমরা আল্লাহর হুকুমে (আইনে) অন্য কাউকে শরিক কর না।[১৩]

কারণ এই আইন প্রণয়নের অধিকার কেবল একজনেরই, যিনি এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বজগতের মহান বাদশা তাঁর সত্য গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন–

---

[১৩] تفسير معالم التنزيل المعروف تفسير البغوي : الجزء ٥. للامام محي السنة أبي محمد الحسن بن مسعود البغوي (المتوفي ٥١٦هـ)

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ (আইন প্রণয়ন) তাঁরই। *[সূরা আ'রাফ : ৫৪]*

এই আয়াতের তাফসীরে হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত মুফাসসির ও ফকীহ, ইমাম আবু লাইস সমকন্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

ألا كلمة التنبيه. يعني: اعلموا أن الخلق لله تعالي. وهو الذي خلق الأشياء كلها وأمره نافذ في خلقه

আয়াতের ألا শব্দটি সতর্কতাজ্ঞাপনের জন্য। এর উদ্দেশ্য হল, জেনে রেখো, সৃষ্টিজীব (সৃষ্টি করা) আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট। তিনিই সেই মহান সত্ত্বা, যিনি পৃথিবী এবং সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর হুকুম ও আইনই এখানে বাস্তবায়িত হবে।[১৪]

ইমাম নিশাপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

আয়াতটি এ কথার দলিল যে, কারো উপর কোনো বিষয় আবশ্যক করা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও অধিকার নেই। *[তাফসীরে নিসাবুরী, দ্বিতীয় খণ্ড]*

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁর তাফসীরে এ কথাই বলেছেন। *[তাফসীরে রাযী দ্রষ্টব]*

আয়াতটি এ কথাই বলছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র আইন ও সংবিধান প্রণেতা। সুতরাং কেউ যদি এর যে কোনো একটা গুণ ও বৈশিষ্ট্য অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করে, এর অর্থ হবে সে তার মুখে পাঠ করা কালেমাকে অস্বীকার করছে।

কোনো ব্যক্তি যদি মাজারে গিয়ে কবরস্থ ব্যক্তির নিকট কিছু চায় এবং এ কথা বলে যে, হে পীর! আমাকে সন্তান দিন। অথব কোনো ব্যক্তি যদি তার সন্তানকে পীরের দিকে সমন্ধযুক্ত করে বলে, আমার এই সন্তানকে অমুক পীর দিয়েছে। আপনি সাথে সাথে তাকে মুশরিক বলবেন। কিন্তু কেউ যদি এ কথা বলে যে, অমুকে আইন প্রণয়নের অধিকার রাখে, অথবা যদি এ কথা বলে যে, সংবিধান তৈরি করা পার্লামেন্টের কাজ... আপানি তাকে মুশরিক বলবেন না। কারণ যে ব্যক্তি এ কাজ

---

١٤ تفسير بحر العلوم: الجزء ٢. للشيخ أبو الليث السمرقندي

করছে, সে ক্ষমতাশালী, সরকারের লোক। অথচ আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে সৃষ্টির মত আইন প্রণয়নকেও তাঁর বিশেষ গুণ বলেছেন।

মনে রাখবেন, আইন তৈরি করা একমাত্র আল্লাহরই অধিকার। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে নিজের পক্ষ থেকে আইন তৈরি করার এবং কোনো জিনিসের জায়েয-নাজায়েয ও বৈধ বা অবৈধ হওয়ার হুকুম লাগাতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

> ومن زعم أن الله جعل للعباد شيئا من الأمر فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه. لقوله: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ)
>
> আর যে ব্যক্তি এই ধারনা করেছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর 'আল-আমর' (সংবিধান ও আইন প্রণয়ন) এর সিফাত (গুণ) হতে বান্দার জন্য কিছু অধিকার দিয়েছে, নিঃসন্দেহে সে কুফরি করল, ওই সমস্ত বিষয়ের যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীগণের উপর নাজিল করেছেন। আল্লাহ তায়ালার বাণী أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ এর আলোকে।[১৫]

যেই গুণ কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, তা আল্লাহর থেকে নিয়ে মানুষকে দেয়া কিংবা মানুষকে তার সমান সাব্যস্ত করা কি আল্লাহকে অস্বীকার করা নয়? আল্লাহকে এর চেয়ে বেশি অস্বীকার আর কি হতে পারে!

আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

বিশ্বজগতের প্রতিপালক নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে জায়েয নাজায়েয ও বৈধ-অবৈধের ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার দেননি। এমনকি কোনো নবীকেও আল্লাহ তায়ালা এই অনুমতি দেননি যে, তিনি আল্লাহর হুকুম ছাড়াই নিজের পক্ষ হতে কোনো বিষয় হালাল বা হারামের ঘোষণা দিবেন। তাহলে একজন সাধারণ মানুষের জন্য এটা কি করে জায়েয হতে পারে যে, সে আল্লাহর আইনের বিপরীত নিজের পক্ষ হতে আইন প্রণয়ন করবে এবং এতে এমন বিষয়কে জায়েয ও বৈধ ঘোষণা করবে যাকে আহাকামূল হাকিমীন কিয়ামত পর্যন্তের জন্য চিরস্থায়ী আইনে (কুরআন) নাজায়ে এবং অবৈধ বলেছেন। অথবা এমন কোনো বিষয়কে নাজায়েয

---

[১৫] جامع البيان في تأويل القران المعروف تفسير طبري : الجزء ١٢. تفسير سورة الأعراف : ٤٥. للامام محمد بن جرير. أبي جعفر الطبري. وتفسير القرأن العظيم المعروف تفسير ابن كثير : الجزء ٣. تفسير سورة الاعراف 54. للامام أبي الفداء اسماعيل بن عمر بين كثير القرشي الدمشقي

ও অবৈধ ঘোষণা করে পালন করতে বাধ্য করবে, আল্লাহ তায়ালা যা জায়েয এবং বৈধ বলে তা করার নির্দেশ দিয়েছেন।'

আরব বিশ্বের বিখ্যাত আলেম শায়েখ সফরুল হাওয়ালি 'শরহু আকিদাতুত তাহাবিয়াহ'য় (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) এর ব্যাখ্যায় বলেন–

> ... وفي هذه الاية دليل على انه لايجوز لاحد غيرالله تبارك وتعالى ان يشرع للناس باي حال من الاحوال. فالشرع المتبع انما هو شرع الله ودينه. لأن الله تعالي هو الذي خلق الخلق. فكيف يكون له الخلق ويكون لغيره الأمر والنهي؟
>
> এই আয়াতে এ কথার দলিল রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো কোনো অবস্থাতেই মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করা জায়েয নেই। সুতরাং যেই শরীয়তের আনুগত্য করা উচিত, সেটা হবে আল্লাহ তায়ালার শরীয়ত এবং তার দীন। কারণ আল্লাহ তায়ালাই মখলুককে সৃষ্টি করেছেন। বিধায় এটা কি করে হতে পারে যে, খালেক ও স্রষ্টা হওয়া তো তার জন্যই নির্দিষ্ট, আর আমর ও নাহির (তথা কি করতে হবে, কি করা যাবে না, অথবা আইন তৈরি করা) অধিকার থাকবে অন্যের কাছে?'[১৬]

বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে সহজে এভাবে বুঝাতে পারেন যে, কোনো ব্যক্তি গাড়ি তৈরি করেছে, গাড়িটি চালানোর পদ্ধতি তো সেই বলবে। এই এই কাজ করতে হবে..., এই এই কাজ করা যাবে না...। গাড়ি চালানোর জন্য এক্সলেরেটার চাপ দিতে হবে এবং থামানোর জন্য ব্রেক ধরতে হবে...। যেই ড্রাইভার গাড়ির আবিস্কারকের কথা না শুনে নিজের ইচ্ছা মত কাজ করবে, তার সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? যেখানে ব্রেক করার কথা সেখানে সে এক্সলেরেটার চাপ দিল। গাড়ি সম্মুখে চালানোর সময় রিভার্স গিয়ার লাগাল। গাড়ি ডানে ঘুরানের প্রয়োজন, স্টিয়ারিং বামে ঘুড়ালো...। বলার অপেক্ষা রাখে না এমন ড্রাইভার নিজে তো মরবেই, সাধারণ মানুষকেও মারবে। এজন্য এমন অনাড়ি ড্রাইভারকে শক্তি প্রয়োগ করে গাড়ি থেকে তুলে বাইরে নিক্ষেপ করতে হবে।

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা যখন বিশ্বজগতের স্রষ্টা, তো এই পৃথিবী চালানোর জন্য তাঁর বলে দেয়া পদ্ধতিই চলবে। যাকে জীবনব্যবস্থা, জীবন যাপন পদ্ধতি বা

---

١٦ شرح العقيدة الطحاوية: الجزء الاول باب الشفاعة لسفر بن عبدالرحمن الحرالي

জীবনবিধান বলা হয়। তাঁর জীবনবিধান ব্যাতীত অন্য কোনো জীবন বিধান চালু করা হলে ধ্বংস অনীবার্য। এই জন্য আল্লাহ তায়ালা এমন অনাড়িদেরকে ড্রাইভিং সিট (মানুষের নেতৃত্ব) থেকে তুলে দূরে নিক্ষেপ করার জন্য এই উম্মতের উপর জিহাদ ফরজ করেছেন, আর বলেছেন, এই জিহাদ সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত।

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

> আর আলাহ যদি মানুষের কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই যমীন ফাসাদপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আলাহ বিশ্ববাসীর উপর অনুগ্রহশীল। *[সূরা বাকারা : ২৫১]*

আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে এই পৃথিবী চালানোর পদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাদের দায়িত্ব হল, তারা এসব অনাড়িদেরকে কিতালের ক্ষমতার মাধ্যমে তুলে নিক্ষেপ করবে। যাতে বিশ্বমানবতা ধ্বংস হওয়া থেকে বেঁচে যায়।

শায়েখ সফরুল হাওয়ালি এরপর বলেন–

> وهذا ما فعله الناس في الجاهلية الأولي وفي كل جاهلية في كل زمان ومكان. يؤمنون بأن الله له الخلق. ولكن يجعلون لغيره الأمر. فيشرعون ويسنون القوانين ويحلون مايشاءون. ويحرمون ما يشاءون. وهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالي. وهو حقيقة الطاغوت الذي أمرالله تبارك وتعالي أن يكفر به. ولايكون الانسان مؤمنا الا اذا كفر بالطاغوت الذي يشرع من دون الله تعالي....

> প্রাচীন জাহেলিয়াতের যুগে এমনকি যুগে যুগে প্রতিটি অঞ্চলের জাহেলিয়াতের সময় মানুষ এমন করত যে, স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকে তো ঠিকই বিশ্বাস করত কিন্তু জীবন বিধান প্রণয়নের অধিকার অন্য কারও জন্য সাব্যস্ত করত। তারা সংবিধান তৈরি করত, আইন প্রণয়ন করত। ইচ্ছামত হালাল হারাম নির্ধারণ করত...। এমন কাজ করা শিরকে আকবার, জঘণ্য শিরক। এই গুনাহ আল্লাহ তায়ালা কখনোই ক্ষমা করবেন না। আর মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না এই

তাগুতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করবে, যারা আল্লাহর আইনের মোকাবেলায় আইন প্রণয়ন করে, সংবিধান তৈরি করে।[১৭]

শরীয়তের খেলাফ আইন প্রণয়নকারী নিজেকে ইলাহ এবং মা'বুদে পরিণত করে

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন−

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

তাদের জন্য কি এমন কিছু শরিক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? *[সূরা আশশূরা : ২১]*

এই আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন− হে নবী! তারা সেই দীনের পায়রুবি করে না, যেই দীন আপনাকে আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন। বরং তারা সেই দীন (সংবিধান− লেখক) বিশ্বাস করে এবং মানে, যা এর শয়তানরা (বিশেষজ্ঞরা) তাদেরকে দিয়েছে। চাই সেই শয়তান মানুষের মধ্য হতে হোক অথবা জিনদের মধ্য হতে হোক। যেমন তাদের শয়তানরা তাদের বাহিরা, সায়িবা, ওসিলা এবং হাম ইত্যাদি হারাম করে দিয়েছে। আর মৃতজন্তু বক্ষণ করা, রক্ত পান করা এবং জুয়া ইত্যাদী হালাল করে দিয়েছে। (আর এরা নিজেদের কৃত এই হালাল ও হারামকে মানে।)

কাজি সানাউল্লাহ পানিপতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে মাযহারীতে বলেন−

قال ابن عباس رضي الله عنهما : شرعوا دينا غير دين الاسلام

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা বলেন, তারা ইসলামী জীবনব্যবস্থার বিপরীতে আরেকটা জীবনব্যবস্থা তৈরি করে নিয়েছে।

এরপর বলেন−

أيقبلون ما شرع الله أم يقبلون ما شرع لهم شركائهم

তারা কি সেই আইন গ্রহণ করবে যা আল্লাহ বানিয়েছেন, নাকি সেই আইন গ্রহণ করবে যা তাঁর শরিকরা তাদের জন্য প্রণয়ন করেছে?

এর থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তিই এই অধিকারকে গায়রুল্লাহর সাথে নির্দিষ্ট করবে, সে তাকে ইলাহ হিসেবে স্বীকার করে নেবে।। যেমন ইমাম নাসাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীর مدارك لتنزيل وحقائق التاويل এ বলেন−

---

[١٧] شرح العقيدة الطحاوية : الجزء الاول- باب الشفاعة- لسفر بن عبدالرحمن الحوالي

... ايقبلون ما شرع الله من الدين أم لهم الهة...

তারা কি সেই দীন (জীবনব্যবস্থা) কবুল করে যা আল্লাহ তায়ালা বানিয়েছেন, নাকি তাদের অন্য আরও মা'বুদ ও উপাসক রয়েছে...?

ইমাম নাসাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ কথা বলছেন যে, এরা যদি আল্লাহর নাযিলকৃত জীবনব্যবস্থা (শরীয়ত প্রবর্তন) কবুল না করে, যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন, তবে নিশ্চিত তারা এই জীবনব্যবস্থা ছাড়া অন্য জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অথচ জীবনব্যবস্থা, সংবিধান বা আইন প্রণয়নের গুণ (সিফাত) কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। এভাবে তো এরা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে মা'বুদ বানানেওয়ালা হয়ে যাবে।

ইমাম আবু লাইস সমরকান্দি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

مَالَهُمْ شُرَكَاءُ يعني: ألهم الهة دوني

আমি ছাড়া তাদের কি অন্য আরো মা'বুদও রয়েছে।[১৮]

ইমাম নিশাপুরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

أفيقبلون ما شرع الله لهم من الدين أم لهم الهة

তারা কি আল্লাহর তৈরিকৃত সংবিধান গ্রহণ করবে না কি তাদের আরও কোনো মা'বুদ রয়েছে (যারা তাদের জন্য সংবিধান তৈরি করবে)? *(তাফসীরুন নিশাপুরী)*

বোঝা গেল, এই সিফাত ও গুণে যাকে আল্লাহর শরিক বানানো হবে, সে তার 'মা'বুদ'। আর কারও সাথে বান্দার এই সম্পর্ক হল 'ইবাদত'। কারণ মা'বুদ ও ইলাহী তাকেই বলা হয়, যার ইবাদত করা হয়। সুতরাং আইন প্রণেতা গণতান্ত্রিক আইনী রাষ্ট্র, পার্লামেন্ট এবং পার্লামেন্ট মেম্বাররা (সংসদ সদস্যরা) মূলত 'মা'বুদ' ও উপাসক, আল্লাহর বিপরীতে যাদের ইবাদত করা হয়।

উপরে উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

উদ্দেশ্য হল, কোনো মানুষের জন্য কোনো বস্তুকে হারাম বলার অধিকার নেই। তবে হ্যাঁ, শরীয়ত যেটাকে হারাম বলেছে, কেবল সেটাকেই হারাম বলতে পারবে।[১৯]

---

[১৮] *তাফসীরে বাহরুল উলূম, ইমাম আবু লাইস সমরকান্দি*

[১৯] كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية' جلد ٢٠' ص ٣٥٨

আল্লাহর হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা

মা'বুদে হাকিকী ছাড়া অন্য কারো জন্য নিজের পক্ষ হতে আল্লাহর হালালকে বেআইনি অর্থাৎ হারাম এবং হারামকে আইন সম্মত অর্থাৎ হালাল ঘোষণা করার অধিকার নেই। এই হক ও অধিকার শুধুই মা'বুদের জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, অথবা কারো জন্য এই হক ও অধিকার স্বীকার করবে, এর অর্থ সে তাকে তার মা'বুদ বানালো, মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করল।

গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থায় আল্লাহর এই অধিকারে পার্লামেন্টকেও শরিক বানানো হয়। বরং বাস্তবতা হল, শুধু শরিকই বানানো হয় না, আল্লাহর এই অধিকার পরিপূর্ণরূপে পার্লামেন্ট বা রাষ্ট্রকে দিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য যদি সুদের মত অভিশাপকে হালাল (আইন সম্মত) ঘোষণা করে, তো গণতন্ত্রের অনুসারীদের জন্য তা 'পবিত্র আইন'-এর অংশ। তাদের আকিদা অনুযায়ী এর সম্মান করা ওয়াজিব।

এই ঘৃণ্য কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বড় কঠিনভাবে সতর্ক করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিয্ক নাযিল করেছেন, অতঃপর তোমরা তার কিছু করে নিয়েছ হারাম ও হালাল'। বল, 'আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর উপর তোমরা মিথ্যা রটাচ্ছ'? *[সূরা ইউনুস : ৫৯]*

انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا

দেখ, কেমন করে তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে। আর প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটিই যথেষ্ট। *[সূরা নিসা : ৫০]*

আল্লাহর বিরোধিতা ও আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকেই এরা দীন বলে। আল্লাহকে মিথ্যাপতিপন্ন করাকে ঈমান বলে। আল্লাহ তায়ালা যেই জিহাদকে ফরয করেছেন, এরা সেটাকে সন্ত্রাস ঘোষণা করে হারাম (বেআইনী) বলে।

হে ঈমানদারগণ! চোখ খুলে একটু দেখো, তোমাদের রবের বিরুদ্ধে কেমন নির্দয়ভাবে মিথ্যাচার করছে এবং তার প্রচার করে বেড়াচ্ছে...।

এই আয়াতের তাফসীরে আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

> কেমন বিস্ময়কর কথা! আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও নিজেকে আল্লাহর বন্ধু বলে এবং আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার দাবি করে!

সত্যবাদি হলে প্রমাণ দাও

পবিত্র কুরআনের সূরা আনআমের ১৫০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

> قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

> বল, 'তোমাদের সাক্ষীদেরকে নিয়ে আস, যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ এটি হারাম করেছেন'। অতএব যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিয়ো না। আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না এবং যারা তাদের রবের সমকক্ষ নির্ধারণ করে। *[সূরা আল আনআম : ১৫০]*

ইমাম বায়যাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সাক্ষ্য না দেয়ার উদ্দেশ্য ইহা বর্ণনা করেছেন যে–

> আপনি তার সাক্ষ্য সত্যায়ন করবেন না। আপনি তার সাক্ষ্যর অনিষ্ট বর্ণনা করুন।[২০]

আল্লাম আলুসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

> এই সাক্ষী হল তাদের নেতারা, যারা এই গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার প্রতিষ্ঠাতা ও আবিস্কারক। যারা এর ভিত্তি রেখেছে। *[তাফসীরে রুহুল মাআনী]*

গণতন্ত্রের পূজারীদের নিকটও কি কোনো সারকারি মৌলভী রয়েছে, যারা এ কথার সাক্ষী দিবে যে, গণতন্ত্রের সংসদ যা কিছু (যেমন হরবি কাফেরদের সাথে কিতাল,

---

[২০] –আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল লিল বায়যাবী

বিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা ইত্যাদি) হারাম বা বেআইনী ঘোষণা করে– এর পক্ষে তাদের নিকট কুরআন ও হাদীসের দলিল প্রমাণ রয়েছে?...

আল্লাহওয়ালারা কি এরপরও এমন জায়গায় বসতে পারে, যেখানে আল্লাহর বিরুদ্ধে এমন অপবাদ আরোপ করা হয়?...

এমন মন্দিরের পক্ষে কি কেউ কুরআন-হাদীস দ্বারা দলিল দিতে পারে, যেখানে এসব জনপ্রতিনিধিদেরকে আল্লাহর সমান বানানো হয়?...

এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কুফরি হওয়ার বিষয়টি পূর্বে যদি অস্পষ্টও থেকে থাকে, এখন তো অন্ততপক্ষে ৬৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং হককানী অনেক ওলামায়ে কেরামের প্রামান্য রচনাবলী প্রকাশিত হওয়ার পর, এর কুফরি হওয়ার বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং এখনও এই মন্দিরে বসার দুঃসাহস সেই ব্যক্তিই করতে পারে, যে দুনিয়ার জীবনকেই প্রকৃত জীবন ভেবেছে এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার জন্যই দৌড় ঝাপ করছে।... এটা কত মারাত্মক জুলুম ও গাদ্দারী মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর রবের সাথে।

হালালকে হারাম এবং হারামকে হালালকারীর হুকুম

শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

تحليل الحرام وتحريم الحلال في أية جزئية كفر يخرج من الاسلام

يقول ابن تيمية : (من ادعى حل النظرة فقد كفر بالاجماع. ومن حرم الخبز فقد كفر بالاجماع)

যে কোনো একটা হারামকে হালাল বলা অথবা হালালকে হারাম বলা এমন কুফরি, যা দীন থেকে খারেজ করে দেয়। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি নামাহরামকে (পরনারী বা পরপুরুষ) দেখা বৈধ হওয়ার দাবি করেছে, সর্বসম্মতিক্রমে সে কুফরি করেছে। আর যে ব্যক্তি রুটিকে হারাম ঘোষণা করেছে, সেও সর্বসম্মতিক্রমে কুফরি করেছে।[২১]

---

[٢١] العقيدة وأثرها في بناء الجيل : للشيخ عبدالله عزام رحمه الله . ص: ٨٢

ইমাম আবু জাফর তাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি شرح معانی الاثار গ্রন্থে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফাতহুল বারীর باب حد الخمر এর অধীনে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটি কানজুল উম্মালেও উল্লেখ রয়েছে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন–

হযরত ইয়াজিদ বিন আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম যে জামানায় সিরিয়ার আমির ছিলেন, সিরিয়ার কতিপয় মানুষ এ কথা বলে মদ পান করা শুরুকরে যে, 'আমাদের জন্য তো মদ হালাল।' তারা পবিত্র কুরআনের আয়াত لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا[২] দ্বারা মদ বৈধ হওয়ার দলিল পেশ করে। তখন ইয়াজিদ বিন আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে এই ফিতনা সম্পর্কে অবগত করেন। হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাৎক্ষণাৎ ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে লিখে পাঠান– 'এরা ওখানে গোমরাহী ছড়ানোর পূর্বেই তুমি এদেরকে গ্রেফতার করে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও।' হযরত ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাদেরকে গ্রেফতার করে পাঠানোর পর হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেন। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে বলেন, 'আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের মতে তো এরা (আয়াতে কারিমার তাবিল [অপব্যখ্যা] করে) আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে অপবাদ লাগিয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা যেই জিনিসকে হারাম করেছেন, কোনো অবস্থাতেই অনুমতি দেননি, এরা ধর্মে সেই জিনিসকে হালাল বানিয়েছে। সুতরাং (এরা মুরতাদ) আপনিদে এদের সবাইকে হত্যা করুন।

(সাহাবায়ে কেরামের এই মত প্রকাশের পরও) হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু চুপ ছিলেন। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবুল হাসান! তোমার মত কি?

আলী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, আমার মত হল এদেরকে এই আকিদা থেকে তাওবা করার হুকুম দিন। যদি তাওবা করে, তবে মদ পান করার অপরাধে এদেরকে আশি বেত্রাঘাত (মদ্যপানের হদ-শাস্তি) লাগিয়ে ছেড়ে দিন। আর যদি তাওবা না করে, তবে এদেরকে (কাফের এবং মুরতাদ ঘোষণা করে) হত্যা করুন। কারণ তারা আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছে আর ধর্মে এমন জিনিসকে জায়েয ও হালাল সাব্যস্ত করেছে, আল্লাহ তায়ালা যার অনুমতি দেননি।'

যাহোক, (সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এই মতের উপর একমত হন এবং) হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাদেরকে তাওবা

> করার নির্দেশ দেন। তারা তাওবা করে। এরপর (মদপানের শাস্তি হিসেবে) তাদেরকে আশি বেত্রাঘাত লাগানো হয়।[২২]

এখন যদি কেউ এ কথা বলে যে, আমরা তো গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার মধ্যে থেকেও আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হারামই মনে করি। তাহলে প্রশ্ন, এমন কি হতে পারে যে, হারামকে হারাম বিশ্বাস করবেন আর সেই কাগজপত্র ও সংবিধানকে পবিত্র বলবেন, যাতে অসংখ্য হারাম বিষয়কে হালাল এবং হালালকে হারাম বলা হয়েছে? এই সংবিধানের উপর আনুগত্যের শপথ নিবেন, এর আনুগত্য করার জন্য মানুষকে আহ্বান করবেন। এর বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত করবেন না...? এটা কি আল্লাহর বিধানাবলীর সাথে উপহাস করা নয়?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ

> আর সে ব্যক্তির চেয়ে জালিম আর কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তার নিকট সত্য আসার পর তা অস্বীকার করে? *[সূরা আনকাবুত : ৬৮]*

আল্লাহ তায়ালা অন্য এক জায়গায় এই মিথ্যার কথাও বর্ণনা করেছেন, যা তার বিরুদ্ধে বলা হত।

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا

> আর যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, 'আমরা এতে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন'। *[সূরা আরাফ : ২৮]*

ইসলামের কতিপয় কানুনকে আইনের অংশ বানানো

সাধারণত মুসলিম দেশগুলোর আইনে কিছু ইসলামী ধারা অন্তর্ভুক্ত করে এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে, এটা ইসলামী আইন। সুতরাং এর আনুগত্য করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরয।

এ প্রসঙ্গে প্রথমত সেই কথাই স্মরণ রাখতে হবে যা পূর্বে বলা হয়েছে। গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থায় কোনো আইন ততক্ষণ পর্যন্ত আইন হতে পারে না, যতক্ষণ না মানবজ্ঞান অর্থাৎ সংসদ সদস্যরা এটাকে আইন হওয়ার যোগ্য মনে না করে। আর আল্লাহর আইনকে অনুমোদনের জন্য মানুষের মুখাপেক্ষী হওয়া স্পষ্ট কুফরি।

---

[২২] *–শরহু মাআনিল আসার : ২/৮৯, ইমাম আবু জাফর তাহাবী*

দ্বিতীয় কথা হল, কোনো আইনে দু'চারটি ইসলামী আইন থাকলেই কি সেটা ইসলামী আইন হওয়ার জন্য যথেষ্ট? কিছু কুফরি আর কিছু ইসলামীর সমষ্টিকে কি ইসলাম বলা যেতে পারে? কখনোই না। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনের জায়গায় জায়াগয় বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? *[সূরা বাকারা : ৮৫]*

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশ্বাসীদেরকে পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। *[সূরা বাকারা : ২০৮]*

এখানে ইসলামে পরিপূর্ণরূপে দাখেল হওয়ার নির্দেশ করা হয়েছে। পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, তোমরা শয়তানের আনুগত্য কর না। এর অর্থ হল, তোমরা যদি পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ না কর, ইসলামের কিছু কথা মানলে আর কিছু কথা ছেড়ে দিলে, তবে এটা শয়তানের আনুগত্য হল। শয়তান এর দ্বারা খুশি হয়।

আমেরিকা আজ মুসলমানদের নিকট এটাই দাবি করছে, এটাই চাচ্ছে। তোমরা নামায, রোযা, হজ করে যাও কিন্তু বিচারব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে আমাদের তৈরিকৃত দীন-ধর্মই অনুসরণযোগ্য হবে। যারা এমন করছে, আমেরিকা তাদের প্রতি খুশি। আর যারা আমেরিকার দীন-ধর্ম মানতে অস্বীকার করে এবং এ কথা বলে যে, আল্লাহর জমিনে কেবল আল্লাহরই দীন চলবে, তাঁর দীন ছাড়া অন্য কোনো দীন ও জীবনব্যবস্থা চলতে পারে না, সাথে সাথে আমেরিকা ও পরকালবিমূখ সমস্ত শক্তি জোট বেধে জ্বলে ওঠে। পবিত্র কুরআনে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, এক আল্লাহর কথা বলা হলে তাদের অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যগুলোর কথা বলা হলে তখনই তারা আনন্দে উৎফুল হয়। *[সূরা যুমার : ৪৫]*

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে, ইহুদী ও নাসারারা যেন আপনাকে কতিপয় ইসলামী আইন থেকে বিচ্যুত না করে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন–

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

> আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফয়সালা কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। *[সূরা মায়েদা : ৪৯]*

এই আয়াতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাফেররা চাইবে, যে কোনোভাবে হোক মুসলমানরা কুরআনের কোনো কোনো বিষয় বাদ দিয়ে আমাদেরটা মানুক। কারণ তারা এ কথা জানে যে, মুসলমানদের এমন কাজ অর্থ তারা মূলত ইবলিসেরই অনুসরণ করল এবং ফিতনায় নিপতিত হল।

এই আয়াতের তাফসীরে হাফেয ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে–

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এমন লোকদের অভিযোগ রদ করেছেন যারা আল্লাহর কুরআন ছেড়ে (যাতে রয়েছে সমূহ কল্যাণ) এমন আইনের দিকে যায়, যা মানুষের রায় ও প্রবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং সেসব (আইনী) পরিভাষা গ্রহণ করবে যা মানুষ শরীয়তের দলিল ছাড়াই তৈরি করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন করল, সে কাফের। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আইনের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে। সুতরাং ইহা ছাড়া অন্য কোনো আইন দ্বারা ফয়সালা করা হবে না, হোক সেটা ছোট সমস্যা কিংবা বড়। *[তাফসীরে ইবনে কাসির, ২য় খণ্ড]*

ইবনে জাওযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি যাদুল মাসির গ্রন্থে লিখেছেন–

زادالمسير গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসীরে (بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) দুটি মত বর্ণনা করা হয়েছে। এক হল 'রজম', এটি হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মত। আর দ্বিতীয় মত হল, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল কিসাসের ধরন, এটি মাকাতিল রহমাতুল্লাহি আলাইহির মত।

এই আয়াতের শানে নুযুল তথা নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইমামুল মুফাসসিরীন ইবনে জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীর গ্রন্থ জামেউল বয়ান ফি তাবিলিল কুরআন-এ লিখেছেন–

> কতিপয় ইহুদী সরদার ও পণ্ডিত একত্রিত হয়ে পরস্পরে আলোচনা করে যে, আসো আমরা মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার দীনের ব্যাপারে ফিতনায় ফেলি।
>
> যাহোক, এর পর তারা সবাই একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে এবং বলে, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি তো জানেন আমরা ইহুদীদের সম্মানিত ব্যক্তি এবং ধর্মীয় গুরু। আমরা যদি আপনাদের উপর ঈমান আনি তাহলে সমস্ত ইহুদী আমাদের সাথে সাথে আপনার উপর ঈমান নিয়ে আসবে। কিন্তু সমস্যা হল, আমাদের আর আমাদের কওমের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। আমরা আপনার মাধ্যমে ফয়সালা করাতে চাই। আপনি যদি আমাদের পক্ষে ফয়সালা করেন, আমরা তাহলে আপনার উপর ঈমান আনব। তাদের প্রস্তাব শোনার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতে অস্বীকৃতি জানান।'

যারা এই গণতান্ত্রিক কুফরি ব্যবস্থায় জড়িত হয়ে ইসলামের খেদমত করতে চায়, এই ঘটনায় ওই সব লোকদেরও জবাব রয়েছে। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মাত্র বিষয়েই শরীয়ত পরিপন্থি ফয়সালা করতে স্বীকার করেননি। অথচ এর দ্বারা পুরো ইহুদী কওম ধর্ম গ্রহণ করার মত বিশাল কল্যাণ অর্জিত হত। আর কাল্পনাপ্রসূত কল্যাণের খাতিরে ৬৫ বছর পর্যন্ত কুফরিতে ভরপুর গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার অংশ হয়ে থাকা কিভাবে ঠিক হতে পারে? সুতরাং ইসলামের খেদমতের নামে গণতন্ত্রের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য জরুরি হল, তারা যদি সত্যিই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিস হয়ে থাকে, তাহলে তারা নবীজির ইত্তেবা করে গণতান্ত্রিক এই কুফরি ব্যবস্থাকে অস্বীকার করুক এবং এর জন্য সব যুক্তিকে কুরবান করতে প্রস্তুত হোক।

আল্লামা আলুসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তাফসীরে বলেন–

> সাবধান থাকুন, তারা বাতিলকে হকের রূপে পেশ করার মাধ্যমে আল্লাহর নাজিলকৃত আইন হতে আপনাকে সামান্য হলেও ফিরিয়ে রাখতে চায়।

এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট থাকা উচিত যে, কিছু বিষয়ে কুরআন এবং হাদীসের পায়রুবি করা আর কিছু বিষয়ে কাফেরদেরকে মানা, এটা সাধারণ কোনো বিষয় নয়। কুরআন এটাকে ইরতিদাদ অর্থাৎ দীন থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক মুখ ফিরিয়ে নেয়া বলেছে। সূরা মুহাম্মাদে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

নিশ্চয় যারা হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান তাদের কাজকে চমৎকৃত করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দিয়ে থাকে। এটি এ জন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা যারা অপছন্দ করে। তাদের উদ্দেশ্যে, তারা বলে, 'অচিরেই আমরা কতিপয় বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব'। আল্লাহ তাদের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। *[সূরা মুহাম্মাদ : ২৫-২৬]*

এই আয়াত সুস্পষ্টভাবে এ কথা বলছে যে, কতিপয় বিষয়ে কাফেরদের পায়রুবি ও অনুসরণ করা, অনেক সময় মুরতাদ হওয়ার কারণও হয়।

আল্লামা কুরতুবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিখ্যাত তাফসীরে কুরতুবীতে এই আয়াতের তাফসীরে এ কথা বলেছেন যে–

এটা এ কারণে যে, তারা বলেছে আমরা কতিপয় বিষয়ে তোমাদেরকে মানব। যেমন মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরোধিতা করা, তার সাথে শত্রুতা চালিয়ে যাওয়া, তার সাথে শরিক হয়ে পরে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকা এবং গোপনে গোপনে তার কার্যক্রমকে দুর্বল করতে থাকা। তারা নিঃসন্দেহে কথাগুলো গোপনে বলেছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে এ সম্পর্কে জানিয়ে দেন। *[তাফসীরে কুরতুবী]*

আর ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং অধিকাংশ তাফসীরকারকগণ مَا نَزَّلَ اللَّهُ এর তাফসীর কিতাল করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর নাজিলকৃত যেই হুকুমকে তারা অপছন্দ করেছে, সেটা হচ্ছিল কিতালের হুকুম।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, বর্তমানে আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার সাথে জড়িত রাষ্ট্র ও শাসকরা কিতাল ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে কাফেরদের কথার উপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। এরপরও তাদের ঈমানে কোনো তারতম্য সৃষ্টি হয় না। বরং তাদেরকে ইমামুল মুসলিমীন প্রমাণ করা হয়।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে জালালাইনে এবং কাযী সানাউল্লাহ পানিপতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে মাযহারীতে এর তাফসীর এভাবে করেছেন–

> মুনাফিকদের এই ভ্রষ্টতা এ কারণে যে, তারা মুশরিকদেরকে বলেছে, কিছু কিছু বিষয়ে আমরা তোমাদের কথা মানব। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুশমনিতে আমরা তোমাদের সাহায্য করব এবং মানুষদেরকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত রাখব।

পবিত্র কুরআন তার পরবর্তী আয়াতে এই লোকদের পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলেছে-

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ

> অতঃপর তাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশসমূহে আঘাত করতে করতে তাদের জীবনাবসান ঘটাবে? *[সূরা মুহাম্মাদ : ২৭]*

জরুরিয়াতে দীন তথা ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় অস্বীকার করা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

> হযরত ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ের উপর এক মত যে, কোনো লশকর (বা দল) যদি শরীয়তের এমন কোনো নির্দেশ পালন করার ব্যাপারে প্রকাশ্যে অস্বীকার করতে থাকে, যা মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত, তবে তাদের সাথে কিতাল করা ওয়াজিব, যদিও তারা কালেমা শাহাদত পড়তে থাকে। নামায, রোযা ও হজের ফরযিয়্যাত অস্বীকার করা, কুরআন ও হাদীসের আইন না মানা, অথবা অশ্লীলতা, মদ্যপান ও মাহরামদেরকে বিবাহ করার হুরমতের বিধান স্বীকার না করা, অথবা মুসলমানদের জান-মাল শরয়ী হক ছাড়া হালাল মনে করা, সুদ জুয়াকে বৈধ বলা, অথবা কাফেরদের সাথে জিহাদ করা ও আহলে কিতাবের উপর কর নির্ধারণ করাকে হারাম সাব্যবস্ত করা সহ অন্যান্য ইসলামী বিধিবিধানকে এমনই মনে করা। যারা এমন মনে করবে, তাদের সাথে ওই সময় পর্যন্ত জিহাদ করে যেতে হবে যতক্ষণ না পরিপূর্ণ দীন (আইন ও সংবিধান) আল্লাহর না হবে।

বুখরী শরীফ ও মুসলিম শরীফের সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাথে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের সাথে কিতাল করার বিষয়ে

আলোচনা করেন, হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'আমি এমন লোকদের সাথে কিতাল করব না কেনো, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কর্তৃক ফরযকৃত বিষয় ছেড়ে দিচ্ছে, যদিও তারা মুসলমান? আল্লাহর কসম! তারা যদি উটের একটা রশি দেয়া থেকেও বিরত থাকে, যা তারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিত, তবে আমি তাদের সাথে অবশ্যই কিতাল করব।' হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আল্লাহ তায়ালা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বক্ষ উন্মোচন করে দিয়েছেন। তিনি হকের উপর ছিলেন।[২৩]

চিন্তা করে দেখুন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই কথা বলা যে, উটের একটা রশি দেয়া থেকেও যদি তারা বিরত থাকে, তবুও আমি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করব। অর্থাৎ পরিপূর্ণ যাকাত অস্বীকার করা তো অনেক মারাত্মক কথা, যা এরা করছে, এরা যাকাতের ফরযিয়্যাতের প্রবক্তা হওয়ার পরও যদি আমার নবী কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ থেকে কম দেয়, তখনও আমি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করব। রফিকে গারের (গুহা সঙ্গী) মত কোমল মেজাযের ব্যক্তির অবস্থানের এই কঠরতা সেই বুঝতে সক্ষম যে তার খুব কাছের মানুষকে প্রচণ্ড রকম ভালোবাসে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই অনুভূতি প্রচণ্ড রকমভাবে কাজ করছিল ছিল যে, কিয়ামতের যদি প্রিয়তম নবী জিজ্ঞাসা করেন, হে আবু বকর! আমি তো পরিপূর্ণ দীন তোমাদের হাতে রেখে এসেছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি কার অনুমতিতে এতে ত্রুটি রেখে এসেছ? মানুষের ভয়ে তুমি আল্লাহর শরীয়তকেই বদলে ফেলেছ?

বর্তমানের শাসকশ্রেণী কি আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে তাদের ইসেম্বলীর দ্বারা এমন আইন বানাচ্ছে না যা সরাসরি কুরআন-হাদীসের পরিপন্থি?

তারা কি সুদকে হালাল করেনি?

সারা দেশে কি সুদিকারবার ও ব্যাংক ইত্যাদি চালু করেনি?

তারা কি ইবলিস শয়তানকে খুশি করার জন্য কাফেরদের সাথে কিতাল করাকে হারাম এবং বেআইনি (সন্ত্রাস) ঘোষণা করেনি?

তারা কি জিহাদকারীদেরকে শাস্তি দেয়নি?

আমেরিকার সাথে মিলে কালেমাওয়ালা মুসলমানদের জান-মাল নিজেদের জন্য হালাল করেনি?

---

[২৩] کتب ورسائل وفتاوی ابن تیمیہ' جلد ۲۰' ص ٤٥ ۔

পার্লামেন্ট কি আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইকারীদেরকে হত্যা করা এবং তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করার অনুমতি দেয়নি?

তারা কি আল্লাহর নাযিলকৃত হুদুদ (রজম, মদ্যপানের শাস্তি, কিসাস ইত্যাদি)–এর বিরুদ্ধে তার ইসেম্বলীর মাধ্যমে আইন পাস করিয়ে তা বাস্তবায়ন করেনি?

এগুলো তারা হালাল এবং আইন সম্মত মনে করেছে বলেই তো দিয়েছে?

'খুরুজ আনিল ইমাম'-এর আলোচনা

এখানে আরও একটি বিষয় ভালো করে বুঝে নিন। মুসলিম বিশ্বে যখনই কোনো হক্কানী আলেম এবং মুজাহিদ এই কুফরি জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শরীয়ত প্রবর্তন করতে চায়, সরকারি ও দরবারি আলেমদের পক্ষ হতে তখন কঠিনভাবে বিরোধিতা করা হয়। তারা এটাকে 'খুরুজ আনিল ইমাম বা ইমামুল মুসলিমীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' সাব্যস্ত করে না জায়েয বলেন।

এমন জালেম শাসক, যারা মূর্তির পৃষ্ঠপোষক, ইবলিসী জীবনব্যবস্থার রক্ষক এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে সেনাশক্তির জোরে ছিয়াশি বছর থেকে (খেলাফতে উসমানিয়ার পতনের পর থেকে) ইসলামী নিযাম ও জীবনব্যবস্থা থেকে দূরে রেখেছে, তারা কি করে ইমামুল মুসলিমনী হতে পারে?

বৈশ্বিক বাস্তবতা

এখানে সুরতহাল হল, সমস্ত কুফরি শক্তি মিলে প্রথমে খেলাফতে উসমানিয়াকে ভেঙ্গেছে। মুসলিম দেশগুলোতে বাস্তবায়িত পবিত্র শরীয়তকে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের সেনাবাহিনী আক্রমণ করে খতম করেছে। এরপর প্রবৃত্তির ভিত্তিতে প্রণীত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মুসলিম বিশ্বের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

এই পর্যায়ে ইহুদীদের সম্মুখে একটি জটিলতা দেখা দেয়। এই ব্যবস্থা পরিচালনা ও নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় ব্যক্তির প্রয়োজন অনুভূত হয়। কারণ বাহির থেকে আসা সৈনিকরা এলাকা তো দখল করতে পারে, কিন্তু স্থানীয় লোকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করা তাদের জন্য সহজ কাজ ছিল না।

যাহোক, তারা এর সমাধান এভাবে করে যে, স্থানীয় লোকদের চিন্তা-ফিকির পরিবর্তনের জন্য মুসলিম কান্ট্রিগুলোতে আলীগড় স্টাইলে সেকুলার সিলেবাসের শিক্ষাব্যবস্থা তথা স্কুল কলেজের জাল বিছিয়ে দেয়। দাবি যদিও করা হয় যে, আমাদের (ইংরেজ ও ফ্রান্সিদের) উদ্দেশ্য মুসলিম জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ

করে পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদাবান করা, কিন্তু আল্লাহওয়ালাগণ তখনও এই 'শ্লোগান'-এর হাকিকত ও তাৎপর্য সম্পর্কে এমনভাবেই অবগত ছিলেন, বর্তমানের মানুষ প্রতারিত হওয়ার পর যেমন অবগত হয়েছে। আর অনেকে তো এখনও এই মরীচিকাকে গন্তব্য মনে করে তার পিছনে দৌড়াচ্ছে।

মসলিম জাতির দুশমন শক্তি মুসলমানদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কী দিবে? আধুনিক এই শিক্ষার দ্বারা তারা এমন এক শ্রেণীর ব্যক্তি তৈরি করে, যারা কথা-বার্তা ও নামে-ধামে তো মুসলমান ঠিকই, কিন্তু মন-মস্তিস্কে পুরোপুরি তদের প্রভুর হয়ে যায়।

যাহোক, মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এই প্রজন্মকে ইংরেজের গোলাম বানানোর পর ইহুদীদের এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এরপর এই সেকুলার জীবনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এদের থেকেই ব্যুরোক্রেসি (Bureaucrcy) বা আমলা বানানো হয়। আসল বিষয় হল শক্তির মাধ্যমে এই ইবলিসি নিযামকে মুসলিম কান্ট্রিগুলোতে বাস্তবায়ন করা এবং চালু রাখাই তাদের মূল টার্গেট। আর এর জন্য সেকুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শিক্ষাসমাপকারীদের নিয়ে পুলিশ ও সেনাবহিনী গঠন করা হয়। যাদের থেকে এ বিষয়ের শপথ নেয়া হয়েছে যে, তারা প্রত্যেকেই নিজ দেশের প্রচলিত জীবনব্যবস্থার (সেকুলারেজম বা গণতন্ত্র) আনুগত্য করবে এবং এর রক্ষক হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইংরেজভূষণ এই শ্রেণীর ভাষা, নাম এবং বংশ স্থানীয় জনবসতির মতই ছিল। সময়ের সাথে সাথে সাধারণ মুসলমান তাদেরকে নিজেদেরই মনে করতে থাকে। বিশেষত মুসলিম দেশগুলো হতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিদায় হওয়ার পর এই অনুভূতি ও সঙ্কোচটুকুও শেষ হয়ে যায়, যা তাদের সম্পর্কে দখলদার শক্তির উপস্থিতিতে ছিল।

ইংরেজ এবং ফ্রান্সিসিদের পিছনে মূল শক্তি ছিল যারা এই সেকুলার পদ্ধতি বানিয়েছিল। এ কারণে মুসলিম দেশগুলো থেকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স চলে যাওয়ার পরও সেকুলার ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ এবং তা পরিচালনার জন্য ব্যুরোক্রেসি, পুলিশ এবং সেনাবাহিনী প্রস্তুত ছিল। পূর্বে ইংরেজ ও ফ্রান্সিসি সেনাবাহিনী যেমন এর রক্ষণাবেক্ষণ করত, এখন একই কাজ এই পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হয়। যাদের সদস্য ছিল স্থানীয়। এ কারণে মুসলিম দেশগুলো স্বাধীন হওয়ার পরও মারাকিশ থেকে ফিলিপাইন– ইসলাম কোথাও স্বাধীন হতে পারেনি। খেলাফতের পুনর্জীবনের জন্য হককানী ওলামায়ে কেরাম চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সব চেষ্টা এই পুলিশ ও সেনাবাহিনী ব্যর্থ করে দিয়েছে। কোথাও শক্তির জোরে, কোথাও বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে। কোথাও রাজতন্ত্রের মাধ্যমে, কোথাও বা গণতন্ত্রের কপটতার মাধ্যমে।

মারাকিশ থেকে ফিলিপাইন পর্যন্তের দীনদার শ্রেণী হয়ত এই বাস্তবতা আজ পর্যন্ত বোঝেইনি, কিংবা বুঝতেই চায় না যে, মুসলিম দেশগুলোর সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনী আমাদের নয়। এরা হল এই সেকুলার ব্যবস্থার রক্ষক। ইংরেজরা যার সূচনা করেছিল, এরা তারই ধারাবহিকতা।

এ কারণেই হয়ত এসব দেশের দীনদার শ্রেণী কঠিনভাবে পেরেশান হয়ে পড়েন, যখন তারা দেখতে পান যে, এই পুলিশ ও সেনাবাহিনী নামাযীদের উপর গুলি চালাচ্ছে। মসজিদগুলো তছনছ করছে, শহীদ করছে। হক কথা বলার কারণে এবং লেখার কারণে ওলামায়ে কেরামকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হচ্ছে। কুরআন পড়ুয়া নিঃস্পাপ নিরাপরাধ মেয়েদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে এবং কালেমা পড়া ও কুরআনকে আল্লাহর কিতাব স্বীকার করা সত্ত্বেও এই কুরআনের আইন বাস্তবায়ন হতে দিচ্ছে না। আর দিবেই বা কেন? এরা তো শপথই করেছে, যেকোনো ভাবে হোক তারা এই ইবলিসি নিজামের হেফাজত করবে। এর স্থলে অন্য কোনো নিজাম ও ব্যবস্থাই (হোক তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত জীবনব্যবস্থা) বাস্তবায়িত হতে দিবে না।

মুসলিম দেশগুলোর জনসাধারণও হয়ত এই পার্থক্য বুঝতে পারেনি যে, দেশ রক্ষা আর ইসলাম রক্ষার পার্থক্য কি? অনেকেই মনে করে, এ দুটো একই জিনিস। দেশ থকলেই তো ইসলাম থাকবে। দেশ না থাকলে ইসলাম থাকে কি করে?

এই ধারণাটাই একটা প্রবঞ্চনা। যা দেশপ্রতিমার ইবাদতের দিকে আহ্বানকারীরা এই উম্মতকে দিয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর সেনাবাহিনী ও পুলিশ না দেশের রক্ষক না ইসলামের রক্ষক। এরা কেবল এই আন্তর্জাতিক ইবলিসি নিজাম ও বিশ্ব তাগুতি ব্যবস্থার রক্ষক, ইংরেজরা যার জন্য এদেরকে বানিয়েছে। বিষয়টি বোঝার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি, এতে বিষয়টি একদম স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

পাকিস্তানে পারভেজ মোশাররফের শাসনকালে ভারত পাকিস্তানী নদীর উপর ড্যাম নির্মাণ করতে থাকে। ব্যাপকহারে যুদ্ধসরাঞ্জাম বৃদ্ধি করতে থাকে। অথচ যে কোনো দেশের নদী বন্ধ হওয়া সেই দেশের জন্য মৃত্যুতুল্য। কিন্তু এখানে ভারতের হাত থেকে নিজেদের পানি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করার পরিবর্তে তারা এ কাজে তাদেরকে সহযোগিতা করে যেতে থাকে। আর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাদের সমস্ত লয়লশকর পূর্ব সীমান্ত হতে সরিয়ে সীমান্ত প্রদেশ ও উপজাতীয় অঞ্চলের সে সব মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগিয়ে দেয়, যারা দেশে প্রচলিত অনৈসলামিক ব্যবস্থার স্থলে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার দাবি করছিল।

এখন আপনারা ভাবুন, একদিকে দেশকে (পাকিস্তান) ভারতের হাত থেকে রক্ষা করার বিষয় সম্মুখে, অন্যদিকে সেনাবাহিনী উপলব্ধি করছিল যে, দেশে প্রচলিত ইবলিসি ব্যবস্থা ইসলামপ্রিয়দের দ্বারা হুমকির সম্মুখীন।

লক্ষ্য করে দেখুন, সেনাবাহিনী কোন হুমকিকে নিয়ন্ত্রণ করাকে প্রাধান্য দিয়েছে? ভারতের ড্যাম নির্মাণে দেশের যেই ক্ষতি হচ্ছিল, সেদিকে কারও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। বরং সব শক্তি এই ইবলিসি ইংরেজি ব্যবস্থা রক্ষার জন্য ব্যয় করেছে। পারভেজ মোশাররফের পরও একই সুরতহাল জারি থাকে। অন্যদিকে ভারতের জঙ্গি উন্মাদনা চরম পর্যায়ে। এরপরও তারা ভারতের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে গিয়ে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

চিন্তা করুন, পাকিস্তানে বিদ্যমান শক্তি, যা সব সময় পাকিস্তানকে ভাঙ্গতে, পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করতে, অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন পূরণ করতে এবং সর্বস্তরে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করতে তৎপর। শুধু পাকিস্তানেই নয় বরং গোটা বিশ্বে পাকিস্তান এবং পাকিস্তানিদেরকে গালি দিচ্ছে। এদেরকে তো ক্ষমতা এবং বড় বড় পদ দেয়া হয়েছে। অথচ সীমান্ত ও উপজাতীয় অঞ্চলের লোকেরা, যারা সব সময় ভারতের বিপক্ষে নিজেদের যুবকদের রক্ত দিয়েছে, যারা কখনো পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার কথা বলেনি, না তাকে কখনো গালি দিয়েছে। এই অঞ্চলে ড্রোন হামলা, সেনা অপারেশন এবং জেল ও নির্যাতনের বিভিষিকা নেমে এসেছে।

একই চিত্র আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও। ক্ষমতাসীন শক্তিগুলো তো ব্রিটেন ও আমেরিকার দাসত্ব বরণ করেছে, কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাসের গোলামী কবুল করেনি। দেশকে টুকরা টুকরা করার দায়িত্ব তো গ্রহণ করেছে, কিন্তু দেশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজাম ও জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দেশকে রক্ষা করা মেনে নেয়নি। এর থেকেও অনুমান করা যায় যে, মুসলিম দেশগুলো ক্ষমতাসীনরা কার রক্ষক? দেশ ও জাতির নাকি ধর্মহীন জীবনব্যবস্থার?

এখন আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, এমন শ্রেণীকে নিজেদের ইমাম ও নেতা বানানো, যারা আমাদেরই নয়, চরম জুলুম ও অবিচার নয় কি? কুফরি করা যাদের জন্য বিনোদনের বিষয়, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল (আইন সম্মত) এবং সুদি ব্যবস্থা রক্ষা করা ফরয, মদ যাদের কাঙ্খিত পানীয়, মুসলমানদেরকে হত্যা করা যাদের গর্বের বিষয়, বোন ও মেয়েদেরকে উন্নতির সোপান বানানো যাদের ফ্যাশন, এরাই কি ইমামুল মুসলিমীন? এরাই কি খলিফাতুল মুসলিমীন?

আল্লাহর হে বান্দাগণ! একটু ভেবে দেখুন তো, এরাই কি সেই ইমাম, যারা তোমাদের বোন ও মেয়েদের বিয়েতে অলি (অভিভাবক) হবে, তোমাদের বড়দের

জানাযা পড়াবে? হে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ! আপনারা কি তাদেরকে এই উপযুক্ত মনে করেন যে, আপনারা তাদের ইমামতিতে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করবেন? নিঃসন্দেহে করবেন না। তো আপনারা যখন তাদেরকে 'ইমামাতে সুগরা'র (নামাযের ইমামতি) উপযুক্ত মনে করেন না, তাহলে 'ইমামতের কুবরা'র (খেলাফত ও হুকুমাত) হকদার কেমনে প্রমাণ করেন?

সুতরাং এ বিষয়টি খুব ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার যে, খুরুজ আনিল ইমাম- (ইমাম এর বিরুদ্ধাচারণ) এর আলোচনা সে সব আমির ও শাসকদের সাথে সম্পৃক্ত, যেখানে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সরকার ব্যবস্থা কুরআনের। আদালত কুরআনের আইনের পরিপন্থি ফয়সালা দেয়াকে হারাম মনে করে। খলিফা নিজে হুদুদ এবং কিসাস বাস্তবায়ন ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ পরিচালনা করছেন। এমতাবস্থায় যদি খলিফার ভেতর কোনো খারাবি প্রকাশ পায়, তখন শরীয়ত এটা দেখে যে, খলিফার ভেতর এমন কোনো কিছু পাওয়া যাচ্ছে কি না যার কারণে তার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচারণ জায়েয হয়?

ইমাম (শাসক)—এর বিরুদ্ধাচরণ আলোচনার সম্পর্ক গণতন্ত্রের রক্ষীদের ক্ষেত্রে হতেই পারে না। কারণ এমন শাসক, যারা কেবল গণতন্ত্রের প্রতিমার রক্ষকই নয় বরং নিজের সেনাবাহিনী ও পুলিশি শক্তির মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামদের দ্বারা জোরপূর্বক এই প্রতিমার পূজা করানো হয়। সেই শাসক ইমামুল মুসলিমীন কি করে হতে পারে? এমন শাসককে ইমামুল মুসলিমীন প্রমাণিত করা, ঈমানকে হুমকির ভেতর ফেলা। আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তো তার যুগে (তখনো খেলাফতে উসমানিয়া বিদ্যমান ছিল) বলতেন যে—

ومن قال لسلطان زماننا عادل فقد كفر حيث يكون اعتقد الظلم عدلا

> যে ব্যক্তি আমাদের যুগের শাসকদেরকে ন্যায়পরায়ন শাসক বলেছে, সে কুফরি করেছে। কারণ সে জুলুমকে আদল বা ন্যায়পরয়নতা বলেছে।[২৪]

[২৪] *সৌজন্যে : তুহফাতুল মুতাখাসসিস, মুফতী জিয়াউর রহমান জাকির। প্রকাশনী : মাকতাবায়ে ওমর ফারুক করাচি। হুবাহু এই কথা ইমাম আবু মুনসুর মাতুরিদী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও তার জামানায় বলতেন। ফতওয়ায়ে আলমগীরী ও আহনাফের অন্যান্য কিতাবে উল্লেখিত রয়েছে।*

তিনি যদি আজকের যুগের গণতান্ত্রিক সেকুলার ও ধর্মহীন শাসকদেরকে পেতেন এবং তাদেরকে সম্মান ও ভজনাকারীদেরকে দেখতেন, না জানি তাদের সম্পর্কে তিনি কী মন্তব্যই করতেন?

আজকের হক্কানী আলেমদের সম্মুখে কি এই শাসক শ্রেণীর জীবন বিদ্যমান নেই? তাদের জেনারেল, মন্ত্রী, সুদখোর এবং বংশানুক্রমে শ্বেতপ্রভুদের দাসত্বকারীদের সম্পর্কে কি তারা অবগত নন? হক্কানী আলেমদের প্রভুর কসম! কোনো সুইপারও যদি তাদের জীবন সম্পর্কে জানে, মৃত্যুর আগ পর্যন্তও তাদেরকে নিজের ইমাম হিসেবে মেনে নিবে না।

সেই সাথে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হোক যে, মুজাহিদদের জিহাদের ঘোষণা বিশেষ কোনো শাসক কিংবা শাসকদলের বিরুদ্ধে নয়। বরং জিহাদের এই ঘোষণা মুসলিম দেশগুলোতে চেপে থাকা কুফরি নিযাম ও ধর্মহীন জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তারা এই কুফরি নিযামর বিরুদ্ধে ময়দানে নেমেছেন। বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণী তাদের টার্গেট নয়। সুতরাং যে-ই এই নিযাম হেফাজতের জন্য তাদের মোকাবেলায় আসবে, তাকেই এই নিযামের মোহাফেজ মনে করা হবে।

মোটকথা, মনে রাখতে হবে গণতন্ত্র তার মূল হিসেবে নিরেট কুফরি। সুতরাং এই নিযাম ও জীবনব্যবস্থা পরিচালনাকারী কখনোই মুসলমানদের ইমাম হতে পারে না। চাই তার বাহ্যিক ভূষণ-আকৃতি যেমনই হোক না কেন? যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়তকে সংসাদে অনুমোদন করা ছাড়া আইনের অংশ বানাতে পারে না, সে কি করে মুসলমানদের ইমাম হতে পারে? যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তকে এ বিষয়ের মুখাপেক্ষী বানিয়েছে যে, আগে সংসদে অনুমোদন হোক, এরপর সেটা দেশে (নাউযুবিল্লাহ) বাস্তবায়নের উপযুক্ত হবে, সে কোনোভাবেই মুসলমানদের ইমাম ও শাসক হতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া অন্য কোনো আইনে ফয়সালা করা

আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া অন্য কোনো আইনে ফয়সালা করা

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করবে। কিন্তু আদালতে যদি কুরআন প্রতিষ্ঠিত না হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য যদি আন্তর্জাতিক অর্থপ্রতিষ্ঠানগুলোর তৈরিকৃত আইনের অধীনে করা হয়, আর সরকার ব্যবস্থা যদি হয় গণতান্ত্রিক তাহলে আল্লাহর ইবাদত কিভাবে করা সম্ভব?

অথচ আল্লাহ্ তায়ালার লক্ষ্য তো এই, জমিনের বুক হতে সমস্ত বাতিল ধর্ম ও আদর্শ নিশ্চিহ্ন করে আল্লাহর প্রেরিত দীন কায়েম করা। শুধু মুসলমানরাই নয় বরং কাফেররাও সেই দীনের দেয়া ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করবে। যাতে কোনো সামর্থ্যবান ব্যক্তি কোনো দুর্বল ব্যক্তির উপর জুলুম করতে না পারে। মজলুমরা যেন ন্যায়বিচার লাভ করে। গরীবরা যেনো সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার পায়।

আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ শুধু মুসলমানদের সমস্যার ক্ষেত্রেই নয় বরং কাফেরদের সমস্যা ও মামলাতেও (শুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় ছাড়া) এই ইলাহী সংবিধান ও আইনের আলোকে সমাধান করা হবে। কিন্তু চিন্তার নীচুতা ও আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশের প্রতি উদাসীনতার অনুমান করুন যে, কাফেরদের মাঝে ফয়সালা করা তো দূরের কথা, মুসলমানদের আদালতে মুসলমানদের ফয়সালাই করা হচ্ছে কাফেরদের আইনে। এ অনুযায়ীই জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে, ফয়সালা প্রয়োগের জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছে। যারা এই কুফরিকে জোরপূর্বক বাস্তবায়ন করে। এর রিটকে সুনিশ্চত

করে। অথচ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনই একমাত্র আইন, যে অনুযায়ী ফয়সালা করা উচিত।

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

> সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। *[সূরা মায়েদা : ৪৮]*

এই অধ্যায়ে আমরা গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার একটি মৌলিক স্তম্ভ অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আদালত ও বিচার ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ করব এবং এ উদ্দেশ্যে এই বুনিয়াদি প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করব যে, এসব আদালত ও বিচার ব্যবস্থায় আল্লাহর শরীয়তের স্থলে মানুষের প্রবর্তিত আইন অনুযায়ী ফয়সালা ও বিচার করার যেই ধারা জারি রয়েছে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তার হুকুম কি?

আল্লাহর শরীয়ত ব্যাতীত অন্য কোনো আইনে ফয়সালা করা

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

> আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত (কুরআন) দ্বারা ফয়সালা করে না, তারাই কাফের। *[সূরা মায়েদা : ৪৪]*

আল্লাহ তায়ালা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে তাঁর দীন হেফাজতের জন্য নির্বাচন করেছেন। তাঁর দীনকে কম-বেশি করা থেকে নিরাপদ রাখার তাওফীক দিয়েছেন। কুরআন ও হাদীসকে তার সঠিক অর্থ-মর্মের সাথে বর্ণনা করা এবং তা সালফে সালেহীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুযায়ী বোঝার তাওফীক দান করেছেন। যাতে এরা দীনে মুবিন তথা সুস্পষ্ট দীনকে সব ধরনের মিশ্রণ থেকে পবিত্র করেন। কঠোরতা ও সীমলঙ্ঘনের কন্টকাকীর্ণ পথ থেকে বাঁচিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ রাজপথে চালান।

যার কারণে এই উম্মত প্রত্যেক যুগেই ফিতনার ঘোর অমানিশাতেও সফলভাবে যাত্রা করেছে এবং সুম্মুখে অগ্রসর হয়েছে। শত্রুদের পক্ষ হতে শত প্রোপাগাণ্ডার মাঝেও এরা হকের ভারসাম্যপূর্ণ পথ ছাড়েনি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলামায়ে কেরাম এই কাফেলাকে ডাকাত বুদ্ধিজীবী, ধর্মব্যবসায়ী দরবারি আলেম এবং ঈমানের ধূর্ত দুশমনদের কবল থেকে বাঁচিয়ে গন্তব্যপানে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ

> আমার উম্মতের একটি দল হাকের জন্য কিতাল করতে থাকবে। হকের উপর বিজয়ী থাকবে। যারা এই দলকে ত্যাগ করল, তারা এই দলকে ক্ষতি করতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহর ফয়সালা এসে যাবে।[২৫]

তাই অন্যান্য বিষয়ের মত এই মাসআলাতেও (আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করা) প্রত্যেক যুগের হককানী ওলামায়ে কেরাম নিজ নিজ যুগের প্রান্তিকতা ও কম-বেশি চিহ্নিত করে বর্ণনা করেছেন এবং মাসআলাকে শরীয়তের শিক্ষার আলোকে বুঝিয়েছেন।

এজন্য এ যুগেও আহলে হক ওলামায়ে কেরামের জন্য জরুরি, সর্বপ্রথম নিজেদের সম্মুখে বিদ্যমান সমস্যার রূপকে গভীরভাবে বোঝা। শুধু এর জাহেরী অবস্থা ও প্রচলিত প্রচ্ছন্ন পরিভাষার (মুবহাম ইসতিলাহাত) উপরই শরয়ী হুকুম বর্ণনা না করা। যাতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে উম্মতকে রাহনুমায়ী করা যায়। কোনো মাসআলাতে নিজের পক্ষ হতে কঠোরতাও আরোপ না করা। শরীয়ত অবকাশ দিয়ে থাকলে নিজের পক্ষ হতে এসব বিষয়ে কঠোরতা আরোপ ও চাপাচাপি না করা। আবার সহজ করতে গিয়ে দীনের সীমানাও লঙ্ঘন না করা, যা কুফর ও ইসলামের মাঝে বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা দান করে।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, বর্তমান যুগে আলোচ্য বিষয়ে মানুষ অত্যন্ত উদাসীন ও চাটুকারিতায় লিপ্ত। এখন তো অবস্থা এই যে, সাধারণ মানুষ তো পরের কথা, ওলমায়ে কেরামের পরিবারেও এ বিষয়ের অনুভূতি নেই যে, আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া অন্য কোনো আইনের অধীনে বেঁচে থাকা, গায়রুল্লাহর আইনকে শাসক মানা, তার উপর নিরব থাকা, খুশি থাকা– এটা যেনতেন অপরাধ নয়, সাধারণ কোনো গুনাহ নয়। আল্লাহ তায়ালা এটাকে বড় কঠিন শব্দে বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার কঠিন ধমকিকে নিজের পক্ষ হতে হাল্কা করে পেশ করা, কোনো সাহাবীর উক্তিকে অজাগায় উপস্থাপন করা, এটা কী পরিমাণ অন্যায় কাজ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আসমান ও জমিনের শাহানশাহ মানুষদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করছে যে, যে ব্যক্তি আমার আইন ব্যাতিত অন্য আইনে ফয়সালা করল, সে কাফের। কিন্তু এমন মানুষও রয়েছে, যে আল্লাহর এই ধমকির সামনে

---

[২৫] الصحيح لمسلم : الجزء ١٠، كتاب الامارة، باب قوله صلي الله عليه وسلم لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم

দাঁড়িয়ে যায়। নিজেও কুফরি করে এবং অন্যদেরকেও সাহস যোগায় যে, না এতে কোনো সমস্যা নেই। তুমি যত বড় অপরাধ মনে করছ, বাস্তবে তা নয়। নাউযুবিল্লাহ।

এমনিভাবে এ বিষয়টিও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাসলাকের খেলাফ যে, কুরআন ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দেখে এমন ব্যাখ্যা করা যা আসলাফে উম্মত থেকে প্রমাণিত নেই।

গামনে হাজির হওয়া কোনো সমস্যায় আমরা তখনই ভুল করে বসি, যখন আমরা সমস্যার গভীরে না গিয়ে এবং সমস্যা সম্পর্কে সালফে সালেহীন কর্তৃক বর্ণিত বিস্তারিত বিবরণ আলোচনা না করে শুধু বাহ্যিক অবস্থার উপর ফয়সালা দেই। এমনিভাবে আরেকটি ভুল এই হয় যে, আসলাফে উম্মতের বর্ণনাকৃত বিস্তারিত বিবরণকে আমরা এমন স্থানে প্রয়োগ করি, যেখানে সেটা কোনোভাই উপযোগী হয় না।

আলোচ্য বিষয়ও (কুরআন ব্যতীত অন্য আইনে ফয়সালা করা) এ ধরনেরই একটি সমস্যা যাতে সমস্যার প্রকৃতির (সুরতে মাসআলা) গভীরে যাওয়া ছাড়াই প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে শরয়ী হুকুম বর্ণনা করা হয়। অধম সমস্যার প্রকৃতিকে (সুরতে মাসআলা) স্পষ্টরূপে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছে। যাতে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম শরীয়তের আলোকে আমাদের রাহনুমায়ী করেন।

সতর্কতা জ্ঞাপন

কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো আইনে ফয়সালাকারী ব্যক্তি কাফের কি না? এই আলোচনায় একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, পুরো আলোচনাটি একটি মাত্র শরয়ী হুকুমের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ একজন জজ বা বিচারক কুরআনের সমস্ত ফয়সালা প্রদান করে। কিন্তু অকাট্যভাবে প্রমাণিত একটা মাত্র শরয়ী হুকুম কুরআন ব্যাতীত অন্য আইনে ফয়সালা দেয়। (যেমন যেনার শরয়ী শাস্তির পরিবর্তে ইংরেজি আইনে শাস্তির ফয়সালা করে।) তবে সে ইসলামের পুরোপুরি গণ্ডি থেকে বের হয়ে গিয়েছে কি না?

আয়াতের শানে নুযুল ও প্রেক্ষাপট

প্রথমে আয়াতটির শানে নুযুল ও প্রেক্ষাপট বুঝে নিন। এরপর আয়াতের তাফসীরে মশহুর মুফাসসিরীনদের (মতাকদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন) কথা ও মত বর্ণনা করা হবে। আমরা যদি এই আলোচনাটি ভালোভাবে বুঝি, তা হলে ইনশাআল্লাহ,

ইসলাম এবং কুফর– আধুনিক দাজ্জালি মস্তিস্ক যাকে একাকার করার চেষ্টা করেছে– স্পষ্ট হয়ে যাবে।

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত (কুরআন) দ্বারা ফয়সালা করে না, তারাই কাফের। *[সূরা মায়েদা : ৪৪]*

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মারেফুল কুরআনে ইমাম বাগবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির উদ্বৃতিতে আয়াতটির শানে নুযুল এভাবে বর্ণনা করেছেন–

এটি একটি যেনার ঘটনা। খায়বারের ইহুদীদের মধ্যে এই ঘটনাটি ঘটে। তাওরাতের শাস্তি অনুযায়ী যেনাকারী নারী-পুরুষ উভয়কে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরা ছিল বড় একটি খান্দানের মানুষ। ইহুদীরা তাদের পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী এদের শাস্তি হ্রস করতে চাচ্ছিল। আর তারা এ কথা জানত যে, ইসলাম ধর্মে অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে। তাই তারা এ কথা মনে করছিল যে, ইসলামে হয়ত এ শাস্তির ক্ষেত্রেও ছাড় আছে। খায়বারের লোকেরা তাদের মিত্র বনি কুরায়জার লোকদেরকে এই পয়গাম পাঠায় যে, বিষয়টি মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বারা ফয়সালা কর।

যাহোক, কাআব বিন আশরাফ সহ একটি প্রতিনিধি তাদেরকে নিয়ে হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয় এবং জিজ্ঞাসা করে, বিবাহিত নারী পুরুষ ব্যাভিচারে লিপ্ত হলে তার শাস্তি কি?

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আমার ফয়সালা মানবে?

তারা উত্তর দেয়, হ্যাঁ, আমরা আপনার ফয়সালা মানব।

হযরত জিবরাইল আমীন তখন আল্লাহর এই হুকুম নিয়ে নাযিল হন যে, এর শাস্তি হল প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা। তারা যখন এই ফয়সালা শোনে, হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং ফয়সালা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। হযরত জিবরাইল আমীন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ দিলেন, আপনি এদেরকে বলুন, আমার ফয়সালা মানা নামানার ক্ষেত্রে ইবনে সুরিয়াকে বিচারক বানাও। এরপর তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইবনে সুরিয়ার অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য বলে দেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই প্রতিনিধদলকে বললেন, তোমরা কি ফিদাকে বসবাসকারী দৃষ্টিপ্রতিবন্ধি ইবনে সুরিয়াকে চেনো? সবাই স্বীকার করল, হ্যাঁ চিনি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে তোমরা কেমন মনে কর? তারা বলল, পৃথিবীর বুকে

ইহুদীদের মধ্যে তার চেয়ে বড় কোনো আলেম আর একজনও নেই। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ডেকে আনো। এরপর তাকে ডেকে আনা হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ সম্পর্কে তাওরাতের বিধান কি?

ইবনে সুরিয়া বলল, সেই সত্তার কসম, যার কসম আপনি আমাকে দিয়েছেন, আপনি যদি কসম নাও দিতেন, আর আমার যদি এই ভয় না থাকত যে, ভুল বলার ক্ষেত্রে তাওরাত আমাকে জ্বালিয়ে ফেলবে, তবে আমি এই সত্য প্রকাশ করতাম না। সত্য হল, ইসলামের মত তাওরাতেও এই একই নির্দেশ রয়েছে। তাদের উভয়কে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করতে হবে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তবে এমন কী আপদ এসেছে যে, তোমরা তাওরাতের নির্দেশের বিরোধিতা করছ?

ইবনে সুরিয়া তখন বলে, আসল বিষয় হল, আমাদের ধর্মেও যেনার শরয়ী শাস্তি এটাই, প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা। কিন্তু একবার আমাদের এক শাহজাদা এই অপরাধ করে বসে। তার পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে আমরা তাকে ছেড়ে দেই। তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা হয় না। কিছুদিন পর একই অপরাধ একজন সাধারণ মানুষও করে। দায়িত্বশীলরা তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করতে চায়। অপরাধীর পরিবার তখন এর বিরোধিতা করে। তারা বলে, একে যদি শরয়ী শাস্তি দিতে চাও, তবে আগে শাহজাদাকে দাও। না হলে আমরা একেও এই শাস্তি দিতে দেব না।

এক সময় বিষয়টি অনেক বড় সমস্যায় রূপ নেয়। তখন সবাই মিলে এই সমঝোতা করা হয় যে, সবার জন্য একই শাস্তি নির্ধারণ করা হোক এবং তাওরাতের বিধান বাদ লঘু শাস্তির বিধান জারি করা হোক। এরপর থেকে তাওরাতের বিধানের পরিবর্তে সবার ক্ষেত্রে এই শাস্তিই প্রচলিত রয়েছে।'

এই আয়াতের শানে নুযুলে ইমাম বুখারী রহামতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহিও এই ঘটনাই উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য তাফসীরকারকগণ বর্ণনা করেছেন যে, তাওরাতে উল্লেখিত এই শাস্তি ছিল, মুখে কালি মাখিয়ে উভয়কে গাধার উপর উল্টা করে বসিয়ে শহরের অলিতে গলিতে ঘুরানো এবং বেত্রাঘাত করা।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১. তাওরাতের সাদাকাত ও সততার উপর ওই ইহুদীর ঈমান দেখুন। সে ভুল কথা বলার ক্ষেত্রে ভয় পাচ্ছে যে, তাওরাত তাকে জ্বালিয়ে ফেলবে। সেই সাথে আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের উপর ইয়াকিনও লক্ষ্য করুন যে, কসম

দেয়ার কারণে এমন সত্য কথা বলতে সে উদ্বুদ্ধ হয়েছে যার দ্বারা তার গোটা জাতি ও ধর্মের বেইজ্জতি হচ্ছিল।

২. সে তাওরাতের প্রস্তারাঘাতের হুকুম এমনভাবে অস্বীকার করেনি যে, সে তা منزل من الله (আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত) হওয়ার মুনকির (অস্বীকারকারী) হয়ে গিয়েছিল। বরং সে তাওরাতের হুকুমের মোকাবেলায় নিজেদের পক্ষ হতে আরেকটি আইন মঞ্জুর করে নিয়েছিল এবং সেটা বাস্তবায়ন করত।

৩. ইহুদী আলেমরা তাওরাতের রজমের হুকুম তুলে দিয়ে নিজেদের সংযোজিত আইন গেজট আকারে বা সাংবিধানিকরূপে প্রকাশ করেনি। তাওরাতের আইনের বিপরীতে কোনো সংবিধান লিখিতভাবেও প্রণয়ন করেনি। বরং তাওরাতে তখনো আল্লাহর নাযিলকৃত 'রজম আইন'ই বিদ্যমান ছিল। এই সংযোজন ছিল শুধু মৌখিক।

পক্ষান্তরে বর্তমানে আল্লাহর কুরআনের বিপরীতে লিখিতরূপে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। যা নিয়মতান্ত্রিকভবে পড়ানো হয় এবং কুরআনের বিপরীতে তা দেশে জোরপূর্বক বাস্তবায়ন করা হয়। এর ভেতর অসংখ্য শরীয়ত পরিপন্থি সংযোজন রয়েছে। এরপরও এটাকে ইসলামী বলা হয়। যেন কুরআন ইসলামী নয়, ইসলামী বরং যে আইন পাকিস্তানে রয়েছে, সেটা। অথবা চোরের হাত কাটা ও বিবাহিত নারী-পুরুষকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করার যে আইন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এনেছেন, সেটা ইসলামী নয়। ইসলামী বরং যা পাকিস্তানের আইনে রয়েছে।

৪. এই ঘটনা থেকে জানা গেল, আল্লাহর নাযিলকৃত আইনে সংযোজনকারীদের বিরুদ্ধে কুফরির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যারা এমন আইন সংযোজন করে, তারা কাফের।

এখন আপনিই একটু ভেবে দেখুন, বর্তমান গনতন্ত্রের ধর্মহীন ধ্বজাধারীরা এবং তাদের সশস্ত্র রক্ষীরাও তো এমনই করছে। তারা বরং ইহুদীদের থেকেও এক ধাপ এগিয়ে। তারা ইহুদীদের থেকেও অনেক বেশি ঘৃণ্য কাজ করছে। আপনারা বর্তমানের গণতন্ত্রের সাথে শরিক ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোকে দেখুন, তারা কেমন ঔদ্ধত্যের সাথে কুরআনের বিধি-বিধানকে হিংস্রতা ও পাশবিকতা বলছে। কুরআনের আইনকে পশ্চাদপদ ও অন্ধকার যুগের আইন বলছে। ক্ষমতাবলে তা বাস্তবায়ন করতে বাধা দিচ্ছে। তাদের মধ্যে না ভদ্রতা রয়েছে না আল্লাহর ভয়ের কোনো পরোয়া রয়েছে।

ومن لم يحكم بما أنزل الله সম্পর্কে মুফাস্‌সিরীনের মতামত

আসুন, আয়াতটি উম্মতের সেসব মুফাসসিরদের তাফসীর দ্বারা বুঝি, যেই তাফসীরের উপর সবাই একমত।

ইমামুল মুফাসসিরীন ইবনে জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তাফসীরে বলেন–

يقول تعالي ذكره : ومن كتم حكم الله الذي أنزله في كتابه وجعله حكما بين عباده فأخفاه وحكم بغيره كحكم اليهود....

[فأولئك هم الكافرون] يقول : هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل الله في كتابه ولكن بدلوا وغيروا حكمه وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه

[هم الكافرون] يقول : هم الذين ستروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه وغطوه عن الناس وأظهروا لهم غيره وقضوا به لسحت أخذوه منهم عليه

আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সেই হুকুমকে গোপন করল, যা তিনি তার কিতাবে নাযিল করেছেন এবং যেই হুকুমকে তার বান্দাদের জন্য আইন বানিয়েছেন। সুতরাং সে এই আইনকে গোপন করল এবং ইহুদীদের মত এই আইন ব্যতীত অন্য আইনে ফয়সালা করল।

তারা কাফের- অর্থাৎ যারা আল্লাহর নাযিলকৃত (আইন) দ্বারা ফয়সালা করে না, বরং আল্লাহর শরীয়তকে উল্টিয়ে দেয় এবং সেই হককে গোপন করে যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে নাজিল করেছেন।

এরা কাফের- যারা হককে গোপন করেছে, যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা তাদের জন্য আবশ্যক ছিল। এবং অন্যদের দৃষ্টি হতে এই হককে আড়ালে রেখেছে। আর মানুষের সম্মুখে এই হক ব্যাতীত অন্যান্য বিষয় প্রকাশ করেছে এবং সেই অনুযায়ী ফয়সালা করেছে, ঘুষের কারণে। যা তারা নিয়েছিল।[২৬]

---

[٢٦] جامع البيان في تأويل القران : محمد بن جرير يزيد بن غالب الاملي. ابو جعفر الطبري (المتوفى : ٣١٠هـ)

ফায়দা : ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তাফসীরে যে বিবরণ উল্লেখ করেছেন, আজকের বিচার ব্যবস্থায় তা পুরোপুরিই পাওয়া যায়। আল্লাহর আইন গোপন করা। অর্থাৎ চলমান মামলার ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন কি, মামলার সময় তা উল্লেখই না করা। বরং নিজেদের তৈরিকৃত আইনকে ইসলামী আইন বলা এবং এ কথা বলা যে, আমাদের আদালত ও বিচার ব্যবস্থা ইসলামী আইনের আলোকেই ফয়সালা করে। আল্লাহর আইনে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা (যেমন বিবাহিত নারী-পুরুষকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করার পরিবর্তে কয়েক বছরের জেলের শাস্তি ইত্যাদি)... এ সবই এমন কাজ যার কারণে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে ইহুদীদেরকে কাফের ঘোষণা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা এই আয়াতের তাফসীরে বলেন–

من جحد ما أُنزل الله فقد كفر. ومن أُقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق

কোনো ব্যক্তি আল্লাহর 'হুদুদ' (প্রস্তারাঘাত করা, বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি) হতে একটা আইনও যদি অস্বীকার করে, সে কাফের। আর যে ব্যক্তি এগুলো স্বীকার করে ঠিক, কিন্তু এ অনুযায়ী ফয়সালা করে না, সে জালেম এবং ফাসেক।

হযরত ইকরামা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

معناه: ومن لم يحكم بما أُنزل الله جاحدا به فقد كفر. ومن أُقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق

এর অর্থ হল, যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন অস্বীকার করে এ অনুযায়ী ফয়সালা করে না, সে ব্যক্তি সত্যিই কাফের। আর যে এই আইন স্বীকার করে কিন্তু এ অনুযায়ী ফয়সালা করে না, সে ব্যক্তি জালেম এবং ফাসেক।[২৭]

কুরআনের আইনের উপর ঈমান আনা
একটি সংশয় এবং তার ব্যাখ্যা

جاحدابه ومن لم يحكم بما أُنزل الله এর ব্যাপারে আসলাফগণ যে একথা বলেছেন (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন অস্বীকার করে, আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা

---

[٢٧] الكشف والبيان: الجزء ٥. أبو اسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي النيسابوري (المتوفي: ٤٣٧ هـ)

করে না, নিঃসন্দেহে সে কাফের।) এর দ্বারা মানুষের সম্ভবত এই সংশয় সৃষ্টি হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য সে এই আইনকে কুরআনের অংশ কিংবা আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত হওয়ার ইয়াকিন রাখে না। বিধায় কেউ যদি এর ঈমান রেখে কুরআনের আইন ব্যাতিত ফয়সালা করে, তো সেটা কুফরে আকবার নয় বরং কুফরে মাজাযী অথবা كفر دون كفر অর্থাৎ ছোট কুফরি।

ব্যাখ্যা

এমন বোঝা আসলাফের ভাষ্য বুঝার ক্ষেত্রে ত্রুটি । খারেজীরা যেভাবে এই আয়াত থেকে সরাসরি কুফরে আকবার উদ্দেশ্য নিয়েছে এবং এতেদালের পথ থেকে সরে গিয়েছে, তেমনিভাবে এই আয়াতে বর্ণিত কুফরিকে সরাসরি كفر دون كفر বা ছোট কুফরি সাব্যস্ত করাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ হতে সরে যাওয়া। মনে রাখবেন, সাইয়িদিনা হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা كفر دون كفر সরাসরি ব্যবহার করেননি। বরং সাহাবায়ে কেরামের মতামত খণ্ডন করতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে তাফসিলের সাথে আলোচনা করেছেন। পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের আসলাফ স্পষ্টভাবে এ কথা বলে দিয়েছেন যে, এই বিচারক এ বিষয়ের ইয়াকিন রাখে যে, চলমান মামলায় কুরআনের আইন দ্বারা ফয়সালা করা তার উপর ওয়াজিব। এর ব্যতিক্রম করলে সে গুনাহগার হবে এবং শাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হবে। কিন্তু সে কুরআনের আইন অনুযায়ী ফয়সালা করল না বরং শুধু এ কথা বিশ্বাস করল যে, এ আইনগুলো কুরআনের অংশ– এতটুকু মনে করা তার জন্য যথেষ্ট হবে না। ইহুদীরাও এই আয়াতকে, যা তাওরাতের অংশ ছিল, বিশ্বাস করত। কিন্তু ফয়সালার ব্যাপারে তারা এর স্থলে আরেক আইন বানিয়ে নিয়েছিল এবং সেটাকেই শরয়ী আইন প্রমাণিত করছিল। কুরআন তাদের এই আমলকে কুফরে আকবার ঘোষণা করেছে।

এ বিষয়টিও ভাবার দাবি রাখে যে, কোনো ব্যক্তি যদি কোরআনের কোনো আয়াতকে منزل من الله অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত বিশ্বাস না করে, সে কেবল এই চিন্তাধারার কারণেই তাৎক্ষণাত কাফের হয়ে যাবে। তার ব্যাপারে এই আলোচনা করাই অনর্থক যে, কুরআনের আইন ব্যাতীত ফয়সালা করার দ্বারা কাফের হয় কি না? সুতরাং এই আয়াত দ্বারা এই উদ্দেশ্য কখনোই হতে পারে না। উম্মতের ওলামায়ে কেরাম এর উদ্দেশ্য এটাই বর্ণনা করেছেন যে, কুরআনের আইন

অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব মনে করে এবং ইহা ব্যাতীত অন্য যে কোনো আইন দ্বারা ফয়সালা করাকে গুনাহ মনে করে।

এ বিষয়টি ইমাম বায়যাবী, ইমাম আবু বকর জাসসাস, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইয়িমা, ইমাম ইবনে কাইয়িম জাওযিয়া, ইমাম ইবনে আবিল ইজ হানাফী, হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহমিাহুমুল্লাহ) প্রমূখ ব্যক্তিত্বগণ আরও স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। আহলে ইলম হযরতদের ইমাম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির 'ইবারত' (ভাষ্য) গভীরভাবে লক্ষ্য করা উচিত। এমনকি অনেক তাফসীরকারকগণ ومن لم يحكم এর তাফসীরে সংক্ষিপ্তভাবে শুধু এতটুকু বলেছেন যে, তারা আল্লাহর নাযিলকৃত (আইনের) উপর ঈমান রাখে না। কিন্তু এর উদ্দেশ্য সেটাই যা উম্মতের অন্যান্য মুফাসসিরগণ করেছেন যে, এর দ্বারা ফয়সালা ওয়াজিব মনে করে। (দলিল ও প্রমাণাদি সামনে আসছে।)

قال ابن مسعود والسدي : من ارتشي في الحكم وحكم فيه بغير حكم الله فهو كافر

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং ইমাম সাদ্দি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি ফয়সালা করতে ঘুষ নিল এবং আল্লাহর আইন ব্যাতীত অন্য আইনে ফয়সালা করল, সেই বিচারক কাফের।[২৮]

ফায়দা

এই দুই হযরতের নিকট এমন ব্যক্তি পুরোপুরি কাফের।

قال ابن مسعود و الحسن : هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله
من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلاله فأما من
فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين...

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আয়াতটি মুসলমান, ইহুদী এবং অন্যান্য কাফেরদের বেলায়ও প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা না করবে অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা ফয়সালা না করবে এবং নিজের কাজকে সঠিক (আইনসম্মত) হওয়ার বিশ্বাস লালন করবে (সে ব্যক্তি স্পষ্ট কাফের)। তবে

---

[২৮] প্রাগুক্ত

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি এটাকে হারাম মনে করে করবে, সে ব্যক্তি ফাসেক মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ।[২৯]

আজকের প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে একটু ভাবুন এবং ফয়সালা করুন যে, বিচার বিভাগের অধিকাংশ লোক কি এ সব ফয়সালাকে গুনাহ মনে করে? তাদের নিকট এটা তো অনেক বড় কল্যাণের কাজ । অনেক বড় ভালো ও পবিত্র কাজ । বলুন, প্রচলিত বিচার বিভাগ কি কুরআন ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা ফয়সালা করাকে হালাল ও আইন সম্মত মনে করে না?

হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এই আয়াতটি কি ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে? তিনি বলেন–

> জ্বি হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা (এই উম্মত) ইহুদীদের পথে পায়ে পায়ে চলবে ।[৩০]

আল্লামা আলুসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রুহুল মাআনীতে ইমাম শাআবী রহমাতুল্লাহির এই রেওয়ায়েত নকল করেছেন–

> وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ .... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ....
>
> সূরা মায়েদার এই আয়াত তিনটির প্রথমটি এই উম্মতের ব্যাপারে, দ্বিতীয়টি ইহুদীদের ব্যাপারে আর তৃতীয়টি খ্রিস্টানদের ব্যাপারে ।

আল্লামা আলুসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

> এই ভিত্তিতে আবশ্যক, মুসলমানদের অবস্থা ইহুদী-নাসারাদের থেকেও করুণ হবে ।[৩১]

বর্তমানের কুফরি বিচার ব্যবস্থাকে ইসলামী প্রমাণকারীরা এবং কুফরি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ইসলামী সাব্যস্তকারীরা ইহুদী-নাসারাদের থেকেও এক ধাপ এগিয়ে নয় তো কি?

---

[২৯] الجامع لأحكام القران المروف تفسير القرطبي' الجزء٦' تفسير سورة المائدة: ٤٤. محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبدالله

[৩০] *প্রাগুক্ত*

[৩১] *তাফসীরে রুহুল মাআনী পারা : ৫, তাফসীরে সূরা মায়েদা : ৪৪*

তাফসীরে ইবনে জাযী'তেও (تفسير ابن جزي) ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহির এক কওল বর্ণনা করা হয়েছে যে–

এই আয়াতে কাফের হওয়ার বিষয়টি মুসলমানদের ব্যাপারে। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা ফয়সালা না করবে।)

বিখ্যাত হানাফী ফকীহ এবং মুফাসসির ইমাম নাসাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু : ৭১০ হিজরী) তাফসীরে নাসাফীতে বলেন–

اي مستهينا به

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়তকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এর আলোকে ফয়সালা করে না, সে কাফের।

বর্তমানের গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার মোকাবেলায় নিফাযে শরীয়ত তথা শরীয়তের আইন চালু করাকে কি অবেজ্ঞয় মনে করা হচ্ছে না? তবে তোপ-কামান ও যুদ্ধ কিসের? দিল্লির সুপ্রিমকোর্ট কার মহত্ত্বের দাস্তান শোনায়? ইসলামাবাদের উচ্চ আদালতে আল্লাহর আইনের কি হাশর করা হচ্ছে? সংসদে তৈরিকৃত আইন ওহী থেকেও উর্ধ্বের, ওহী থেকেও অধিক মর্যাদাপূর্ণ। ওহীর আইন ততক্ষণ পর্যন্ত আইন হতে পারে না, যতক্ষণ সংসদ তা অনুমোদন করে না! বলুন, কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটা কম গুরুত্বপূর্ণ? কোন আইনের রিট ঠিক রাখার জন্য সোয়াত থেকে উজিরিস্তান পর্যন্ত যুদ্ধ চলছে? মুজাহিদরা তো আল্লাহর শরীয়তেরই দাবি করছেন?

ইমাম বায়যাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির (মৃত্যু ৬৯১ হিজরী) নাম কোনো তালেবে ইলমের নিকটই নতুন নয়। তিনি তাঁর তাফসীরে বায়যাবীতে এই আয়াতের তাফসীরে এ কথা বলেন–

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مستهينا به منكرا له فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره، ولذلك وصفهم بقوله الْكَافِرُونَ

যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়তের আইনকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করে (অন্য আইনকে গুরুত্বপূণ মনে করে), এই আইন অনুযায়ী ফয়সালা করার উজুবকে (ওয়াজিব হওয়াকে) অস্বীকার করে, এর আলোকে ফয়সালা করল না, সে ব্যক্তি কাফের। এই আইনকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করার কারণে এবং এই আইন ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা ফয়সালা করার প্রতি অটল থাকার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে কাফের ঘোষণা করেছেন।'

বলুন, অনৈসলামী আইনের উপর কারা অটল রয়েছে। এর জন্য কারা যুদ্ধ করছে? এমনিভাবে আল্লামা জমখশরী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও কারো নিকট অপরিচিত ব্যক্তিত্ব নন। তিনি তাঁর তাফসীরে কাশশাফে এই তাফসীরই করেছেন।

সতর্কবাণী

আল্লামা জমখশরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম বায়যাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির এই মত যে– আল্লাহর শরীয়ত ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা কৃত ফয়সালার উপর অটল থাকার কারণে সে কাফের– বর্তমান সময়ের গণতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থার বেলায় কেমন ফিট হয়? এই বিচার বিভাগ কুরআন ভিন্ন অন্য আইন দ্বারা কৃত ফয়সালার উপর বহু বছর ধরে অটল রয়েছে। বরং কুরআনের বিপরীতে তৈরিকৃত আইনের রিটকে নিশ্চিত করার জন্য লড়াই করাকে জিহাদ বলে...। আহলে হকরা কি এর হুকুম বর্ণনা করবেন?

আবুল ফরজ ইবনে জাওযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৫০৮-৫৯৭ হিজরী) যাদুল মাসির গ্রন্থে বলেন–

... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ جاحدا له' وهو يعلم أن الله أنزله' كما فعلت اليهود' فهو كافر...

যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করার উজুবকে অস্বীকার করে এর দ্বারা ফয়সালা করল না, অথচ সে জানে, এটা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন, যেমন ইহুদীরা করেছিল, সে ব্যক্তি কাফের।

এর দ্বারা জানা গেল যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা এবং অন্যান্য তাফসীরকারকগণ– যারা এই আয়াতের প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন অস্বীকার করত আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য আইন দ্বারা ফয়সালা করে– এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, সে এটাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ বিশ্বাস করে না, বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য সে এই আইন অনুযায়ী ফয়সালা করার ওয়াজিব হওয়ার বিষয় স্বীকার করে না।

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মাআরিফুল কুরআন'–এ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ তাফসীর এভাবে করেছেন–

> যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধিবিধানকে ওয়াজিব মনে করে না এবং এ অনুযায়ী ফয়সালা দেয় না, বরং এর বিপরীত ফয়সালা করে, তারা

> কাফের এবং মুনকির। তাদের শাস্তি জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব। *[মাআরেফুল কুরআন, মায়েদা: ৪৪]*

হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

> আয়াতটি ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে কিন্তু আমাদের উপরও এটা ওয়াজিব। *[তাফসীরে তাবারী, সূরা মায়েদা : ৪৪]*

ইমাম আবু বকর জাসসাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

> আর আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হযরত ইবরাহীম রহামতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই হুকুমটি আ'ম। যে ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী ফয়সালা না করে গায়রুল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে– তাদের সবার ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। *[আহকামূল কুরআন : ৩/৫৩, আবু বকর জাসসাস]*

এমনিভাবে আবুল বখতারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আয়াতটি কি বনী ইসরাইল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন–

> হ্যাঁ, (তবে মনে রেখো) বনী ইসরাইলও তোমাদের ভাই। তোমরা যদি মনে কর, মিঠা মিঠা সব তোমাদের জন্য আর তিতা তিতা সব বনী ইসরাইলের জন্য...। না! তোমরা অবশ্যই তাদের তরিকার অনুসরণ করবে। (আল্লাহ তায়ালা আমাদের হেফাজত করুন। *[প্রাগুক্ত]*

অর্থাৎ নিজেদের জন্য যা কঠিন মনে করবে, সে ক্ষেত্রে বলবে এটা বনী ইসরাইলদের জন্য ছিল। আর যেটা কঠিন মনে না হবে, তা গ্রহণ করবে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি তার তাফসীরে বলেন–

> এই আয়াত সম্পর্কে যারা এ কথা বলেছেন যে, আয়াতটি ইহুদীদের সম্পর্কে, (তিনি বলেন) এটা দুর্বল দলিল। কারণ তাফসীরের ক্ষেত্রে শব্দের ব্যপকতা ধর্তব্য হয়, বিশেষ কারণের নয়।[৩২]

তিনি আরও বলেন–

---

[٣٢] مفاتيح الغيب المعروف تفسير الرازي : الجزء ٦. تفسير سورة المائدة ٤٤. أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي

ইমাম আতা রহমাতুল্লাহি আলাইহি (তাবেয়ী) বলেন, كفر دون كفر অর্থাৎ এখানে কুফর দ্বারা কুফরে আসগার বা ছোট কুফরি উদ্দেশ্য। আর ইমাম তাউস রহমাতুল্লাহি আলাইহি (তাবেয়ী) বলেন, আল্লাহ ও পরকাল অস্বীকার যেমন মিল্লাত থেকে খারেজ করে দেয়, এটি তেমন কুফরি নয়। তার মানে এরা এই আয়াতকে 'কুফরে নিআমত' বলেছেন। এই মতও দুর্বল। কারণ কুফর শব্দ যখন মুতলক বলা হয়, তখন এর দ্বারা كفر في الدين (অর্থাৎ বড় কুফরি –লেখক) উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। *[প্রাগুক্ত]*

যে সব ব্যক্তিত্বগণ এ কথা বলেছেন যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে ব্যক্তি সব মামলাতেই আল্লাহর আইনের পরিপন্থি ফয়সালা করে সে কাফের। যারা কিছু কিছু মামলায় এমন করে থাকে, তারা কাফের নয়। ইমাম রাযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাদের কথা খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন–

لو كانت هذه الآية وعيداً مخصوصاً بمن خالف حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله تعالى لم يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في الرجم ، وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله تعالى في واقعة الرجم . فيدل على سقوط هذا الجواب . والخامس: قال عكرمة: قوله وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه . أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله . إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله تعالى . ولكنه تارك له . فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية . وهذا هو الجواب الصحيح والله أعلم .

এই আয়াতে যদি বিশেষত তাদের জন্যই সতর্কবার্তা দেয়া হত, যারা সব ফয়সালাতেই আল্লাহর শরীয়তের বিরোধিতা করে, তাহলে এতে ইহুদীদের জন্য ধমকি বা সতর্কবাণী থাকত না, যারা রজমের হুকুমে আল্লাহর শরীয়তের বিরোধিতা করতেছিল। অথচ সমস্ত মুফাসিসিরগণ এ বিষয়ে একমত (ইজমা') যে এ আয়াতে সে সব ইহুদীদের জন্য ধমকি যারা রজমের ঘটনায় আল্লাহর শরীয়তের বিরোধিতা করছিল। হযরত ইকরামা রহমাতুল্লাহি আলাইহির বক্তব্য হল, এই আয়াতে ওই ব্যক্তির

হুকুম রয়েছে, যে নাকি আল্লাহর আইনকে অন্তর থেকে অস্বীকার করে এবং মুখ দ্বারাও অস্বীকার করে। তবে যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা আল্লাহর আইন হওয়া সত্যায়ন করে এবং মুখেও তা স্বীকার করে, কিন্তু কাজে তার বিপরীত করে, তাকে আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালাকারীই বলা হবে; যদিও সে বিধান বর্জনকারী রূপে বিবেচ্য হবে। সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে না (অর্থাৎ কাফের বলে বিবেচিত হবে না)। এই উত্তরই সঠিক ।[৩৩]

একটি ব্যখ্যা

এখানে আবারও এ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, ইমাম রাযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি অন্তরে সত্যায়ন এবং মুখে স্বীকার করার কথা বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তাই যা পূর্বে বলা হয়েছে, যে এ অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব হওয়ার স্বীকার করে। সেই সাথে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, ইমাম রাযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হুকুম সেই রাষ্ট্র, বিচারক অথবা জজের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন, যে অন্যান্য সমস্ত বিধান কুরআন অনুযায়ী ফয়সালা করে। শুধু একটা ফয়সালা অকাট্য ও স্পষ্ট শরয়ী হুকুম কুরআনের খেলাফ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক জামানা থেকে নিয়ে তাতারিদের হাতে বাগদাদ পতন (৬৫৬ হিজরী মোতাবেক ১২৫৭ ঈসায়ী) হওয়া পর্যন্ত কখনো কুরআনের বিপরীতে অন্য কোনো বিধান আইন হিসেবে প্রবর্তন করা হয়েছে। আদালতে কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো আইনে ফয়সালা হবে, উম্মত এ কথার কল্পনাও করতে পারেনি। কুরআন পরিপন্থি ফয়সালা বেশির চেয়ে বেশি এমন হত যে, কোনো বিচারক ঘুষ নিয়ে বেত্রাঘাত করে ছেড়ে দিত। উল্লেখিত আয়াত প্রসঙ্গে ছোট কুফরি ও বড় কুফরির যে আলোচনা রয়েছে, তা সেই সুরতহাল সামনে রেখেই করা হত। কারণ ওলামায়ে কেরাম সাধারণত সে কথাগুলোই বর্ণনা করতেন, যা তাদের যুগে সাধারণ মুসলমানদের বেলায় ঘটত।

কিন্তু মুসলিম বিশ্বের উপর যখন তাতারি আক্রমণ করে দারুল খিলাফা বাগদাদ দখল করে নেয়, এরপর এরা মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থা কুরআনের

---

[٣٣] مفاتيح الغيب المعروف تفسير الرازي: الجزء ٦. تفسير سورة المائدة 44. أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي

পরিবর্তে এমন আইন দ্বারা চালাতে থাকে, যার কিছু ছিল চেঙ্গিস খানের তৈরিকৃত আর কিছু ধারা ছিল ইসলামের। এটাকে 'ইলয়াসিক বা ইলয়াস' বলা হত।

এই সুরতহাল দেখে হাফেয ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আইনের ব্যাপারে ফতওয়া দেন যে–

> যে ব্যক্তি এই 'শরীয়তে মুহকামা' ছেড়ে, যা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর উপর, যিনি খাতামুন নাবিয়্যিন, নাযিল হয়েছিল এবং রহিত শরীয়ত হতে কোনো একটার নিকট ফয়সালা নিয়ে গিয়েছে, সে কাফের হয়ে গিয়েছে। তাহলে সেই ব্যক্তির কী পরিণতি হবে যে (চেঙ্গিস খানের তৈরিকৃত আইন) ইলয়াস অনুযায়ী ফয়সালা করাবে এবং সেটাকে শরীয়তে মুহাম্মাদির উপর অগ্রাধিকার দিবে? এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই যে, এমন ব্যক্তি উম্মতের ইজমা অনুযায়ী কাফের সাব্যস্ত হবে। *[বিদায়া ওয়ান নিহায়া, লিইবনে কাসির]*

সুতরাং আপনারাই চিন্তা করুন যে কুরআন ভিন্ন অন্য আইন দ্বারা ফয়সালাকারী আদালতকে ইসলামী বলা... কেমন জঘন্য অপরাধ? আবু জাফর নুহাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৩৮৮ হিজরী) বলেন– ফুকাহায়ে কেরামের এ বিষয়ের উপর ইজমা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, বিবাহিত যেনাকারীকে রজম করা ওয়াজিব নয়, সে কাফের হয়ে গিয়েছে। কারণ সে আল্লাহর এই আইনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। *[মাআনিল কুরআন]*

বিখ্যাত হানাফী ফকিহ ইমাম আবু লাইস সমরকন্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ৩৭৫ হিজরী) তার তাফসীরে বলেন–

يعني : اذا لم يقر ولم يبين... يعني هذه الاية عامة فمن جحد حكم الله فهو من الكفرين

যখন সে কোনো মাসআলায় আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী শাস্তির হক ও সত্য হওয়া স্বীকার করবে না এবং এই আইন বর্ণনাও করবে না.....। অর্থাৎ এই আয়াতটি আ'ম (ব্যাপক), যে ব্যক্তিই আল্লাহর শরীয়ত অস্বীকার করবে, সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। *[তাফসীরে বাহরুল উলূম লিসসমরকন্দী]*

উপমহাদেশের ওলামা মহলে নওয়াব সিদ্দিক হোসাইন খান ভুপালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ১৩০৭ হিজরী) অপরিচিত কোনো ব্যক্তিত্ব নন। নওয়াব সাহেব 'নাইলুল মুরাম' গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসীরে বলেন–

এই আয়াতের من শব্দটি আ'ম। যার মর্ম হল, এই হুকুম বিশেষ কোনো জামাত বা দলের জন্য নির্দিষ্ট নয়। এই হুকুম প্রত্যেক বিচারক ও জজের জন্যই প্রযোজ্য। *[নাইলুল মুরাম, সূরা মায়েদা : ৪৪]*

আয়াতের তাফসীর এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

এই আয়াতের তাফসীরে কোনো কোনো মুফাসসির এ কথা বলেছেন যে, এ আয়াতে কুফর দ্বারা উদ্দেশ্য كفر دون كفر বা ছোট কুফরি। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, আয়াতটি ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আসুন, বিষয়টা একটু ব্যাখ্যাসহ বোঝার চেষ্টা করি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমার মত ليس الكفر الذي يذهبون اليه 'এটা সেই কুফরি নয় যা তারা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে', খারেজীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কারণ খারেজীরা এই আয়াতকে ভিত্তি বানিয়ে কোনো প্রকার তফসিল ছাড়া সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমের বিরুদ্ধে কুফরের হুকুম লাগাত। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট এতে তফসিল (ব্যাখ্যা) রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শব্দ يذهبون اليه (তারা যে কুফরি উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে) সুস্পষ্টরূপে এ কথাই বলছে যে, এই কথা খারেজীদের জবাবে বলেছেন। কারণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এ মাসলাকই ছিল না যে, তারা এই আয়াতকে ভিত্তি বানিয়ে নাউযুবিল্লাহ রাসূলের কোনো সাহাবীকে কাফের সাব্যস্ত করবেন। সুতরাং এটা যখন আহলে সুন্নাতের মাসলাকই ছিল না, তবে ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাদের সম্পর্কে এ কথা কেনো বলবেন, 'তারা যে কুফরি উদ্দেশ্য নেয়'।

এমনিভাবে বিখ্যাত তাবেয়ী আবু মিজলায রহমাতুল্লাহি আলাইহির সেই কথপোকথন যা তার থেকে বনী আমর ইবনে সুদুসের লোকেরা এ সম্পর্কে বলেছে। মনে রাখবেন এরা খারেজী ছিল। হযরত আবু মিজলায রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাদেরকে এ কথাই বুঝিয়েছেন যে, এই আয়াতে সরাসরিভাবে কুফরের হুকুম নেই বরং তফসিল রয়েছে।

এই আলোচনায় আমরা যদি একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বুঝে নেই, তবে আয়াতটির তাফসীর বোঝা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে। এই রেওয়ায়েত দুটি, যা ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার তাফসীরে ১২০২৫ এবং ১২০২৬ নাম্বার আছরের অধীনে বর্ণনা করেছেন। ওই রেওয়ায়েতের কথপোকথন হযরত আবু মিজলায রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং বনী আমর ইবনে সুদুসের লোকদের মধ্যকার। স্মরণ রাখবেন, আবু মিজলায রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাবেয়ী

ছিলেন। তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে মুহব্বত করতেন। আর বনী আমর ইবনে সুদুসের যে সব লোক তাঁর সাথে কথা বলতে এসেছিল, এরা প্রথমে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে ছিল। পরে খারেজী হয়ে গিয়েছিল।

তাদের বক্তব্য ছিল, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং অন্যান্য সমস্ত সাহাবা (নাউযুবিল্লাহ) মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। দলিল হিসেবে তারা এই আয়াত পেশ করত যে, যারা আল্লাহ প্রদত্ত আইনে ফয়সালা করে না তারা কাফের। এ বিষয়টি ওই যুগে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন তাদের জবাবে এ কথা বলেন যে, এই আয়াত দ্বারা তোমরা যে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও অন্যান্য সাহাবীর কুফর প্রমাণ করতে চাও, এই কুফর সেই কুফর নয়। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাঝে ওই জিনিসই নেই, যা তোমরা প্রমাণ করতে চাচ্ছো। সুতরাং দলিল হিসেবে এই আয়াত পেশ করা অযৌক্তিক। আপনারা হযরত আবু মিজলায রহমাতুল্লাহি আলাইহির শব্দগুলো লক্ষ্য করলে বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারবেন।

খারেজীরা হযরত আবু মিজলায রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করে, এই তিন আয়াত (যেই তিন আয়াতে আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা যারা ফয়সালা করে না, তাদেরকে কাফের ফাসেক এবং জালেম বলা হয়েছে) সম্পর্কে আপনার মত কি? এটা কি হক?

হযরত আবু মিজলায রহমাতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দেন, হ্যাঁ এটা হক।

খারেজীরা জিজ্ঞাসা করে, তবে এই শাসকরা কি শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করে?

তিনি উত্তর দেন–

هو دينهم الذي يدينون به، وبه يقولون، وإليه يدْعون، فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا!

এই শরীয়তই তো তাদের দীন ও নিযাম। যা তারা দীন হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এরা তো এরই সমর্থক এবং মানুষদেরকে এর প্রতিই আহ্বান করে। এ থেকে কোনো কিছু বাদ দিলে তারা এ বিশ্বাস করে যে তারা গুনাহের কাজ করেছে।

এরপর আরও কথপোকথন হয়। শেষে তিনি বলেন–

> এই আয়াত ইহুদী, নাসারা, মুশরিক এবং তাদের মত লোকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। *[তাফসীরে তাবারী: জুয :১০]*

অর্থাৎ যে মুসলমান শাসক এই শরীয়তকে আইন হিসেবে তার দেশে বাস্তবায়ন করবে, নিফাযে শরীয়তের প্রবক্তা হবে, এরই আহ্বান করবে। এরপরও কোনো

আইনের উপর আমল করতে গিয়ে অবহেলা বা বিলম্ব হলে নিজেকে গুনাহগার মনে করে। এমন শাসকদের বেলায় এই আয়াত নয়। এই আয়াত তো সে সব শাসকদের ব্যাপারে, যারা ইহুদী নাসারা ও মুশরিকদের মত আল্লাহর শরীয়ত ত্যাগ করে। আল্লাহর শরীয়ত নিজ রাষ্ট্রে বাস্তবায়নও করে না, এ সম্পর্কে কোনো কথাও বলে না, শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য কাউকে আহ্বানও করে না। এক কথায় আল্লাহর শরীয়ত নিজ রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন তো করেই না, গায়রুল্লাহর আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা ও বিচারব্যবস্থা চালু রাখার কারণে নিজেকে অপরাধীও মনে করে না। সে যে ভয়ঙ্কর পাপে লিপ্ত, সে অনুভূতিই তার মধ্যে নেই। এমন শাসক ইহুদী নাসারাদের মত পাক্কা কাফের। কিন্তু তোমরা (খারেজীরা) যেই আয়াতের আলোকে হযরত সাহাবায়ে কেরামকে কাফের প্রমাণিত করতে চাচ্ছো, মনে রেখো, এই আয়াত তাদের ব্যাপারে নয়। এই আয়াত ইহুদী, নাসারা এবং সে সব লোকদের ব্যাপারে যারা মামল-মোকাদ্দমা ও বিচারব্যবস্থায় ইহুদীদের মত কাজ করে।

এখন হয়ত আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যে, যে সব সাহাবা ও তাবেয়ীন মুফাসসির এই আয়াত সম্পর্কে এ কথা বলেছেন যে, আয়াতটি মুসলমানদের ব্যাপারে নয়, বরং ইহুদী ও নাসারাদের ব্যাপারে। তাদের উদ্দেশ্য এটাই যে, খারেজীরা ইহাকে সাহাবীদের উপর প্রয়োগ করতে চায়, তা সঠিক নয়। খারেজীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে তাঁরা এমন বলেছেন। এই আয়াতে যেই কুফরির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা ইহুদীদের ভেতর ছিল, তারা আল্লাহর শরীয়ত ত্যাগ করে তাদের নিজেদের বানানো আইনে ফয়সালা করত এবং নিজেদের বানানো নিয়মকেই আইন সাব্যস্ত করত, যার জন্য তাদের ভেতর অনুতাপ ও অনুশোচনা ছিল না, নিজেদেরকে পাপী ও গুনাহগার মনে করত না– হযরত সাহাবায়ে কেরাম এই কুফরি থেকে পরিপূর্ণ পবিত্র ছিলেন ।

উপরন্তু এসব মুফাসসিরদের নিকটও এই আয়াতের হুকুম আ'ম ও ব্যাপক। অর্থাৎ ইহুদীদের ভেতর যে সব বিষয় ছিল, তা যদি কোনো মুসলমান শাসক ও বিচারকের ভেতর পাওয়া যায়, তবে সেও ইহুদীদের মত পুরোপুরি কাফের বিবেচিত হবে। যেমন আবু মিজলায রহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনায় এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, 'ইহুদী ও নাসারাদের মত যারা করবে, এই আয়াত তাদের ব্যাপারেও।' অর্থাৎ এই আয়াতের হুকুম তাদের বেলায়ও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

এ কথা আমরা নিজেদের পক্ষ হতে বলছিল না। ইমামুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের উপর ব্যাপক আলোচনার পর নিজের মত এভাবে বর্ণনা করেছেন–

> আবু জাফর ইবনে জারীর তাবারী বলেন, আমার নিকট এ সমস্ত মতের (আকওয়াল) মধ্যে সবচেয়ে সঠিক মত মনে হয়েছে এটা... । আয়াতটি ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কারণ এই আয়াতের পূর্বের ও পরের আয়াত ইহুদীদের সম্পর্কে।

এখন কেউ যদি এই প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ তায়ালা তো এই হুকুম প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আ'ম রেখেছেন, ব্যাপক রেখেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা ফয়সালা করবেন না– আপনি এটাকে (ইহুদীদের সাথে) খাস করলেন কোনো, নির্দিষ্ট করলেন কেনো?

এর উত্তর হল, আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তিদের আ'ম (ব্যাপক) হুকুম বর্ণনা করেছেন– যারা আল্লাহর আইন অস্বীকার করে ছেড়ে দেয়, ত্যাগ করে। সুতরাং বিচার ব্যবস্থায় যারা আল্লাহর আইন ইহুদীদের মত ছেড়ে দিবে, তারা কাফের। এমনিভাবে যে ব্যক্তিই আল্লাহর হুকুম অস্বীকার করে ছেড়ে দিবে, সে কাফের। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও তাই বলেছেন। কারণ এই আইন আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে নাযিল করেছেন, এ কথা জানার পরও আল্লাহর হুকুম (আইন) অস্বীকার করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর নবী জানার পরও তাঁকে নবী অস্বীকার করার মতই। *[তাফসীরে তাবারী]*

কাফের হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য

উপরের আলোচনা দ্বারা এতটুকু বুঝে এসেছে যে, এই আয়াতে (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) যে বর্ণনা করা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা ফয়সালা না করবে, সে কাফের'– এই কাফের হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ আসলাফে উম্মত বর্ণনা করেছেন। যা খারেজীদের থেকে সরে এবং আধুনি মরজিয়্যাদের থেকে বেঁচে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ। এখন আমরা এ বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

সর্বপ্রথম বুঝতে হবে, শরীয়তে কুফর দুই প্রকার।

১. কুফরে আকবার। এটাকে হাকিকী (প্রকৃত) কুফরও বলা হয়। এই কুফর ইসলামের গণ্ডি থেকে খারেজ করে দেয়। যার কারণে বিবাহ সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়।

২. কুফরে আসগার। এটাকে কুফরে মাজাযীও বলা হয়। ওলামায়ে কেরাম এটাকে كفر دون كفر ও বলেন। এই কুফরের কারণে মানুষ ইসলামের গণ্ডি হতে খারেজ হয় না।

যারা আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা ফয়সালা করে না, তাদের সম্পর্কে সালফে সালেহীনের বর্ণিত তাফসীরের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন ও মুফাসসিরিনে কেরাম রহিমাহুমাল্লাহ এই আয়াতের মর্ম ইহা বর্ণনা করেছেন যে–

কোনো ব্যক্তি যদি কুরআনের আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব মনে না করে, তবে সে 'কুফরে আকবারে' লিপ্ত। সুতরাং সে এমন কাফের, যে ইসলামের গণ্ডি থেকে পরিপূর্ণরূপে খারেজ হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি যদি কুরআনের আইন দ্বারা ফয়সালা করা ওয়াজিব তো মনে করে কিন্তু বাস্তবে এর আলোকে ফয়সালা করে না, আবার নিজের এই আমলকে গুনাহের কাজ মনে করে, তাহলে এটা কুফরে আসগার। যা মিল্লাত থেকে খারেজ করে না। এমন ব্যক্তি ফাসেক।

এ বিষয়টি ইমাম সদরুদ্দীন ইবনে আবিল ইজ হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৭৩১-৭৯২ হিজরী) শরহে আকিদাতুত তাহাবিয়্যাহ গ্রন্থে আরোও বিস্তারিত আলোচনা করেছেণ। কিতাবটি আরব ওলামায়ে কেরামের নিকটও সমাদৃত। স্মর্তব্য, 'আকিদাতুত তাহাবিয়্যাহ' আকিদার বিখ্যাত কিতাব, যা বড় বড় মাদরাসাগুলোতেও পড়ানো হয়। আর ইমাম তাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও শীর্ষ ইমামদের অন্যতম। তিনি বলেন–

وهنا أمر يجب أن يتفطن له ، وهو : أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة ، وقد يكون معصية : كبيرة أو صغيرة ، ويكون كفرا : إما مجازيا ، وإما كفرا أصغر ، على القولين المذكورين ، وذلك بحسب حال الحاكم : فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب ، وأنه مخير فيه ، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم [الله] ٢ . فهذا كفر أكبر ٣ . وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ، وعلمه في هذه الواقعة ، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة ، فهذا عاص ، ويسمى كافرا كفرا مجازيا ، أو كفرا أصغر . وإن جهل حكم الله فيها ، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ ، فهذا مخطئ ، له أجر على اجتهاده ، وخطؤه مغفور .

এখানে এই মাসআলাটি খুব ভালোভাবে বোঝা জরুরি। তা হল, আল্লাহর শরীয়ত ব্যতীত ফয়সালা করা, কখনো এমন কুফরি হয়, যা ইসলামের গণ্ডি থেকে খারেজ

করে দেয়। কখনো কবিরা গুনাহ কিংবা সগিরা গুনাহ হয়। আর কখনো কুফরে মাজাযী বা কুফরে আসগার হয়। বিষয়টি বিচারকের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত।

বিচারক (বা রাষ্ট্র –লেখক) যদি এই বিশ্বাস (নজরিয়া) লালন করে যে, আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব নয়। (এবং তার এই বিশ্বাস রয়েছে যে) সে এই ফয়সালা করার ক্ষেত্রে স্বাধীন (ইচ্ছা করলে সে আল্লাহর আইনে ফয়সালা করবে, ইচ্ছা করলে অন্য কোনো আইনে) অথবা বিচারক (অথবা রাষ্ট্র –লেখক) আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করাকে গুরুত্ব না দেয়, যদিও সে এ কথার ইয়াকিন রাখে যে, এটা আল্লাহর আইন– এ সবগুলো সুরতই কুফরে আকবারের অন্তর্ভুক্ত। (অর্থাৎ এগুলো এমন কুফরি যা মুরতাদ বানিয়ে দেয়।)

আর যদি সে আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করাকে ওয়াজিব মনে করে, আর এই ফয়সালার ব্যাপারে তার আল্লাহর আইন সম্পর্কে ইলমও থাকে, এরপরও সে এই আইন দ্বারা ফয়সালা করা হতে বিরত থাকে, উপরন্তু সে এ কথা স্বীকারও করে যে, এর কারণে সে আযাবের উপযুক্ত হবে, তবে এমন বিচারক (অথবা রাষ্ট্র –লেখক) গুনাহগার হবে। তাকে এমন কাফের বলা হবে, যে কুফরে আসগারে লিপ্ত রয়েছে।

আর যদি এই ফয়সালার ব্যাপারে আল্লাহর আইন সম্পর্কে অবগত না থাকে, কিন্তু সে এই আইন সম্পর্কে জানার প্রাণন্তকর চেষ্টা করেছে, অতপর ফয়সালা করতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছে, তাহলে একে 'ভুল করেছে' বলা হবে। সে তার ইজতিহাদের সাওয়াব পাবে এবং তার ভুল ক্ষমা করা হবে।[৩৪]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মিনহাজুস সুন্নাহ' গ্রন্থে বলেন–

> ولاريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله علي رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر...
>
> আর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত দ্বারা ফয়সালা করা ওয়াজিব হওয়ার বিশ্বাস রাখে না, সে ব্যক্তি কাফের। অনুরূপ শরীয়ত ব্যাতীত অন্য কোনো (ব্যবস্থা)কে ন্যায় ও ইনসাফ মনে করে মানুষের

---

[٣٤] شرح الطحاوية في العقيدة السلفية : الجزء٢' باب الاقرار باربوبية أمرفطري والشرك أمر...' صدر الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي

মামলার ফয়সালা করাকে আইনসম্মত (হালাল-বৈধ) মনে করলে, সে কাফের।[৩৫]

ইমাম ইবনে কাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহিও (৬৯১-৭৫১ হিজরী মোতাবেক ১২৯২-১৩৫০ ঈসায়ী) 'মাদারিজুস সালেকীন' গ্রন্থে এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন, যা ইমাম ইবনে আবিল ইজ হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি করেছেন। তিনি বলেন–

والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكافرين' الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم....

'আর সঠিক কথা হল, কুরআন ব্যতীত (অন্য আইন দ্বারা) ফয়সালার করলে দুই প্রকারের কুফরি হতে পারে। এক. ছোট কুফরি। দুই. বড় কুফরি। আর এটা নির্ভর করে বিচারকের অবস্থার উপর...।' *[মাদারিজুস সালেকীন : ২৫৯]*

এরপর ইমাম ইবনে আবিল ইজ হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেছেন।

ইতিপূর্বে ইমাম আবু জাফর নুহাস রহমাতুল্লাহি আলাইহির (৩৮৮ হিজরী) বিশ্লেষণও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন–

আমার বক্তব্য হল, যে ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, বিবাহিত যেনাকারীকে রজম করা ওয়াজিব নয়, সে কাফের হয়ে গিয়েছে। কারণ সে আল্লাহর একটা আইন প্রত্যাখ্যান করেছে। *[মাআনিল কুরআন]*

ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'আহকামুল কুরআনে' আরও একটা পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন। যা বর্তমান যুগের সে সব মানুষের চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট, যারা অনৈসলামী আইনকে ইসলামী প্রমাণ করা জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এবং অনৈসলামী আইন দ্বারা ফয়সালাকারী আদালত সম্পর্কে এ কথা বলে যে, এই আদালত ইসলামী আইনের আলোকে ফয়সালা করে। যাহোক, ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ جُحُودَ حُكْمِ اللهِ أَوِ الْحُكْمَ بِغَيْرِهِ مَعَ الْإِخْبَارِ بِأَنَّهُ حُكْمُ اللهِ. فَهَذَا كُفْرٌ يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ وَفَاعِلُهُ مُرْتَدٌّ...

---

[٣٥] منهاج السنة النبوية ' الجزء 5. ص: ١٣٠ ' أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس

আর যদি (এই আয়াতের কুফরি দ্বারা) উদ্দেশ্য আল্লাহর আইন দ্বারা ফয়সালা করা অস্বীকার অথবা কুরআন ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা ফয়সালা করে এ কথা বলা যে, আল্লাহর আইন দ্বারা ফয়সালা করা হয়েছে, এটা (উভয় সুরতে) এমন কুফরি, যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারেজ করে দেয়। আর যে ব্যক্তি এমন করে সে মুরতাদ...।[৩৬]

গণতান্ত্রিক আদালত ও জজ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আদালতগুলো শুধু সেই নিয়মের অধীনেই ফয়সালা দেয়াকে আবশ্যক মনে করে, যে নিয়ম এই ব্যবস্থার অধীনে আইনের অংশ সাব্যস্ত হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোনো নিয়ম অনুযায়ী ফয়সালা করাকে হারাম ও বেআইনী মনে করে। এ পরিমাণ হারাম মনে করে যে, তারা এই আইন ছাড়া অন্য আইন (চাই সে আইন আল্লাহরই হোক না কেন) পড়াকেও সময় নষ্ট মনে করে। তাদের কলেজগুলোতে সে সব কুফরি আইনই পড়ানো হয় এবং এর উপরই মামলায় লড়াই করা ও জজ হওয়ার সার্টিফিকেট দেয়া হয়। এর বিপরীতে কেউ আল্লাহর আইনের যত বড় আলেম ও মুফতীই হোক না কোনো, তাকে উকিল ও জজের সার্টিফিকেট দেয়ার যোগ্যই মনে করে না তারা। বরং তারা আলেমদেরকে তুচ্ছ ও মূর্খ মনে করে। এর দ্বারা তাদের আকিদা অনুমান করা আলেমদের জন্য কঠিন হওয়ার কথা নয় যে, তাদের ঈমান কোন আইনের উপর, আল্লাহর আইনের উপর নাকি নিজ হাতে তৈরিকৃত আইনের উপর?

আচ্ছা, কেউ যদি হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে দলিল-প্রমাণ ছাড়াই নিজের জিদের উপর অটল থেকে তাদেরকে প্রথম দলের (কুফরে আকবারে লিপ্ত) অন্তর্ভুক্ত না করে, তবে তাদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা, সে তাদেরকে দ্বিতীয় দলে কিভাবে গণ্য করতে পারে, যখন নাকি ইমাম ইবনে আবিল ইজ হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কুফরে আসগারের সুরতে এই শর্ত বর্ণনা করেছেন যে, 'আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনে ফয়সালাকারী এই ইয়াকিন রাখে যে, এমন কাজ করলে তাকে আযাবে নিপতিত হতে হবে'।

আপনারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে চলমান আদালত ও জজদের অবস্থা একটু লক্ষ্য করুন। তারা কেমন দ্বীধাহীনচিত্তে গায়রুল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে যাচ্ছে। নিজেদেরকে আযাবের উপযুক্ত মনে করা তো দূরের কথা, নিজেদেরকে

---

[٣٦] احكام القران للجصاص: الجزء ٦. باب الحكم بين أهل الكتاب

বরং ন্যায়পরায়ন, কাযি এবং আল্লাহর ওলি মনে করে। এজন্য একটা হারাম বরং কুফরি কাজকে আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম মনে করা সমস্ত আলেমদের নিকট এমন কুফরি, যা দীন থেকে খারেজ করে দেয়। ইমাম সাহেবের নিকটও এরা দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হক্কানী আলেমদের নিকট কয়েকটি আবেদন

প্রচলিত সংসদ, আদালত ও এর বিচারকরা কি এই বিশ্বাস (নজরিয়া) রাখে না :

সমস্ত মামলায় (বিশেষত সুদ, যেনা, চুরি ইত্যাদি) আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা তাদের উপর ওয়াজিব নয় বরং সেই আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব (আবশ্যক) যা সংসদে মঞ্জুর হয়ে আইনের অংশ হয়েছে?

ইমাম সদরুদ্দীন ইবনে আবিল ইজ হানাফী এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুমাল্লাহ ওই সময় কুফরে আকবারের হুকুম বর্ণনা করছেন, যখন বিচারক এই বিশ্বাস রাখে যে, সে ইচ্ছা করলে কুরআনের আইনে ফয়সালা করবে, ইচ্ছা করলে অন্য আইনে, এই স্বাধীনতা তার রয়েছে। আর এখানকার সুরতহাল হল, বিচারকরা অন্য আইনে (কুরআন ব্যতীত গায়রুল্লাহর আইনে) বিচার করাকেই নিজেদের জন্য ফরয করে বসেছে। এমনকি তারা শপথই করে, আমরা সংসদের (গায়রুল্লাহর) পক্ষ হতে অনুমোদিত আইনেই বিচার করব।

বলুন, প্রচলিত ব্যবস্থা কুরআন দ্বারা ফয়সালা করার গুরুত্ব দেয়? নাকি কুরআনের আইন (প্রস্তারাঘাত, বেত্রাঘাত, হাত কর্তন, কিসাস, সুদের নিষেধাজ্ঞ ইত্যাদি) বাস্তবায়নকে প্রতিহত করে? কুরআনের আইনকে তারা বাস্তবায়নের উপযুক্তই মনে করে না। কুরআন হাদীস এবং ফিকাহর পরিবর্তে তাদের কলেজগুলোতে সেই আইনই পড়ানো হয়, যা ইংরেজরা বানিয়েছে।

বলুন, এই বিচার ব্যবস্থায় কেউ কি নিজেকে গুনাহগার মনে করে?

অনৈসলামী আইন দ্বারা ফয়সালাকারী আদালতকে ইসলামী আইন দ্বারা ফয়সালাকারী আদালত বলে এটাকে (অনৈসলামী আইনকে) ইসলামী সাব্যস্ত করা হচ্ছে না?

তাই হক্কানী আলেমদের নিকট আবেদন, তারা ইমাম সদরুদ্দীন ইবনে আবিল ইজ হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহির এই ভাষ্য (ইবারত) এসব তথাকথিত আলেমদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন।

فانه ان اعتقد أن الحكم بماأنزل الله غير واجب' وأنه مخير فيه' أو
استهان به مع تيقنه أنه حكم [الله] فهذا كفر أكبر...

বিচারক (অথবা রাষ্ট্র –লেখক) যদি এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব নয়। (আর তার এই বিশ্বাস রয়েছে যে) সে এই ফয়সালা করার ক্ষেত্রে স্বাধীন (আল্লাহর আইনেও ফয়সালা করতে পারে, অন্য আইনেও করতে পারে)। অথবা বিচারক (অথবা রাষ্ট্র –লেখক) আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করাকে গুরুত্ব না দেয়, যদিও সে এ কথার ইয়াকিন রাখে যে, এটা আল্লাহ আইন, তবে এ সমস্ত সুরতে সে কুফরে আকবার (এমন কুফরি যা মুরতাদ বানিয়ে দেয়) করেছে...।

এই ভাষ্যে উল্লেখিত প্রতিটি বিষয় ভিন্ন ভিন্নভাবে স্বতন্ত্র কুফরে আকবার। অথচ এই বাতিল ও ভ্রান্ত ব্যবস্থায় এই কুফরে আকবারের সবগুলোই এক সাথে বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত ওলামায়ে কেরাম তাদের ব্যাপারে কি রায় দেন যারা তাদের আদালতের ভিত্তি, মূল ও উৎস আল্লাহর কিতাব ছেড়ে মানুষকে বানিয়েছে? মানুষ যে আইনই তৈরি করে, এই আদালতগুলো সে আইন অনুযায়ী বিচার করতে বাধ্য থাকে। বিচারব্যবস্থায় এর উপরই শপথ নেয় আর তারা সারা জীবন এই শপথের আনুগত্য করেই কাটায়। এর বিনিময়ে প্রতিদান প্রপ্তির (ভাতা ও প্রমোশন) আর এর বিরোধিতা করলে শাস্তির (চাকরি চলে যাওয়া) বিশ্বাস রাখে...। হযরত ওলামায়ে কেরাম এদের ব্যাপারে কি হুকুম দেন?

ইমাম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষ্যের এই শব্দাবলীও গভীরভাবে ভানার দাবি রাখে। তিনি বলেছেন مع تيقنه أنه حكم الله অর্থাৎ বিচার যদিও এই ইয়াকিন রাখে যে এই আয়াত ও আহকাম (বিধি-বিধান) আল্লাহ প্রদত্ত, এরপরও যদি সে এই আইন অনুযায়ী ফয়সালা না করে, তবে সে কুফরে আকবারে লিপ্ত!

ইসলামের সাথে অন্য দ্বীন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়

ওলামায়ে কেরাম যদি এ কথা বলেন যে, প্রচলিত গণতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থা আল্লাহ প্রদত্ত আইনের উপর ঈমান রাখে, সুতরাং তাদের উপর কুফরে আকবারের হুকুম সঠিক নয়। তাহলে ওই সব আলেমদের নিকট আবেদন রইল, যে সব মুফসসিরদের তাফসীরি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো আরেকবার পড়ুন। এরপর লক্ষ্য করে দেখুন যে, আসলাফে উম্মত যেসব বিষয়কে কুফরে আকবার বলেছেন, তা প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পাওয়া যায় কি না? সেই সাথে এ কথাও

স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু মুখে কুরআন স্বীকার করার নামই কি ঈমান? এক দল লোক মুখে দাবি করে যে তারা কুরআনের উপর ঈমান রাখে। কিন্তু কুরআন যাকে কুফরি বলেছে, সেটাকে তারা কুফরি মনে করে না। তবে কি তারা মুসলমান হতে পারে? এরা কি নিজেরাই নিজেদের দাবি প্রত্যাখ্যান করছে না?

এমনিভাবে কেউ যদি এ দাবি করে যে, সে কুরআনের সমস্ত আয়াতের উপর পাক্কা ঈমান রাখে, কিন্তু বিশেষ কোনো প্রতিমাকে সিজদা করা, তাকে পবিত্র বিশ্বাস করা, তাকে সম্মান করা এবং তার জন্য জীবন মরনের কসম খাওয়াকে কুফর বিশ্বাস না করা... দুনিয়ার কোনো সরকারী আলেম কি তাকে কুফরি থেকে বাঁচাতে পারবে?

এমনকি কখনো সম্ভব, কোনো ব্যক্তি মুখে কালেমা তাইয়িবাও পড়ে আবার সেই সাথে ইসলাম ব্যাতীত অন্য দীনও বিশ্বাস করে? তাকে কি মুসলমান বলা হবে? কখনোই না। যে কোনো ব্যক্তি একই সময় দুই ধর্ম স্বীকার করে, অথবা ইসালামের বিপরীতে অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করে, অথবা অন্য কোনো ধর্মকে উত্তম মনে করে... সে মুসলমান হতে পারে না। আর তার মুখের এই স্বীকারোক্তিও ধর্তব্য করা হবে না। আর এখানে তো গণতন্ত্রের রক্ষীশক্তি (বিশেষত সংসদ, বিচারবিভাগ, সেনাবাহিনী এবং পুলিশ) দীনে জমহুরিয়াত তথা গণতন্ত্রের ধর্মকে রক্ষা করার জন্য শপথ গ্রহণ করে। মুখেও তা স্বীকার করে। আর তাদের ভূমিকাও তার সত্যায়ন করছে। পক্ষান্তরে ইসলামের ব্যাপারে তাদের ভূমিকা বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রকাশ করছে। অথবা অন্তত ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তনে তাদের বিরোধিতা এবং তা প্রতিহত করার জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তির ব্যবহার প্রমাণ করে যে, এরা এই আইনের বিরোধিতা করে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন। আর যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দীনের বিরোধিতা করে, হক্কানী ওলামায়ে কেরামের নিকট তাদের হুকুম জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

আমরা যদি আমাদের অবস্থান থেকে সরে আসি এবং সরকারি আলেমদের কথা মেনে নেই যে, এই ব্যবস্থার রক্ষীশক্তি নিফাযে শরীয়ত তথা শরীয়ত প্রবর্তনের ব্যাপারে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে না। কিন্তু আপনারা তো এটুকু অবশ্যই মেনে নিবেন যে, তাদের অন্তরে গণতন্ত্রের ভালোবাসা এবং সম্মান এ পর্যায়ের রয়েছে যে, তারা এই গণতন্ত্রকে আল্লাহর সমান সাব্যস্ত করেছে। যেটাকে হারাম (বেআইনি) করে দেয়া হয়, সেটাকে বেআইনি (হারাম) মেনে নেয়। যেটাকে হালাল এবং আইন সম্মত বলা হয় সেটা হালাল হয়ে যায়। তার সম্মান, ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং তার গণ্ডির মধ্যে থেকে সব কাজ আঞ্জাম দেয়ার কসম খাওয়া... ভালোবাসা ছাড়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

যারা গায়রুল্লাহকে আল্লাহর বরাবর সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে তাদের সম্পর্কে কি বলা হয়েছে, আসুন তা একবার দেখে নেয়া যাক।

গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমান মর্যাদা প্রদান করা

পবিত্র কুরআন এদের সম্পর্কে বলেছে–

إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

> 'যখন আমরা তোমাদেরকে সকল সৃষ্টির রবের সমকক্ষ বানাতাম'। *[সূরা আশ-শুআরা : ৯৮]*

এটা জাহান্নামীদের পরস্পরের ঝগড়ার বর্ণনা। জাহান্নামে গিয়ে তারা তাদের নেতাদের সাথে এভাবে ঝগড়া করবে, তর্ক করবে।

ইমাম ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার তাফসীরে এ কথা বলেন যে–

> জাহান্নামীরা তাদের নেতাদের সাথে ঝগড়া করবে এবং বলবে, আমরা তোমাদের নির্দেশ এমনভাবে পালন করেছি, যেভাবে রব্বুল আলামীনের হুকুম পালন করা হয়। আমরা রব্বুল আলামীনের সাথে তোমাদের ইবাদত করেছি। *[তাফসীরে ইবনে কাসির]*

ইমাম বায়যাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

> এই জাহান্নামীরা ইবাদতে তাদের (নেতাদের) হক (অধিকার) সাব্যস্ত করত। *[তাফসীরে বায়যাবী]*

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সাথে তোমাদেরকে (মিথ্যা উপাসকদেরকে) উপাসক বিশ্বাস করে ইবাদত তোমাদেরকে রব্বুল আলামীনের সমান সাব্যস্ত করত।

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাদারিজুস সালিকীনের ২৬০ পৃষ্ঠায় বলেন–

> فصل : وأما الشرك فهو نوعان : أكبر وأصغر. فالأكبر لايغفره الله الا بالتوبة منه' وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله وهو الشرك الذي تضمن تسوية الهة المشركين برب العالمين... الي ان قال ...فذكر الهه ومعبوده من دون الله...

শিরক দুই প্রকার, শিরকে আকাবর ও শিরকে আসগার।

শিরকে আকবার, আল্লাহ তায়ালা যা তাওবা করা ছাড়া ক্ষমা করবেন না। যেমন কেউ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে তার শরিক সাব্যস্ত করল। তাকে এমনভাবে ভালোবাসল, যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা হয়। মুশরিকরা যে তাদের প্রতিমাগুলোকে আল্লাহর বরাবর সাব্যস্ত করত, এই শিরকের প্রাসঙ্গে সেই শিরকও চলে আসে। এ কারণেই জাহান্নামে তারা তাদের মা'বুদদেরকে বলবে—

إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

আল্লাহর কসম! আমরা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে রব্বুল আলামীনের সমান মর্যাদা দিতাম।

এটা (আল্লাহর সমান বানানো) তাদের এই স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা একাই প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই প্রতিটি বস্তুর মালিক এবং প্রতিপালক। তারা এই কথা স্বীকার করত যে তাদের উপাসকরা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, কাউকে রিযিক দিতে পারে না, কাউকে মেরে ফেলতে পারে এবং কাউকে জীবনও দিতে পারে না। তারা যে তাদের মা'বুদ ও উপাসকদেরকে আল্লাহর সমান মর্যাদা দিত, তা শুধুই তাদের প্রতি ভালোবাসা এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা থেকে। মুশরিকরা তাদের উপাসকদেরকে আল্লাহর থেকেও অধিক ভালোবাসত। তাদের উপাসকদেরকে অবজ্ঞা ও অবমাননা করলে হিংস্র বাঘের মত ক্ষেপে উঠত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালাকে অবজ্ঞা ও অবমাননা করলে সেভাবে ক্ষীপ্ত হত না। ইমাম ইবনে কাইয়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন— দুনিয়ার অধিকাংশ মুশরিক এই কিসেমের শিরকে লিপ্ত রয়েছে।

গণতন্ত্র বস্তুত এই শিরকেরেই দাওয়াত দেয়। আপনি যদি কোনো সেনা অধিনায়ক বা বিচারপতিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বিশ্বজগতের স্রষ্টা কে? এর মালিক ও প্রতিপালক কে? কে সবাইকে রিযিক দেয়? নিঃসন্দেহে সে এই উত্তরই দিবে যে, আল্লাহ। কিন্তু যখন তাকে বলা হবে, তাহলে গণতান্ত্রিক বিচার বিভাগ ও আইন পরিষদকে আল্লাহর বরাবর বরং আল্লাহর থেকেও বড় কেনো করেন? কুরআনের আইনকে গায়রুল্লাহ (সংসদ) কর্তৃক অনুমোদন না করা পর্যন্ত ফয়সালার উপযুক্ত মনে করেন না কেনো? এমনিভাবে পুলিশকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আল্লাহর 'হুদুদ' (প্রস্তারাঘাত করা, বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি) নিয়ে উপহাস করলে ক্ষিপ্ত হও না। কিন্তু কেউ গণতান্ত্রিক আইনের রিটকে চ্যালেঞ্জ করলে তোমরা হিংস্র বাঘের মত গর্জন করতে থাক? পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাদের উপর হামলে পড়। স্বদেশী কালেমাওয়ালা মুসলমানদেরকে লাঠি চার্জ কর, কাঁদানো গ্যাস ছুড়ে নাজেহাল কর। এমনকি বিমান দিয়ে তাদের উপর বোমা পর্যন্ত বর্ষণ কর?

হে হককানী ওলামায়ে কেরাম! এই আইন পরিষদ ও বিচার বিভাগ যদি এখনও শিরকে আকবারে লিপ্ত না হয়ে থাকে, তবে শিরকে আকবার কাকে বলে, তা কি একটু বলবেন?

মনে রাখবেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুনসিফ (ফয়সালাকারী) বানানো ছাড়া ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

> অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়। *[সূরা নিসা : ৬৫]*

ইমাম আবু বকর জাসসাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

আয়াতটিতে এ কথার দলিল রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানাবলী হতে একটা বিধানকেও প্রত্যাখ্যান করবে, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানাবলী হতে কোনো একটা বিধান প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে খারেজ। ইসলাম থেকে সে বহিস্কৃত। চাই সন্দেহ বশত প্রত্যাখ্যান করুক, অথবা কবুল না করুক অথবা কবুল করা থেকে বিরত থাকুক। আর এটা সাহাবায়ে কেরামের এই মাসলাক সহীহ হওয়াকে প্রমাণ করে। যার আলোকে সাহাবায়ে কেরাম যাকাত প্রদান করা হতে বিরত ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করে হত্যা করেছেন এবং তাদের সন্তানদেরকে গোলাম বানিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, যে কেউই তাঁর ফয়সালা এবং আইনকে রাসূলের সা. নিকট অর্পণ করবে না, সে ঈমানদার নয়। *[আহকামূল কুরআন, আবুবকর জাসসাস : ৩/১৮১]*

ইমাম আবু বকর জাসসাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাদেরকেও প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে উল্লেখ করেছেন, যারা এ থেকে বিরত থাকে। সুতরাং যারা ৬৫ বছর ধরে শরীয়ত প্রবর্তন হতে বিরত থেকেছে, তাদের হুকুম কি হবে?

আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন যে–

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফয়সালাকারী বানানো ছাড়া ঈমান সম্ভব নয়। অর্থাৎ মোনাফেকরা কেমন বেহুদা বিলাসে রয়েছে এবং কেমন বেহুদা বাহানার দ্বারা কাজ নিতে চায়। তাদের খুব ভালো করে বোঝা উচিত যে, আমি কসম করে বলছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এরা আপনাকে হে রাসূল! নিজেদের ছোট-বড় এবং জান-মাল বিষয়ক সব ধরনের বিবাদে আপনাকে বিচারক ও ফয়সালাকারী না মানবে, অর্থাৎ আপনার বিচার ও ফয়সালায় তাদের অন্তরে অসন্তুষ্টি থাকবে এবং আপনার প্রতিটি নির্দেশ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঈমান নসীব হতে পারে না। যা করার ভেবে চিন্তে কর। *[তাফসীরে উসমানী]*

রহমাতুললিল আলামীনকে শুধু রবিউল আওয়াল মাসে নবী মানেন? সীরাতুন্নবীর বড় বড় আসর আর বিতর্ক অনুষ্ঠান...!!! কিন্তু আল্লাহর রাসূলকে যখন নিজেদের বিষয়ে জজ ও বিচারপতি বানানোর সময় আসে, তখন রাসূলকে ছেড়ে রাসূলের দুশমনদের আইন দিয়ে ফয়সালা করাতে যান। রাসূলের দুশমনদের আইনের পবিত্রতা, আনুগত্য এবং তা রক্ষা করার শপথ করেন। নবীর উপর আপনার এ কেমন ঈমান? মানবতার উপকারী বন্ধুর উপকারের বদলা দেয়ার এ কেমন ধরন? খতমে নবুওয়াতের উপর এ কেমন ঈমান যে, খাতামুননাবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তকে আদালত থেকে বের করে, জীবনব্যবস্থা থেকে দূর করে, কাদিয়ানী এবং তাদের প্রভুদের আদালতের উপর ঈমান এনেছেন? আল্লাহর দুশমনদের তৈরিকৃত জীবন পদ্ধতি দুনিয়াতে চলছে। নবীর হে গোলামেরা! ভাবো... একটু ভাবো... অন্তরে হাত রেখে একটু ভাবো...। এ কেমন তোমাদের ভালোবাসা? এ কেমন তোমাদের আনুগত্য? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বক্ষেত্রে নবী মানা ছাড়া এই উম্মতের কিশতি গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। দুইশ' বছর ধরে এই উম্মতের উপর যেই লাঞ্ছনা চেপে বসে আছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের জন্য জীবন উৎসর্গ না করা পর্যন্ত তা দূর হতে পারে না।

তেমনিভাবে শরীয়তের যে কোনো হুকুম স্বীকার না করা, তা পালন করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা– শরীয়তের দৃষ্টিতে– দীন ত্যাগকারী দলের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তায়ালার ফরমান–

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে। *[সূরা নিসা : ৬০]*

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে জারীর তাবারী, ইমাম কুরতবী এবং ইমাম আবু লাইস সমরকন্দী রহিমাহুমূল্লাহ এই রেওয়ায়েত নকল করেছেন–

'শা'বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক মোনাফেক ও এক ইহুদীর মাঝে ঝগড়া হয়। ফয়সালার জন্য ইহুদী ওই মোনাফেককে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য বলে। কারণ ইহুদী জানত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষ নেন না। আর মোনাফেক ওই ইহুদীকে বলে, তোমাদের বিচারকদের (ইহুদীদের) নিকট গিয়ে করব। কারণ সে জানত, ইহুদী বিচারকরা ঘুষ নেয়। এ বিষয়ে যখন তাদের উভয়ের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, তখন উভয় কবিলা জুহাইনার এক জ্যোতিষের দ্বারা ফয়সালা করানোর উপর এক মত হয়। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়।'

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, বিশর নামের এক মোনাফেক ছিল এবং যুফার নামের এক ইহুদী ছিল। কোনো বিষয় নিয়ে এদের মাঝে ঝগড়া হয়। ইহুদী বলে, আমার সাথে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর কাছে চলো। আর মোনাফেক বলে, না, কাআব বিন আশরাফের কাছে চলো, তাকে দিয়ে ফয়সালা করাব। আর এই কাআব বিন আশরাফকেই আল্লাহ তায়ালা তাগুত (অবাধ্য ও বিদ্রোহকারী) নাম দিয়েছেন। কিন্তু ইহুদী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়া অন্য কোথাও যেতে রাজি ছিল না। মোনাফেক বাধ্য হয়ে ইহুদীর সাথে নবীজির নিকট আসে।

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো বৃত্তান্ত শোনার পর ইহুদীর পক্ষে ফয়সালা দেন। কিন্তু সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর মোনাফেক নবীজির ফয়সালা অস্বীকার করে। মোনাফেক বলে, আমি এই ফয়সালা মানি না। তুমি আমার সাথে আবু বকরের নিকট চলো। আবু বকরকে দিয়ে ফয়সালা করাব।

যাহোক উভয়ে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট যায়। তিনি সব শুনে ইহুদীর পক্ষে ফয়সালা করেন। এরপর উভয়ে যখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসে, মোনাফেক বলে, এ ফয়সালা আমি মানি না। চলো ওমরের কাছে যাই। ওমরকে দিয়ে ফয়সালা করাব।

তারা উভয়ে এবার হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট যায়। ইহুদী বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বলে, আমরা প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাই। তিনি আমার পক্ষে ফয়সালা করেন। কিন্তু নবীজির নিকট থেকে চলে আসার পর এ সেই ফয়সালা অস্বীকার করে। এরপর তার প্রস্তাবে আবু বকরের নিকট যাই। তিনিও আমার পক্ষে ফয়সালা করেন। এবারও সে তাঁর ফয়সালা অস্বীকার করেন। এখন আপনার নিকট নিয়ে এসেছে। আপনাকে দিয়ে ফয়সালা করাবে।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মোনাফেককে জিজ্ঞাসা করলেন, এ যা যা বলল তা কি সত্য? মোনাফেক উত্তর দেয়, হ্যাঁ, সব সত্য। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ভেতরে যান এবং তরবারি নিয়ে আসেন। এরপর তরবারির এক আঘাতে মোনাফেককে ঠা-া করে দেন। আর বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের ফয়সালা মেনে নেয় না, তার ফয়সালা আমি এভাবেই করি। ইহুদী তো সেখান থেকে দৌড়ে পালায়। এ প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে ওমর! তুমি ফারুক, সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী। এরপর হযরত জিবরাইল আমিন এসে বলেন, নিঃসন্দেহে ওমর হক ও বাতিলকে পৃথক পৃথক করে দিয়েছে।

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কালেমার দাবি করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরআন এবং হাদীসের ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকে না, তার শাস্তি কতল।

এমনকি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফয়সালা করানোর জন্য যখন আহ্বান করা হয়, পবিত্র কুরআন তখন মুমিনদের শানে এ কথা বলেছে–

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

> মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার, মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে: 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।' আর তারাই সফলকাম। *[সূরা নূর : ৫১]*

আর মোনাফেকদের নিদর্শন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলেছে–

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

> আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা আস যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে', তখন মুনাফিকদেরকে দেখবে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে। *[সূরা নিসা : ৬১]*

حكم بغير ما أنزل الله একবার করা ও অভ্যাসে পরিণত করার মধ্যে পার্থক্য এবং ইহাকে আইন (শরীয়ত) হিসেবে প্রবর্তন করা

নিম্নে বর্ণিত এই পার্থক্য বোঝারও প্রয়োজন রয়েছে।

১. দেশে শরীয়ত প্রবর্তিত অবস্থায় একক কোনো বিষয়ে কুরআন ভিন্ন অন্য আইনে ফয়সালা করা।

২. দেশে শরীয়ত প্রবর্তিত অবস্থায় কুরআন ভিন্ন অন্য আইনে ফয়সালা করাকে অভ্যাসে পরিণত করা।

৩. দেশে শরীয়ত প্রবর্তনের পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যবস্থা প্রচলন করা এবং এই ব্যবস্থার অধীনে আদলতের শপথ করা এবং বিচার করা।

কুফরে আকবার ও কুফরে আসগারের আলোচনা ও শ্রেণীবিন্যাস এমন রাষ্ট্র, বিচারক ও জজের ব্যাপারে, যে দেশে শরীয়ত প্রবর্তিত থাকা অবস্থায় শুধু একটা বিষয়ে কুরআনের আইন এড়িয়ে ফয়সালা করে। অর্থাৎ কুফরে আকবার ও কুফরে আসগারের এই শ্রেণীবিন্যাস কেবল প্রথম সুরতের অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত।

সুতরাং এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, দ্বিতীয় সুরতটি কুফরি হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো দরবারী বা সরকারী মৌলভীরও সন্দেহ নেই। আর তৃতীয় সুরতটি কুফরে আকবারের নিকৃষ্ট রূপ। আল্লাহর সাথে এর থেকে বড় কুফরি তো বনী ইসরাইলের ইহুদীরাও করেনি। তাদের ফয়সালার উৎসও (Authority) ছিল ওহী (তাদের তাওরাত।) আর আধুনিক ইবলিসি গণতন্ত্রের উৎস আল্লাহর শরীয়তের মোকাবেলায় গায়রুল্লাহর (সংসদের) শরীয়ত।

সুতরাং এমন কুফরিকে ইসলাম প্রমাণিত করা, নিজের ঈমানকেই ধ্বংস করা। আর এমন কুফরিকে সাধারণ মানুষের সম্মুখে আলোচনা না করা নিকৃষ্টতম 'কিতমানে হক' (সত্য গোপন)।

সতর্ক জ্ঞাপন

মোটকথা এই আয়াতের তাফসীরে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমার মত كفر دون كفر (কুফরে আসগার) এর আশ্রয় নিয়ে বর্তমানের আদালতকে এর 'মিসদাক' প্রয়োগক্ষেত্র প্রমাণিত করা স্পষ্ট খেয়ানত এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ। কারণ كفر دون كفر কে সরাসরি ব্যবহার করেননি। বরং খারেজীদের কথা খণ্ডন করতে বলেছেন।

কুরআনের আইন ছাড়া অন্য আইনে ফয়সালাকারী আদালতকে ইসলামী প্রমাণ করা

সুতরাং এ আলোচনাটি বোঝার পর আমরা মুসলমান ভাইদের নিকট আবেদন করব, আপনারা প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা– যা শরীয়তের আইন ভিন্ন অন্য আইনে বিচার করে আসছে– এর সম্পর্কে এ কথা বলবেন না যে, আদালতগুলো তো ৭৩ এর আইনে ফয়সালা করে। আর ৭৩ এর আইন ইসলামী। সুতরাং এই আদালতগুলো ইসলামী আইন দ্বারাই ফয়সালা করে। এটা আল্লাহর পবিত্র সত্ত্বার বিরুদ্ধে এত বড় অপবাদ যে, আসমান ভেঙ্গে পড়বে এবং পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আহকামুল কুরআন'-এ এই পয়েন্টটি বর্ণনা করেছেন, যা বর্তমানের মানুষের চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট। যারা অইসলামী আইনকে ইসলামী প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন এবং অইসলামী আইনে ফয়সালাকারী আদালত সম্পর্কে বলে যে, এই আদালত ইসলামী আইনে ফয়সালা করে, তিনি বলেন–

فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ جُحُودَ حُكْمِ اللهِ أَوِ الْحُكْمَ بِغَيْرِهِ مَعَ الْإِخْبَارِ بِأَنَّهُ حُكْمُ اللهِ، فَهٰذَا كُفْرٌ يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ وَفَاعِلُهُ مُرْتَدٌّ...

আর যদি (এই আয়াতে কুফরি দ্বারা) উদ্দেশ্য আল্লাহর আইন দ্বারা ফয়সালা করার অস্বীকৃতি অথবা কুরআন ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা ফয়সালা করে এ কথা বলা যে, আল্লাহর আইন দ্বারা ফয়সালা করা হয়েছে, এটা (উভয় সুরত) এমন কুফরি, যা

> মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারেজ করে দেয়। যারা এমন করে তারা মুরতাদ।[৩৭]

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

আর (মনে রেখো) যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী বিচার না করে শরীয়তপরিপন্থি আইনকে ইচ্ছাকৃতভাবে শরয়ী আইন বলে এবং সে অনুযায়ী বিচার করে) এমন ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে কাফের। *[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, সূরা মায়েদা : ৪৪]*

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন–

> আর মনে রেখো, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী বিচার না করে শরীয়তপরিপন্থি আইনকে ইচ্ছাকৃতভাবে শরয়ী আইন বলে এবং সে অনুযায়ী বিচার করে, এমন ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে কাফের। *[তাফসীরে মারেফুল কুরআন : ৩, সূরা মায়েদা]*

সুতরাং যারা এসব আদালতকে ইসলামী প্রমাণ করেন, তাদের ভয় করা উচিত।

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ এবং ফুকাহায়ে উম্মত

কুরআন ভিন্ন অন্য আইনে ফয়সালা করার বিষয়টি ফুকাহায়ে উম্মত অতি সহজে বুঝিয়ে দিয়েছেন। পাঠকবর্গের সুবিধার্থে সেগুলোও এখানে উল্লেখ করছি।

কুফরে আকবার

১. কুফরে আকবারের সংজ্ঞা তো পূর্বে চলে গিয়েছে, যা ইমাম সদরুদ্দিন ইবনে আবিল ইজ হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন। ইহা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি যদি এই দর্শন ও বিশ্বাস লালন করে যে, শরীয়তের আইন অনুযায়ী এই যুগে চোরের হাত কাটা, যেনাকারীকে প্রস্তারাঘাত করা কিংবা বেত্রাঘাত করা, কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে বৈশ্বি সম্পর্ক বজায় রাখা, কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ করা.... উপযোগী নয়, এগুলো প্রয়োগযোগ্য নয়। অথবা এগুলো বাস্তবায়ন করাকে লজ্জা, অপমান এবং (বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্বে) মানহনিকর মনে করে। অথবা 'হুদুদুল্লাহ'তে সংযোজন করাকে বৈধ মনে করে, অথবা সংযোজন করে নেয়, অথবা এমন বিশ্বাস লালন করে যে, মানব রচিত আধুনি জীবনব্যবস্থা অধিক উপযোগী... এসব দর্শন,

---

[৩৭] احكام القران للجصاص: الجزء ٦' باب الحكم بين أهل الكتاب' في تفسير المائدة ٤٤

বিশ্বাস ও চিন্তাধারা কুফরে আকবার, যা মিল্লাত থেকে খারেজ করে দেয়। কারণ সে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত শরীয়তকে মন্দ এবং গায়রুল্লাহ (মানব রচিত) শরীয়তকে (জীবন বিধান) উত্তম মনে করেছে।

২. কুফরে আকবারের একটা সুরত এটাও যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর আইনকেও উত্তম মনে করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক আইনকে এর চেয়েও অধিক উপযোগী মনে করে।

৩. অথবা গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থাকে শরীয়ত প্রবর্তনের বরাবর মনে করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের হুকুম একই রকম। অর্থাৎ উভয় শ্রেণীর মানুষ কুফরে আকবার অর্থাৎ এমন কুফরিতে লিপ্ত, যা মিল্লাত থেকে খারেজ করে দেয়। কারণ আল্লাহর আইনের মোকাবেলায় অন্য আইনকে উত্তম মনে করা কিংবা তার সমান মনে করা বস্তুত আল্লাহ প্রদত্ত আইনকে প্রত্যাখ্যান করা।

৪. অথবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে তালবাহানা করা, বিরোধিতা করা অথবা অস্বীকার করা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ...

এই দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিশ্চয় আমি অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। *[সূরা সিজদা : ২২]*

এই প্রকারও কুফরে আকবারের অন্তর্ভূক্ত। শরীয়ত প্রবর্তন অস্বীকার, বিরোধিতা অথবা দীর্ঘন দিন তালবাহানা করা– ফুকাহায়ে কেরাম এসব গুলোর একই হুকুম বর্ণনা করেছেন। এটা ফিকাহর গ্রন্থাবলীর বিখ্যাত মাসআলা, যে কোনো মাসলাকের কিতাব ও ফতওয়াগ্রন্থে দেখে নিতে পারেন। বিশেষত হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির এমদাদুল ফতাওয়ার সপ্তম খণ্ডে এবং মাওলানা তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থের (تكمله فتح الملهم) এর 'কিতাবুল ইমারাতে'ও দেখতে পারেন।

বিখ্যাত হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম রহিমাহুল্লাহ 'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থে বলেন-

يَكْفُرُ إِذَا سَخِرَ... بِأَمْرٍ مِنْ أَوَامِرِهِ... أَوْ جَعَلَ لَهُ شَرِيكًا

> আর সে যদি আল্লাহর কোনো একটা বিধানেরও উপহাস করে, অথবা আল্লাহর সাথে শরিক বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করে, তবে কাফের হয়ে যাবে।[৩৮]

মনে রাখা দরকার যে, আইন প্রণয়নে কাউকে আল্লাহর শরিক বা সমকক্ষ বানানো কুফরে আকবার, যা মিল্লাত থেকে খারেজ করে দেয়। আর এখানে শুধু সমকক্ষই সাব্যস্ত করা হয়নি, বরং নাউযুবিল্লাহ (আইন প্রণয়নের) এই অধিকার পরিপূর্ণরূপে গায়রুল্লাহকে (সংসদ) দিয়ে দেয়া হয়েছে।

...وَكَذَا يَكْفُرُ الْجَمِيعُ لِاسْتِخْفَافِهِمْ بِالشَّرْعِ....

> এমনিভাবে তারাও কাফের, যারা শরীয়তকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে।[৩৯]... *[৮৬ প্রাগুক্ত]*

...وَلَوْ صَغَّرَ الْفَقِيهَ أَوْ الْعَلَوِيَّ قَاصِدًا الِاسْتِخْفَافَ بِالدِّينِ كَفَرَ

> আর শরীয়তকে অবেজ্ঞয় মনে করার কারণে ফকীহকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, এটাও কুফরি।[৪০]

ভেবে দেখুন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একজন আলেমের সম্মান কি আর একজন জজের মর্যাদা কি? শরীয়ত প্রবর্তনের দাবিদারদের সাথে কেমন আচরণ করা হয়? সময় সুযোগ হলে ইসলামী ধারার সাথে সম্পৃক্ত আদালতের কার্যক্রমের বিবরণ পড়ে দেখেন। আদালত এবং সংসদের মাঝে এ সব ইসলামী ধারাগুলোকে কিভাবে ঝুলে রাখা হয়। আদালত সংসদের দিকে ছুড়ে মারে, আর সংসদ ইসলামী নজরিয়াতি কাউন্সিলের দিকে। এগুলো ইসলামের সাথে উপহাস নয়?

কুফরে আকবারের ব্যাপক এবং সবচেয়ে ঘৃণ্য সুরত...

কুফরে আকবারের সবচেয়ে ব্যপক, কিন্তু ভয়ঙ্কর সুরত হল, আল্লাহর শরীয়তের মোকাবেলায় আরেকটি শরীয়ত প্রণয়ন। যা ফ্রান্সিসি, ইংরেজী, আমেরিকান এবং অন্যান্য শরীয়তের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবস্থার অধীনস্থ। এই অধীনস্ততাকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রবর্তন করা হয়েছে এবং ফয়সালার উৎস (Auhtority) সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর উপর ফয়সালা করার অঙ্গীকার নেয়া হয়। এর রক্ষা ও আনুগত্যের

---

[٣٨] البحر الرائق شرح كنزالدقائق : الجزء٥ باب احكام المرتدين. زين الدين ابن نجيم الحنفي (٩٢٦-٩٧٠هـ)

[৩৯] প্রাগুক্ত

[৪০] প্রাগুক্ত

উপর শপথ নেয়া হয় এবং এরই উপর কাজ করা আবশ্য করে দেয়া হয়েছে। আর যারা এর বিরোধিতা করবে, বিদ্রোহ করবে, তাদেরকে হত্যা করা হালাল (আইন সম্মত)। কেউ যদি চায় যে, সে আল্লাহর শরীয়তকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে বাস্তবায়ন করবে অথবা নিজে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে তাকে পিষ্ঠ করা হয়।

উল্লেখিত সুরত এমনি কুফরে আকবারের সব চেয়ে ঘৃণ্য সুরত হতে পারত। কিন্তু ইবলিশ আরও পরিশ্রম করেছে এবং তার কর্মিদের আশা দিয়েছে। তাদের এই অপকর্মকে তাদের সামনে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে উপস্থাপন করেছে। বিধায় এই কুফরি আরও উন্নতি লাভ করেছে এবং এমন এক সুরত লাভ করেছে, একজন কালেমাওয়ালা ব্যক্তি যার কল্পনাই করতে পারে না।

আল্লাহর বিরুদ্ধে অপবাদ ও মিথ্যা আরোপের দুঃসাহস

সেই নাপাক, নিন্দিত ও ঘৃণ্য সুরত হল, ইবলিসি এই জীবনব্যবস্থাকে ইসলামী ঘোষণা করা হয়েছে। যা স্পষ্ট লা শারিক আল্লাহর পবিত্র সত্ত্বার বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ ও মিথ্যাচার। কারণ এমন একটা বিষয়কে এই শয়তানরা আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছে যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়তম নবীর উপর নাযিল করেননি। আর তাদের নিকট এর কোনো দলিল-প্রমাণও নেই। কিন্তু প্রবৃত্তি ও জগতপূজারী, যিন্দেগীর গোলাম এবং আল্লাহর সাক্ষাত বিরাগী এসব নরাধমরা তাদের প্রভুদের নির্দেশে এই কুফরিকে ইসলামী বলতে অনঢ়। যারা এই তাগুতি আইনকে অস্বীকার করে, এদের নিকট তারা বিদ্রোহী। তাদেরকে হত্যা করা এবং তাদের ধন-সম্পদ লুট করা এদের নিকট বৈধ। তাদের পর্দানশীন নারীদেরকে তুলে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া 'এদের শরীয়ত' বৈধতা দিয়েছে।

আফসসোস, হায় আফসোস...! কিসের গর্বে তোমরা আল্লাহর সম্মুখে এভাবে বুক চেতিয়ে দাঁড়াও? কোন সাহসে তোমরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চাও? কিসের উপর ভিত্তি করে তোমরা আরস কুরসির মালিকের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করার দুঃসাহস কর?

দুনিয়ার তুচ্ছ পদের লোভ আর সামান্য সুখের আশায় মৃত দুনিয়ার পুতিগন্ধময় লাশ নিস্পেষনে তোমরাও তাদের দলে ভিড়েছ, যারা এ মৃত দুনিয়ার বিনিময়ে নিজেদের পরকালকে বিক্রি করে দিয়েছে?

يا للعجب يا للعجب!... وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

তার চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে।

এই অধ্যায়ের আলোচনা যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণ দীর্ঘ ছিল, তাই সুধী পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য পুরো আলোচনার সারকথা পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করা হল। এই অধ্যায়ে কৃত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহর শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোনো আইনে ফয়সালা করার দু'টি বড় সুরত হয়ে থাকে :

প্রথম সুরত :
মহাপাপ হলেও দীন থেকে খারেজ করার কারণ হয় না

১. সামগ্রিকভাবে শরয়ী নিযাম ও শরয়ী আইন প্রবর্তিত রয়েছে এবং এমন একজন কাযিও রয়েছেন, যিনি শরয়ী আইনকে ওয়াজিবুল আমল মনে করেন। এই আইন ত্যাগ করার কারণে নিজেকে গুনাহগারও মনে করেন। দুইয়েকটা ঘটনায় প্রবৃত্তি, স্বজনপ্রীতি অথবা ঘুষগ্রহণের কারণে শরীয়ত থেকে পাশ কেটে ফয়সালা করল। এটা যদিও মারাত্মক অপরাধ, কিন্তু একজন মানুষ এতটুকুর কারণেই দীন থেকে খারেজ হয়ে যায় না। এমন ব্যক্তি ফাসেক এবং জালেম সাব্যস্ত হয়। বেশির চেয়ে বেশি কুফরে আসগারে লিপ্ত মনে করা হয়।

২. পুরো বিচার ব্যবস্থা ও সরকার ব্যবস্থাটাই এমন যেখানে শরয়ী আহকাম সামগ্রিকভাবে প্রায় অকেজো। এর স্থলে মানুষের তৈরিকৃত আইন প্রবর্তিত রয়েছে এবং এতে জড়িত কাযি বা বিচারপতি মানবপ্রণীত আইন অনুযায়ীই ফয়সালা করে থাকে। কিন্তু এসব বিচারকরা নিজেদেরকে মারাত্মক পাপে লিপ্ত আছে বলে মনে করে। তারা এই ব্যবস্থার প্রতিও সন্তুষ্ট নয়। এরা শুধু এ নিয়তে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছে যে, ক্ষমতাসীনরা যেহেতু এ ছাড়া অন্য কোনো আইন প্রবর্তন করতে দিবে না। তাই জনগণের বৈধ অধিকার তাদেরকে দেয়ার জন্য বাধ্য হয়ে এ কাজ করছে। শরয়ী আইন প্রবর্তনের সুযোগ পেলে মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকবে না। শরয়ী আইন প্রবর্তনের পক্ষে কাজ করবে এবং সে অনুযায়ীই বিচারকার্য পরিচালনা করবে।

এমন ব্যক্তিরা কুফরে আসগারে লিপ্ত রয়েছে। এটাও গুনাহের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটা সুরত। তবে এটা দীন থেকে খারেজ হওয়ার কারণ হবে না। বরং এতে লিপ্ত ব্যক্তি ফাসেক এবং জালেম বিবেচিত হবে। এদের সাক্ষ্য গ্রীহীত হবে না। এই চাকরি করাও হারাম, এর বেতন ভাতাও হারাম।

দ্বিতীয় সুরত :
দীন থেকে খারেজ করে দেয়ার কারণ এবং কুফরে আকবার

১. শরয়ী নিযামের একজন কাযি বা বিচারক অন্যান্য সমস্ত কার্যক্ষেত্রে শরয়ী আহকাম ও বিধিবিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেন। কিন্তু এক বা একাধিক শরয়ী হুকুম উপযুক্ত শরয়ী ওজর ও কারণ ছাড়া দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অকেজো করে রেখেছে এবং তার স্থলে গায়রুল্লাহর তৈরিকৃত (মানব রচিত) আইন দ্বারা ফয়সালা করেছে। এটা কুফরে আকবারের অন্তর্ভুক্ত।

২. শরয়ী নিযামের একজন কাযি বা বিচারক অন্যান্য সমস্ত কার্যক্ষেত্রে শরয়ী আহকাম ও বিধিবিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেন। কিন্তু শরীয়তের এক বা একাধিক অকাট্য হুকুমকে তুচ্ছ জ্ঞান করা অথবা এই যুগের জন্য অচল মনে করে অথবা গায়রুল্লাহর (মানব রচিত) আইনকে এর চেয়ে উত্তম মনে করে শরয়ী হুকুমকে উপেক্ষা করে ফয়সালা করেছেন। এটা কুফরে আকবারের অন্তর্ভুক্ত।

৩. পুরো বিচার ব্যবস্থা ও সরকার ব্যবস্থাই এমন, যেখানে আল্লাহর শরীয়ত দলিলের মর্যাদাই রাখে না এবং শরয়ী আহকাম ও বিধিবিধান সামগ্রিকভাবে অকেজো। এর স্থলে মানব রচিত আইন প্রবর্তিত রয়েছে। কাযি বা বিচারক এই মানব রচিত আইন অনুযায়ীই ফয়সালা করে। আর এর জন্য নিজেদেরকে গুনাহগারও মনে করে না। এর পিছনে উপযুক্ত শরয়ী কোনো ওজর ও কারণও নেই। তো এরাও কুফরে আকবারে লিপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ এমন কুফরি যা দীন থেকে খারেজ করে দেয়। এটাই এ অধ্যায়ের আলোচনার সার কথা।

এ আলোচনা থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়েছে যে, পাকিস্তানের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা তার আইন ও মূলনীতির দিক থেকে একটি নিরেট শরীয়ত পরিপন্থি এবং কুফরি ব্যবস্থা। কারণ ৬৫ বছর ধরে এতে মানব রচিত আইন আল্লাহ তায়ালার শরীয়তের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। আল্লাহর আইনের চেয়ে মানব রচিত এই আইনের মর্যাদাই বেশি। সেই সাথে এর দ্বারা দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কুফরি হওয়া স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ শরীয়ত পরিন্থি আইন প্রথমে সংসদে তৈরি হয়। এরপর গিয়ে আদালত তা প্রবর্তন করে। সেই সাথে এর দ্বারা সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর বাতিল হওয়াও প্রমাণিত হয়। রাষ্ট্র এই তাগুতি আদালতকে তাদের একটি মৌলিক স্তম্ভ মনে করে। এদের কাজকে মুবাহ ও আইনসিদ্ধ বরং পবিত্র জ্ঞান করে। এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আইনত আবশ্যক হয়। এই দুষিত রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোকে ইসলামী বলা কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

থাকল জজ, উকিল এবং অন্যান্যদের হুকুমের বিষয়। এ বিষয়ের সারকথা তো উপরেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই সারকথার আলোকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির

(অমুকের ছেলে অমুক) উপর ফতওয়া দেয়া কয়েকটি বাক্যে সংক্ষিপ্তভাবে সম্ভব নয়। আর এখানে তা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। এটা বরং মুফতী সাহেবদের কাজ। তারা উপরে উল্লেখিত সুরতগুলো সামনে রেখে এই ব্যবস্থায় জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থা তদন্ত করার পর এর উপর শরয়ী হুকুম আরোপ করবে। এই আলোচনায় ব্যক্তিবিশেষের হুকুম বর্ণনা করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং এই ব্যবস্থার কুফরি হওয়া প্রমাণিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। বাকি থাকল এই ব্যবস্থার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিষয়। আমরা তদেরকে আন্তরিকভাবে এই আহ্বান করব যে, তারা এই ভয়ঙ্কর অপরাধকে ঘৃণ্য মনে করবেন। এর থেকে তাওবা করবেন এবং নিজেকে এই ঘৃণ্য পেশা হতে আলাদা করবেন। আর যদি এই কুফরি বিচার ব্যবস্থার অংশ হয়ে থাকার উপর অনড় থাকেন, তবে অন্ততপক্ষে এতে জড়িত থাকার বিষয়টিকে গুনাহের কাজ মনে করুন। এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করুন। হতে পারে আপনার এই কাজ কিছুটা হলেও আপনার অপরাধকে হাল্কা করবে... তবে জেনে রেখেন, যদি জড়িত থাকেন, তবে তা হবে এক ভয়ঙ্কর অপরাধ।

সেই সাথে এই আলোচনা সাধারণ মুসলমানদেরকেও আহ্বান করছে যে, আপনারা আল্লাহর শরীয়তকে উপেক্ষা করে ফয়সালার করার অপরাধকে ঘৃণ্য ও মন্দকাজ মনে করুন। এই জাহেলী বিচার ব্যবস্থা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখুন। নিজেদের সমস্যাগুলো ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে শরীয়ত অনুযায়ী করুন।

চতুর্থ অধ্যায়

গণতন্ত্রে শরিক ব্যক্তি ও দলের হুকুম

গণতন্ত্রে শরিক ব্যক্তি ও দলের হুকুম

বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূল গণতন্ত্র এবং তৃতীয় অধ্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কুরআন উপেক্ষা করে ফয়সালাকারী গণতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থার কুফরি হওয়া বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে। এখন দেখা যাক, যে সব ব্যক্তি ও দল এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে জড়িত, শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের হুকুম কি?

গণতন্ত্রের উপর আদ্যোপান্ত বিশ্বাসী ধর্মহীন রাজনীতিবিদ এবং সেনা অফিসারদের হুকুম

প্রশ্ন হল, এ কথা যখন প্রমাণিত হয়েছে যে, গণতন্ত্র একটি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দ্বীন বা মতবাদ, যা বুনিয়াদীভাবেই ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরোধী। তো দেশের এই ধর্মহীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে জড়িত সে সব অফিসার ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হুকুম কি হবে, যারা মুখে ইসলাম স্বীকার করার সাথে সাথে গণতন্ত্র নাম দীন বা মতবাদের উপরও ঈমান রাখে। নিজ মুখে তার ওপেন ঘোষণাও করে এবং গণতন্ত্রের ধর্ম রক্ষা এবং শরীয়ত প্রবর্তনকে প্রতিহত করার জন্য নিজেদের পুরো রাষ্ট্রশক্তিও ব্যবহার করে। এদের মুখে এই কালেমা পড়া কি কোনো কাজে আসবে? তাদের ইসলামের সাথে অন্য দীনকে পবিত্র মনে করা এবং তার প্রতি আনুগত্যের শপথ করা ইসলাম অস্বীকার ও কুফরিকে সম্মান করা নয় কি?

উত্তর : যারা ইসলামের সাথে সাথে অন্য দীনের উপরও ঈমান রাখে, শরীয়তে মুতাহহারা স্পষ্ট ও দ্ব্যার্থহীন ভাষায় এমন যে কোনো ব্যক্তিকেই কাফের বলে। এমন ব্যক্তিদের কালেমা পড়া তাদের কোনোই উপকারে আসবে না। কারণ যে ব্যক্তি এই কালেমা পড়ে এবং এরপরও দীন ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীনের সমর্থক, সে যেনো নিজ মুখে পঠিত কালেমার অস্বীকার করছে। বলা বাহুল্য, কোনো ব্যক্তি যদি মুখে ইসলাম এবং তার সমস্ত বিধি-বিধান স্বীকার করে, কিন্তু

এমন কোনো গুনাহ করে, যা ইসলামের গণ্ডি থেকে খারেজ করেন না, এমন ব্যক্তিকে মুসলমানই মনে করা হবে। কিন্তু এখানকার অবস্থা একদম ভিন্ন, যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রতিবাদ

বিষয়টি হয়ত এখনো কারো কারো বুঝে আসেনি। তাদের কথা হল, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচালকরা গণতন্ত্রকে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিপরীত মনে করে না। তাদের ঈমান কুরআনের উপরই। গণতন্ত্রকে শুধু রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করছে। সুতরাং এটা কুফরে আকবার নয়, কুফরে আসগার।

উত্তর : ঠিক আছে, আমরা আপনাদের দাবি মেনে নিলাম। এবার দেখা যাক, কুরআনের উপর এই শাসক শ্রেণীর ঈমান কোন মানের। আর এমন ঈমান সম্পর্কে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের ফয়সালা কি?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যাপারে এসব লোকদের বিশ্বাস হল, এই ব্যবস্থার অধীনে যে-ই আইন প্রণীত হবে, কেবল সেটাই দেশে বাস্তবায়নের উপযুক্ত এবং সমস্ত মানুষ এর অধীনেই জীবন যাপন করবে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য আবশ্যক হল, এর আনুগত্য করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা। কেউ যদি এই আইন ব্যতীত অন্য (কুরআনের) আইনের রক্ষণাবেক্ষণ ও পক্ষপাতিত্ব করে, অথবা সে অনুযায়ী ফয়সালা করে বা করায়, অথবা নিজের বিষয়গুলো কুরআন অনুযায়ী চালানোর চেষ্টা করে, তবে গণতন্ত্রের এই ব্যবস্থা তাকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করবে। সেনা ও পুলিশী শক্তি প্রয়োগ করে তাকে শেষ করে দেয়া হবে। আর এমন করা গণতান্ত্রিক শরীয়ত তথা গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার আলোকে হালাল ও আইনসিদ্ধ নয় শুধু বরং ফরজও (ডিউটিও)। যেই সেনা এবং পুলিশ এই 'কল্যাণকর্মে' অংশগ্রহণ করবে, তাকে পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। আর যে ব্যক্তি এই সেনা ও পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তাকে শিক্ষার উপকরণে পরিণত করা হবে। কেউ কুরআন পোড়ালে তাদের ক্রোধাগ্নি জ্বলে ওঠে না, কিন্তু কেউ গণতন্ত্রের পতাকা পোড়ালে এরা ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে ওঠে। কেউ যদি মুহসিনে ইনসানিয়াত, রহমাতুললিল আলামিন, আমাদের প্রিয়তম নবীজির বিরুদ্ধে কটূক্তি করে, তাকে নিয়ে ঠাট্টা ও উপহাস করে, তখন তারা শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষা শোনায়। কিন্তু তাগুতি ব্যবস্থা গণতন্ত্রের বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে যদি কেউ কটূক্তি করে, অবমাননা করে, তো গোটা শক্তি হামলে পড়ে। আল্লাহ প্রদত্ত আইনকে যদি কেউ হিংস্রতা ও পাশবিকতা বলার মত ধৃষ্টতা দেখায়, তারা সংসদেই বসে থাকে। কিন্তু কেউ যদি এই গণতান্ত্রিক তাগুতি আইনের বিরুদ্ধে মুখ খোলে, তাকে শুধু সংসদ থেকেই নয়

বরং পৃথিবী থেকেই বিদয়া করে দেয়া হয়। সংসদের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য যদি আল্লাহর শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য কোনো শাস্তি নেই। কিন্তু কোনো মুসলমান যদি এই ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে শরীয়ত প্রবর্তনের কথা বলে, তার পরিণত হয় জামেয়া এবং সোয়াতের মত। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সহযোগিতা করা, গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু কালেমার ভিত্তিতে বিশ্বের যে কোনো অঞ্চলে মুসলমানদের দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করা সন্ত্রাস। ফিলিস্তিনের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সহযোগিতার জন্য ফিলিস্তিনে সৈন্য প্রেরণ করা হলে পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়। আর কোনো মুজাহিদ যদি মজলুম ফিলিস্তিনিদের সাহায্যের জন্য যায়, তার ঠিকানা হয় কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠ। খেলাফতের বিরুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষ হতে লড়াই করা হালালম, আইন সম্মত। কিন্তু খেলাফত পুনর্জীবনের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হারাম, বেআইনী। মুসলমানদের গণহত্যাকারী আমেরিকানরা এখানে আসলে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এই ব্যবস্থার কর্মীদের ফরয (ডিউটি) হয়ে যায়। কিন্তু মুসলমান ভাইদের সাহায্যের জন্য রাসূলের বংশধর মক্কা-মদীনা থেকে এখানে আসলে, তাদের পর্দানশীন নারীরাও দানবীয় টার্গেটে পরিণত হয়। কাশ্মীর আমাদের... কিন্তু মুসলমানদেরকে সেখানে গণহত্যা করা হচ্ছে। এসব খুনিদের বিরুদ্ধে যদি কেউ এসব শাসকদের মর্জির খেলাফ জিহাদ করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ করা হয়। কাশ্মীরের মুসলমান ভাইয়েরা যখন নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার, ভারতীয় হিন্দুদেরা কি করে নিরাপত্তা পেতে পারে...?

এসব বিষয় প্রতিনিয়তই তারা বলে যাচ্ছে। (তাদের বয়ান-বিবৃতি খুলে দেখুন।) আর তাদের আমলও এর ব্যতিক্রম নয়। এজন্য শরীয়ত তাদের অন্তর চিড়ে দেখার নির্দেশ দেয় না। শরীয়ত তাদের বাহ্যিক কথা ও কাজের উপরই নির্দেশ দিয়ে থাকে।

শাসক শ্রেণীর কুফরি তো সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বের বিষয়।

আরও একটা প্রশ্ন হল, যেই ধর্মহীন রাজনীতি এবং সেনা নেতৃত্বের ব্যাপারে আপনি এ কথা বলছেন যে, তারা কুরআনের উপর ঈমান রাখে। তাদের অবস্থা এই যে, ক্ষমতা ও ঔদ্ধত্যের বলে তারা এই কুরআইনের প্রবর্তন প্রতিহত করে যাচ্ছে। আর এটা এক দুই বছর থেকে নয়... পুরো পয়ষট্টি বছর থেকে! সুতরাং আপনি যদি তাদের কুফরে জুহুদ (অস্বীকারের কুফরি) না বলেন, তাদের কুফরে ইনাদ (হঠকারিতার দরুন কুফরি) হওয়ার ব্যাপারে কি কোনো সন্দেহ রয়েছে? তাদের কথা ও কাজ এই বিষয়ই প্রমাণ করে যে কুরআন হাদীসের আইন, নিয়ম-নীতি, শরয়ী জীবনব্যবস্থা এবং শরীয় প্রবর্তনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও শত্রুতা রয়েছে। আর এই কুফরে ইনাদ তথা বিদ্বেষ ও হঠকারিতা বশত কুফরি 'মুখরিজ আনিল

মিল্লাহ তথা এগুলো ইসলামের গণ্ডি থেকে খারেজ করে দেয়। কারণ ইসলামের যে কোনো হুকুমের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা, অপছন্দ করা, বিনা কারণে ইসলামের নির্দেশ পালন করতে তালবাহানা করা কিংবা এর বিরোধিতা করা কুফরি। আর এখানে তো পাক্কা সত দশক ধরে শরীয়ত প্রবর্তন করতে বাধা দিয়ে আসছে। আর যদি কিছুটা শিথিলতা করাও হয় তবু শরীয়ত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা অর্থাৎ শরীয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়নে বিলম্ব করা, টালবাহানা করা তো স্পষ্ট। আর এটাও কুফরে আকবারের এক প্রকার।

আর কুরআন ও ইসলামের সত্যতা বিশ্বাস করা ও স্বীকার কারার যে বিষয়... এটা ইহুদীরাও করত। কিন্তু বিদ্বেষ ও গোঁড়ামীবশত নিজেদের বিকৃত ধর্মের উপরই অটল থাকত। বিকৃত ধর্মকে তারা ছাড়ত না। একই অবস্থা আমাদের উপর চেপে থাকা শাসক শ্রেণীরও। যদিও তারা জানে যে কুরআনের আইন হক এবং সত্য। মুখে তারা এ কথা স্বীকার করে। এমনকি ব্যক্তি জীবনে এর কিছু কিছু বিধানের উপর আমলও করে। কিন্তু এর মোকাবেলায় যখন গণতান্ত্রিক আইন আসে, কুরআনের আইন প্রত্যাখ্যান করতে এবং প্রতিহত করতে শক্তি প্রয়োগ করা হালাল ও বৈধ মনে করে। শরীয়তপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে জিহাদ বলে। কালেমাওয়ালা মুসলমানদের জান-মাল নিজেদের জন্য বৈধ করে নেয়। কুরআনের আইন প্রবর্তনের দাবিদারকে বিদ্রোহী বলঅ হয়। অথচ বাস্তবতা হল তারা নিজেরাই ইসলামদ্রোহী।

এই শ্রেণীর সুরতহাল গভীরভাবে পূর্নবিবেচনার পর আপনারাই ইনসাফের সাথে ফয়সালা করুন যে, তাদের ঈমান কুরআনের উপর নাকি তারা নিজ হাতে যা চয়ন করেছে তার উপর? এরা নিজেরা যা কিছু চয়ন করে তাই বাস্তবায়নযোগ্য, সেটাই সংবিধান, সেটাই আইন। এর আলোকেই আদালত চলে। এরই জন্য সেনাবাহিনী, এরই জন্য পুলিশ বাহিনী, মিডিয়াও এর দাসত্বের দিকে জনগণকে আহ্বান করতে থাকে। পরের বারও এই বুতখানার তাওয়াফ করা, এরই জন্য দৌড়ঝাপ, এরই প্রতিবেশি হওয়ার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, যাতে (সংসদে) সেই ইলাহ, সেই মা'বুদ এবং সেই মূর্তি তৈরি করা হয়েছে, আল্লাহর মোকাবেলায় যাকে পূজা করা হয়ে থাকে।

সুতরাং হে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম! কোনো শাসক কুরআনের উপর ঈমান রাখার সাথে সাথে অন্য কোনো শরীয়তের উপরও ঈমান রাখে, নিজের জন্য অন্য কোনো জীবনব্যবস্থাও আবশ্যক মনে করে– চাই সেটা তাওরাত বা ইনজিলের শরীয়তই হোক না কেনো– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে কি এর অনুমতি রয়েছে? কুরআনের উপর ঈমান রাখার দাবিদার হবে আর গণতন্ত্রের জীবনব্যবস্থা (অথবা অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা) প্রবর্তন করার উপর অনড় থাকবে,

আর এই দর্শন প্রচার করে বেড়াব যে এই যুগে এই জীবনব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নযোগ্য নয়। এই দর্শন যাদের বিশ্বাস... তাদের হুকুম কি? এমন সংসদ সদস্য, সেনা অফিসার এবং বিচারপতিদের হুকুম কি, যারা কুফর এবং ইসলামের মিশ্রিত আইনকে পবিত্র ঘোষণা করে? তার বাস্তবায়নকে নিজেদের মৌলিক দায়িত্ব এবং নিজেদের চেয়ারের বুনিয়াদী উদ্দেশ্য মনে করে।

মোনাফেক ও মুনকিরের পার্থক্য লক্ষ্য রাখা

মুসলিম দেশগুলোর দীনদার শ্রেণী উপরে উল্লেখিত শ্রেণীর ব্যাপারে এ কথা বলে যে, এই শ্রেণী বেশির চেয়ে বেশি মোনাফেক। এর স্বপক্ষে তারা মদীনার মোনাফেকদের দৃষ্টান্ত টানে। তারা বলে, রাসূলে কারীম নিজেও মোনাফেকদের সাথে কাফেরদের মত আচরণ করেননি।

আপনি যদি মদীনার মোনাফেকদের অবস্থা অধ্যায়ন করেন তো আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, তাদের এই দাবিই ভ্রান্ত যে, শরীয়ত অস্বীকারকারী শাসক শ্রেণী মদীনার মোনাফেকদের মত। মদীনার মোনাফেকরা প্রকাশ্যে কুরআনের কোনো হুকুম অথবা আইনকে অস্বীকার করেনি। এমনকি জিহাদে না যাওয়ার জন্য বাহানা তো অবশ্যই বানাত, কিন্তু জিহাদ সম্পর্কে এমন বলত না যে, আমরা সশস্ত্র জিহাদের বৈধতার পক্ষে নোই। আমরা এর সমর্থন করি না। তারা এ কথাও বলেনি যে, আমরা আমাদের ফয়সালা কুরআনের পরিবর্তে অন্য কোনো আইন দিয়ে করব। তারা প্রস্তারাঘাত ও বেত্রাঘাতের মত ইসলামী আইনকেও অস্বীকার করেনি। তারা নামায সম্পর্কেও এ কথা বলেনি যে, নামায প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয়, ইচ্ছা করলে পড়বে, ইচ্ছা করলে পড়বে না। অথব বর্তমানের শাসক শ্রেণী, যারা আজ এই উম্মতের উপর চেপে বসে আছে, এগুলো প্রকাশ্যে বলেও বেড়ায় আবার এর উপর আমলও করে। সুতরাং এভাবে যারা বলে থাকে, তারা মোনাফেক নয়, তারা মুনকিরে শরীয়ত, তারা শরীয়ত অস্বীকারকারী। আর যদি নিজেদের এই ভ্রান্ত চিন্তাধারাকেই ইসলাম বলতে হঠকারিতা করে, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে এরা মুলহিদ অথবা যিন্দিক বলা হবে।

গণতন্ত্র কি মুহাম্মাদ সা. এর শরীয়ত থেকে উত্তম

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম? *[সূরা মায়েদা : ৫০]*

এর তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সে সব লোকদেরকে খণ্ডন করেছেন যারা এই সুদৃঢ় আইন– যাতে রয়েছে বহুমুখী কল্যাণ এবং অনিষ্ট প্রতিরোধের সুব্যবস্থা– থেকে বের হয়ে যায়। এই আইন থেকে বের হয়ে এমন কোনো আইন গ্রহণ করে, যা নিছক মানুষের মতামত, অভিলাষ এবং এমন সব পরিভাষা কেন্দ্রিক, মানুষ যা শরীয়তে ইলাহীকে পাশ কেটে তৈরি করে নিয়েছে। যেমন জাহেলী যুগের লোকেরা ভ্রষ্টতা ও মূর্খতার দ্বারা ফয়সালা করত। যেগুলো তাদের ব্যক্তি মতামত এবং প্রবৃত্তির দ্বারা গঠিত ছিল। যেমন তাতারি চেঙ্গিস খানের তৈরিকৃত রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক আইনে ফয়সালা করত। যাকে ইয়াসিক বলা হত। এটি ছিল বিভিন্ন শরীয়ত (জায়নবাদ, খ্রিস্টবাদ এবং ইসলাম) থেকে চয়িত আইনের সমষ্টি। এতে এমন অনেক আইন ছিল, যা শুধুই ধারণা এবং প্রবৃত্তির চাওয়াপাওয়ার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল। তার সন্তানদের মধ্যে এই আইনের উপর আমল হতে থাকে। আদালতে এরা এই আইনকে কুরআন এবং সুন্নাহ থেকেও অনেক বেশি প্রাধান্য দিত। অতএব এদের (তথাকথিত মুসলমানদের) মধ্যে হতে যারা এমন করেছে, তারা কফের। তাদেরকে কিতাল করা ওয়াজিব। যতক্ষণ না তারা শরীয়ত প্রবর্তনের পথে ফিরে না আসে। এজন্য শরীয়ত ভিন্ন অন্য কোনো আইনে কোনো ফয়সালা করানো যাবে না, চাই তা ছোট মামলা হোক কিংবা বড় মামলা হোক।

ফকিহ ইমাম আবু লাইস সমরকন্দি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তাফসীরে বলেন–

يعني : يطلبون منك شيئا لم ينزله الله اليك في حكم الزني والقصاص كما يفعل أهل الجاهلية

যেনা এবং কিসাসের তারা আপনার নিকট জাহেলী যুগের মানুষের মত তার (আইন) দাবি করে যা আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর নাযিল করেননি।

আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তাফসীরে বলেন–

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাজত্ব, রহমতে কামেলা এবং ইলমে মুহিত-এর উপর পরিপূর্ণ ইয়াকিন রাখে, তার নিকট দুনিয়ার কারো হুকুমই আল্লাহর হুকুমের দিকে মনোযোগ দেয়া কিংবা ভ্রুক্ষেপযোগ্য হতে পারে না। আহকামে ইলাহিয়্যাহর আলো

আসার পরও কি এরা ব্যক্তি মতামত, প্রবৃত্তির কামনা বাসনা এবং কুফরি ও জাহেলিয়াতের অন্ধকারের দিকে যাওয়া পছন্দ করে?

দীনি মাদরাসাগুলোর তালেবে ইলমরা! হে তাওহীদের ফরজন্দরা! আসলাফ প্রশ্ন করছেন, আহকামে ইলাহিয়্যাহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাওহীদের সন্তানেরা সেই শরীয়তের দিকে ফিরে যাওয়া পছন্দ করবে, যেই শরীয়ত ও জীবন বিধান সংসদে বসা বদকার, মদ্যপায়ী, লুটেরা এবং জামেয়া হাফসার তোমাদের বোনদের খুনিরা অনুমোদন করেছে? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীয়ত আসার পর আপনি এই বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চুপ থাকবেন, যেখানে গায়রুল্লাহর তৈরিকৃত (মানব রচিত) আইনকে সম্মানিত মনে করা হয়? আপনারা কি সেই আইন পবিত্র মনে করবেন যা আল্লাহর আইনের মোকাবেলায় প্রণয়ন করা হয়েছে এবং যার ইবাদত ও দাসত্ব করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে? একদিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত প্রবর্তনের দাবিদার আর অন্যদিকে ইবলিসি নিযাম ও তাগুতি জীবনব্যবস্থা রক্ষাকারী শক্তি.... । আসলাফ জিজ্ঞাসা করছে যে, তোমরা কার পক্ষে যাবে? কাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে? কিয়ামতের দিন কাদের কাতারে উঠতে চাও?

আল্লাহর লানত থেকে বাঁচুন

يكون في آخر الزمان قوم يحضرون السلطان فيحكمون بغير حكم الله

. ولا ينهونه فعليهم لعنة الله.

আখেরী জামানায় এমন জাতি আসবে যারা শাসকদের নিকট যাবে। তাদের (শাসক) রাষ্ট্রব্যবস্থা হবে আল্লাহর আইন থেকে ভিন্ন। এরা সে সব শাসকদেরকে এর থেকে নিষেধ করবে না। এদের উপর আল্লাহর লানত।[৪১]

يكون عليكم أمراء ان عصيتموهم قتلوكم وان أطعتموهم أكفروكم

তোমাদের উপর এমন শাসকবর্গ থাকবে, তোমরা যদি তাদের কথা না শোনো, তারা তোমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। আর

---

[৪১] كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، الجزء ٣، الفصل الثاني، في تعديد الأخلاق المحمودة، علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري (المتوفى: ٩٧٥ هـ)

যদি তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমাদেরকে কাফের বানিয়ে দিবে।[৪২]

ইচ্ছার ভিত্তিতে আল্লাহর শরীয়ত অস্বীকার

আল্লাহর শরীয়ত অস্বীকার করার একটা সুরত এটাও যে, মানুষ সব কিছু জানার সত্ত্বেও শুধু খাহেশাতের ভিত্তিতে হককে অস্বীকার করে এবং বাতিলকে বাতিল জানার পরও তা স্বীকার করা হতে বিরত থাকে না। আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলের অবস্থা চিত্রায়ন করতে গিয়ে বলেন–

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

তবে কি তোমাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখন তোমরা অহঙ্কার করেছ, অতঃপর (নবীদের) একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ আর একদলকে হত্যা করেছ। *[সূরা বাকারা : ৮৭]*

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে অধিক পছন্দ করে, আর আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতার সন্ধান করে; তারা ঘোরতর ভ্রষ্টতায় রয়েছে। *[সূরা ইবরাহীম : ৩]*

দুনিয়ায় বিলাসিতা করা, পদের স্বাদ উপভোগ করা, গ্রেফতারীর ভয়ে বাতিলকে হক প্রমাণিত করা, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে বাঁচানোর জন্য চিরস্থায়ী পরকালকে বিক্রি করাকে কৌশল (মুসলিহাত) নাম দেয়া– এটাই দুনিয়ার মোহ, এটাই দুনিয়ার ভালোবাসা। আর আল্লাহর রাস্তা হতে বিরত রাখা হল– আল্লাহর দীন প্রবর্তন করতে না দেয়া। শরীয়তের হিদায়াতের বিপরীতে গণতন্ত্রের ভ্রষ্টতাকে পছন্দ করা। গণতন্ত্রের কুফরির বন্দনা গাওয়া আর শরীয়ত প্রবর্তনের পদ্ধতিতে খুঁত বের করর চেষ্টা করা।

আল্লামা জমখশরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধিবিধান অস্বীকার করে গায়রুল্লাহর বিধিবিধান গ্রহণ করে, সে প্রবৃত্তির অনুসারী। *[তাফসীরে কাশশাফ]*

---

[৪২] رواه الديلمي عن عبادة بن الصامت

মুহাম্মাদ ইবনে সীরিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

ان أسرع الناس ردة أهل الاهواء

মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তিপূজারীরাই সব চেয়ে দ্রুত মুরতাদ হবে।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ইকফারুল মুলহিদীন' গ্রন্থে বলেন–

কুফরির নতুন এক প্রকার হল, প্রবৃত্তিপূজা ও ঔদ্ধত্যের ভিত্তিতে অস্বীকার করা।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আসসারিমুল মাসলুল' (الصارم المسلول) গ্রন্থের ৫২৪ পৃষ্ঠায় বলেন–

> কখনো অস্বীকার ও মিথ্যাবাদী প্রতিপাদন (গ্রহণ না করা) এসব বিষয়ে ইয়াকিনি ইলম ও নিশ্চিত জ্ঞান থাকার পরেও– যার উপর ঈমান আনা আবশ্যক– শুধু ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতা অথবা প্রবৃত্তিরপূজার কারণে হয়। আর বাস্তবে এটা কুফরি। কারণ এ ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সম্পর্কে যা যা সংবাদ দেয়া হয়েছে, তার সবই জানে। মনে মনে সে সব বিষয় সত্যায়নও করে, যা মুমিনরা সত্যায়ন করে থাকে। কিন্তু শুধু এ কারণে যে (আহকামে শরইয়্যাহ) তার চাওয়া পাওয়া এবং প্রবৃত্তির অনুযায়ী হয় না। এটা পছন্দ করে না বরং এর প্রতি নাখোশ, নারাজ। আর বলে, 'আমি তো ওগুলো বিশ্বাসও করি না এর পাবন্দিও করি না। আমি তো এই হককে ঘৃণার চোখে দেখি।' অতএব এটা কুফরির নতুন এক প্রকার (অন্তরে ঈমান আর মুখে কুফরি) যা প্রথম প্রকার থেকে ভিন্ন। আর দীনের মূলনীতির আলোকে এর কুফরি হওয়া অকাট্যভাবে জানা আছে। কুরআন এ প্রকারের নাফরমান ও অহঙ্কারীদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে। বরং অন্য কাফেরদের তুলনায় এদের শাস্তি আরও বেশি মর্মন্তুদ।'

এজন্য যে ব্যক্তিই গণতন্ত্রের কুফরিকে ভালোভাবে চিনেছে এবং শরীয়ত প্রবর্তনের হকপথকেও জেনেছে, তার জন্য উচিত, ঈমানের দাবি পূরণ করে হককে হক আর বাতিলকে বাতিল স্বীকার করা এবং নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তার প্রকাশ্যে ঘোষণা করা।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে থেকে একনিষ্ঠভাবে শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করা

যদি এ কথা বলা হয় যে, যারা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামী নিযাম ও জীবনব্যবস্থার জন্য তৎপর, তারা তো মুখলিস। এজন্য কি তারা প্রতিদান পাবে?

এমন মনে করা নফসের ধোঁকা এবং শয়তানী অপকর্মকে তাদের সামনে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে উপস্থাপন করা। যে কোনো কাজ যা ভালো উদ্দেশ্যে ইখলাস এবং বিশুদ্ধ নিয়তে করা হয়, আল্লাহর কাছে তা কবুল হয়। তাহলে কাফেরদের মূর্তি পূজার আমলকে কুফরি বলা হয়েছে কেনো? তারা তাদের ধারনা অনুযায়ী আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিমিত্তেই এসব মূর্তির পূজা করত। তারা বলত هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ মূর্তিগুলো আমাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট সুপারিশক রে। /৯১ *সূরা ইউনুস: ১৮]*

তারা আরো বলত مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ আমরা তো কেবল এই মূর্তিগুলো এজন্য পূজা করি যে, এ মূর্তিগুলো আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল বানিয়ে দিবে। *[সূরা যুমার : ৯২]*

এরা তো এ মূর্তিগুলোকে এ কারণেই পূজা করত যে, এরা মূর্তিগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যশীল হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের আমলকে কুফর বলেছেন।

একটা বিষয় খুব ভালো করে বুঝে নিবেন যে, কোনো আমলকে ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তম আমল বা নেক কাজ বলা যায় না, যতক্ষণ না তার ভেতর দুটি জিনিস পাওয়া না যায়। এক. আমলটি আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে হতে হবে। দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের তরিকা অনুযায়ী হতে হবে। এই জিনিস দুটি কারো আমলের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে তার সেই আমল উত্তম আমল বা নেক কাজ বিবেচিত হবে।

ফুযাইল বিন ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

العمل الحسن هو أخلصه ، وأصوبه . قالوا : يا أبا علي ! ما أخلصه ، وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل ، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل ؛ حتى يكون خالصًا صوابًا . والخالص ما كان لله ، والصواب ما كان على السنة .

নেক আমল হল যা ইখলসওয়ালা হয় এবং সঠিক হয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে আবু আলী! ইখলাসওয়ালা এবং সঠিক আমল কোনটি? (ফুযাইল বিন ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বললেন, নিঃসন্দেহে আমল যদি খালেস হয় কিন্তু সঠিক না হয়, তা কবুল করা হয় না। আর যখন সঠিক হয় কিন্তু খালেস হয় না, সেটাও কবুল করা হয় না। খালেস আমল হল সেটা, যা শুধু আল্লাহর জন্য হয়। আর সঠিক আমল হল সেটা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী হয়।[৪৩]

প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

কোনো ব্যক্তি এমন আমল করল, যে ব্যাপারে আমার নির্দেশ নেই, তা কবুল করা হবে না।[৪৪]

আর আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا

আর তারা যে কাজ করেছে আমি সেদিকে অগ্রসর হব। অতঃপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেব। *[সূরা ফুরকান : ২৩]*

হাফেয ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর তাফসীরে বলেন–

فكل عمل لا يكون خالصا وعلي الشريعة المرضية فهو باطل...

যেই আমল ইখলাসপূর্ণ হবে না এবং আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী হবে না, তা বাতিল।

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন–

---

٤٣ جهود علماء الحنفية في ابطال عقائد القبورية : الفصل الرابع : في جهود علماء الحنفية في تعريف العبادة' وبيان أركانها' وأنواعها' وشروط صحتها' وابطال عقيدة القبورية في ذلك كله' المبحث الثالث : في أركان العبادة' وأنواعها' وشروط صحتها عند علماء الحنفية' وردهم علي القبورية في ذلك كله' المطلب الثالث : في صحة شروط العبادة ' أبو عبدالله شمس الدين بن محمد أشرف قيصر الأفغاني (المتوفي : ١٤٢٠ هـ)

٤٤ الصحيح لمسلم : الجزء ٩ . كتاب الأقضية' باب نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ . عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ . تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً . تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ .

> সেদিন অনেক চেহারা হবে অবনত। কর্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে। *[সূরা গাশিয়া : ২-৫]*

এই আয়াতের উদ্দেশ্য হল, পৃথিবীতে অনেক মানুষ এমন কাজ করে, যেগুলোকে তারা সাওয়াবের কাজ মনে করে। রাত-দিন তারা নিজেকে সেই কাজে ব্যতিব্যস্ত রাখে। কিন্তু তাদের সেই কাজ যেহেতু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরারেম অনুসৃত পন্থায় হয় না, এজন্য তা আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয় না।

সূরা কাহাফে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا . الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

> বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত'? বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত'? [সূরা কাহাফ : ১০৩]

এমনিভাবে সূরা নিসায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا

> সুতরাং তখন কেমন হবে, যখন তাদের উপর কোন মুসীবত আসবে, সেই কারণে যা তাদের হাত পূর্বেই প্রেরণ করেছে? তারপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করা অবস্থায় তোমার কাছে আসবে যে, আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ভিন্ন অন্য কিছু চাইনি। *[সূরা নিসা : ৬২]*

ইমাম শওকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

(মোনাফেকরা বলত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাদ দিয়ে ফয়সালার জন্য অন্যের নিকট যাওয়ার পিছেন আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ভালো। খারাপ কোনো অভিপ্রায় ছিল না আমাদের। এখানে উভয় ঝগড়াকারীর মাঝে সমঝোতা করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করা নয়। *[ফাতহুল কাদীর]*

অনৈসলামিক পন্থায় ইসলামের বিজয় সম্ভব নয়

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ

> আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। *[সূরা নিসা : ১১৫]*

আল্লামা ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর তাফসীরে বলেন–

ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فصار في شق

> যে কোনো ব্যক্তিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তের পথ ছেড়ে অন্য কোনো পথে চলবে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় লিপ্ত হল।

অনইসলামী পথে ইসলাম কিভাবে আসতে পারে? তারা তো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ ছেড়ে দিয়ে তাঁর বিরোধিত লিপ্ত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়, ইহ-পরকালে কেউ কি তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে? কবির ভাষায় এদের পরিণত হল–

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم

نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

না খোদাকে পেল না দেবতাকে। সে তো একূলও হারাল ওকূলও হারাল।

ইচ্ছা করলে দু চোখ খুলে দেখে নিতে পারেন। আলজেরিয়া থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের অসংখ্য উপাখ্যান ছড়িয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের পথ পাশ কেটে যারা ইসলামী বিপ্লব আনতে চেয়েছে, তারা কি পেয়েছে? আলজেরিয়ার পর এখন মিশরের বিভীষিকাময় ট্রাজেডিও আমাদের সামনে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি দেশে কোনো

কোনো শক্তি ইসলামের নামে ক্ষমতা লাভ করেছে। কিন্তু ইসলাম এখনো গণতন্ত্রের পার্লামেন্টের মুহতাজ। ইসলাম অনুমোদন করার জন্য আগে যেভাবে দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিতে হত, হোঁচট খেতে হত, বিপ্লব ঘটার পরও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত পার্লামেন্টের অনুমোদনের মুহতাজ হয়ে আছে। সুতরাং মনে রাখতে হবে যে, নামসর্বস্ব ধর্মীয় কোনো দলের ক্ষমতা পাওয়ার নাম ইসলামী বিপ্লব নয়। ইসলামী বিপ্লবের নজির দেখতে হলে আগফগানিস্তানের তালেবানদের নেযাম দেখে নিন।

ইবনে জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তাফসীরে বলেন–

> ويتبع غير سبيل المؤمنين". يقول: ويتبع طريقًا غير طريق أهل التصديق، ويسلك منهاجًا غير منهاجهم، وذلك هو الكفر بالله، لأن الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم
>
> আর ঈমানদারদের পথ ব্যতীত অন্য পথে চলা, তাদের মানহাজ ও পন্থা বাদ দিয়ে অন্য মানহাজ গ্রহণ করা, এটা আল্লাহর সাথে কুফরি করা। কারণ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি করা ঈমানদারদের পথ এবং তাদের মানহাজ নয়।[৪৫]

এই গণতন্ত্র বাতিল হওয়ার জন্য এতটুকুই কি যথেষ্ট নয় যে, এটা সাহাবায়ে কেরামের পথ নয়? এলায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য এই পবিত্র জামাত কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর পথ অবলম্বন করেছেন। আর গণতন্ত্র তো এই কিতাল ফি সাবিলিল্লাহকে হারাম বলে।

نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى এর মর্ম এবং গণতান্ত্রিকদের জন্য শিক্ষা

আল্লামা ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মর্ম ইহা বর্ণনা করেছেন যে–

> কেউ যখন (শরীয়তের এই পথ বাদ দিয়ে) অন্য পথে চলে, আমি তাকে সেই পথেই পরিচালিত করি। তার অন্তরে এই পথকে মনোহর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত বানিয়ে দেই। প্রলুব্ধ করণার্থেই এমনটি করা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– ‘অতএব, যারা এই কালেমাকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার

---

٤٥ جامع البيان في تأويل القران : الجزء ٩ . محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي' أبو جعفر الطبري

> হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে পারবে না।।' *[সূরা কলম : 88]*

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন– 'তারা যখন সন্দেহে পড়েছে, আল্লাহ তায়ালাও তাদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। *[সূরা আস-সাফ : ৫]*

কাযি সানাউল্লাহ পানি পতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

أي نجعله في الدنيا واليا لما تولي من الضلال

তারা যেই ভ্রষ্টতা অবলম্বন করেছে, পৃথিবীতে আমি সেই ভ্রষ্টতাকেই তার মিত্র বানিয়ে দিয়েছে। *[তাফসীরে মাযহারী, সূরা নিসা : ১১৫]*

খেলাফত প্রতিষ্ঠা ছেড়ে এই কুফরি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লিপ্ত লোকদের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার এটাই কারণ, আল্লাহ তায়ালা যা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন। শয়তান তাদের কাছে গণতন্ত্রের এই পথকে এমন মনোহর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে উপস্থাপন করেছে যে, তারা এটাকে ত্যাগ করার কথা কল্পনাই করতে পারে না। হ্যাঁ যাদের অন্তরে সত্যের অনুসান্ধিৎসা রয়েছে, তারা এর ব্যতিক্রম।

গণতন্ত্রের পতাকা উত্তোলন করা হরাম

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

> যে ব্যক্তি মুখ থুবড়ে পড়া পতাকার (অর্থাৎ যার হাকিকতই মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়) অধীনে কিতাল করল, কোনো গোঁড়ামির কারণে ক্রোধান্বিত হল অথবা কোনো সাম্প্রদায়িকতার দিকে মানুষকে আহ্বান করল অথবা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে কাউকে সাহায্য করল এবং (এ কাজগুলো করতে গিয়ে) মারা গেল, তার মৃত্যু হল জাহেলিয়াতের মৃত্যু।[৪৬]

[٤٦] الصحيح لمسلم : الجزء ٩ . كتاب الامارة' باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج علي الطاعة ومفارقة الجماعة

দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতীয়ে আযম মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া'য় ৭৪৫১ নাম্বার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, (প্রশ্নটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত) :

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা ছিল ইসলামকে বুলন্দ করার জন্য এবং কুফরকে পরাজিত করার জন্য। আপনার নির্বাচনেও কি এটাই উদ্দেশ্য? এসব দলগুলোর পারস্পারিরক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি ইসলাম ও কুফরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতই? তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পতাকাকে ইসলামী পতাকা এবং অন্যের পতাকাকে কুফরি পতাকা সাব্যস্ত করবে? (আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পানাহ দিন।) আর প্রচলিত এই নির্বাচন কি ইসলামী শিক্ষা ও দিকনির্দেশান অনুযায়ী হচ্ছে? এখানে কি ইসলামী আহকাম ও এবং শরয়ী হুদুদের পক্ষপাতিত্ব (রেআয়াত) করা হচ্ছে? পরস্পরের বিরুদ্ধে লাঞ্ছনা, অবমাননা, মিথ্যা, পরনিন্দা, উপহাস, অপবাদ আরোপ... এমন কোনো ঘৃণ্য অস্ত্র নেই, যা ব্যবহার করা হয় না। অনেক সময় তাকফীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপরও ইসলামী পতাকার অধীনে এগুলো করা এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ পতাকাকে ইসলামী পতাকা বলা অত্যন্ত দোষণীয় এবং ইসলামকে কলঙ্কিত করা।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কুফরি কিন্তু এর সাথে জড়িত সবাই কাফের নয়

এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই যে, গণতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র দীন ও জীবনব্যবস্থা। এটা আল্লাহ এবং তার রাসূলকে স্পষ্ট অস্বীকার করা। কিন্তু এর থেকে এই উদ্দেশ্য নেয়া কখনোই সঠিক হবে না যে, যে ব্যক্তিই এর সাথে জড়িত থাকবে, তাকেই চোখ বন্ধ করে কাফের ফতওয়া দেয়া হবে। কারণ কোনো ব্যক্তির কথা ও কাজ কুফরি হওয়া এক বিষয় আর ওই কথা ও কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে খোদ ওই ব্যক্তিকে কাফের সাব্যস্ত করা আরেক বিষয়। এই স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য না রাখার কারণে এবং ব্যক্তির উপর কুফরির হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে অসাবধনতা থেকে অতিরিঞ্জনের (গুলু) জন্ম নেয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে এই উম্মতের ধ্বংসের কারণ বলেছেন। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লঅহজু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

হে লোক সকল! সাবধান! দীনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচো। কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে দীনের

মধ্যে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনই ধ্বংস করেছে। *[সুনানে ইবনে মাজা : ১০১, কিতাবুল মানাসিক]*

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে এটি একটি স্বতন্ত্র আলোচনা। যাকে 'তাকফিরে মুতলাক' এবং 'তাকফিরে মুআইয়িন' বলা হয়। এর সতর্কতার বিষয়গুলোও ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন।

১. তাকফিরে মুতলাক : কুফরি কোনো কথা ও কাজ সম্পর্কে এ কথা বলা যে, এটা কুফর। এতে কথা ও কাজের সাধারণ হুকুম বর্ণনা করা হয়। কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করা হয় না।

২. তাকফিরে মুআইয়িন : কুফরি কোনো কথা বা কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে কাফের বলা। এখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর হুকুম দেয়া হয়।

নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কাফের সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সতর্কতা

মাওয়ানেয়ে তাকফির দ্বারা উদ্দেশ্য এমন প্রতিবন্ধক যা কুফরিতে লিপ্ত কোনো ব্যক্তিকে কাফের হওয়া থেকে বাঁচায়। কুফরি কোনো কথা বা কাজ যদি কোনো মুসলমান থেকে প্রকাশ পায়, শরীয়ত তৎক্ষণাৎ তার কাফের হওয়ার হুকুম লাগায় না। বরং কিছু সময় মুলতবি রাখে। অর্থাৎ একজন মুসলমান কুফরি কথা বা কাজ করলে তাকে সাথে সাথে কাফের বলে না। এই সুরতেও এমন কিছু বিষয় থাকে, যা তাকে কাফের হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। এখানে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাওয়ানে বা প্রতিবন্ধকের প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করছি।

১. ওজরে জাহাল। অর্থাৎ অজ্ঞতাবশত এমন কথা বলা বা এমন কাজ করা :

কোনো মুসলমান কথা বা কাজে কুফরিতে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক সুরতে জাহালাত বা অজ্ঞতা কাফের সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হতে পারে। আহলে ইলমগণ ফতওয়ার উসুল এবং আদবের ভেতর এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। বিশেষত গণতন্ত্রের মত ধোঁকাময় ব্যবস্থার আলোচনায় যেখানে গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ এবং তার শরয়ী হুকুমের ব্যাপারে অজ্ঞতার অজস্র কারণ বিদ্যমান। অনেক বিখ্যাত আলেম এর পক্ষে ফতওয়া দিয়েছেন, যার কারণে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়েছে। ক্ষমতা বলে গণতন্ত্রের বিরোধিতাকারী আলেমদের গলা চেপে ধরে তাদের আওয়াজ সাধারণ মুসলমানদের পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়া হচ্ছে না। এসব অবস্থা সামনে রাখা হলে নিঃসন্দেহে কোনো ব্যক্তির পক্ষে গণতন্ত্রকে সঠিক মনে করা অথবা গণতন্ত্র ব্যবস্থায় জড়িত হওয়ার ভিত্তিতে কাউকে কাফের সাব্যস্ত করার পূর্বে জাহালাত বা অজ্ঞতার ওজর সামনে রাখা একজন মুফতীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অন্ততপক্ষে যারা এই নিযাম ও ব্যবস্থার হাকিকত

ও বাস্তবতা বোঝে না, অথবা এর কুফরি হওয়ার বিষয়টি তার নিকট স্পষ্ট নয়, তাকে মাজুর সাব্যস্ত করা হবে। যদিও সে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি অপরাধে লিপ্ত, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কাফের হওয়ার ফতওয়া দেয়ার পূর্বে তাওয়াক্কুফ অবলম্বন বা বিলম্ব করা, তদন্ত করা এবং অজ্ঞতা দূর করা আবশ্যক।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি বলেন–

الاشباه والنظائر এর الجمع والفرق এবং اليتيمة উল্লেখ রয়েছে-

যে ব্যক্তি তার অজ্ঞতার দরুন এই ধারণা করে নিয়েছে যে, যে-ই হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ আমি করেছি, আমার জন্য তা জায়েয এবং বৈধ। তো সেই (কাজ ও আমল) যদি এমন বিষয়ের মধ্য হতে হয়, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের অংশ হওয়া অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে জানা যায় (অর্থাৎ সেগুলো জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত) তবে তাকে কাফের বলা হবে, অন্যথায় নয়। *[ইকফারুল মুলহিদীন : ১৯৭]*

২. ইকরাহ বা বাধ্যকরণ :

কোনো কুফরি কথা বা কাজের জন্য যদি মৌলিক কোনো অঙ্গ নষ্ট করার অথবা প্রাণনাশের ধমকি দেয় আর তার প্রবল ধারণাও হয় যে, কুফরি কথা না বললে সত্যি সত্যি মেরে ফেলবে অথবা শরীরের মৌলিক কোনো অঙ্গ নষ্ট করে ফেলবে, এমন পরিস্থিতিতে এই শর্তে কুফরি কথা বলার অনুমতি রয়েছে যে, তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল এবং সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তবে কুফরি কালেমা বলার পরিবর্তে তার জন্য শহীদ হয়ে যাওয়াই উত্তম। এমন অত্যাচারকে শরীয়তের পরিভাষায় 'ইকরাহ' বলা হয়। উল্লেখ্য যে, অপারগতার কারণে যে কোনো ধরনের অপরাধে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেয়া যায় না। যেমন নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য অন্যায়ভাবে অন্য কোনো মুসলমানের জীবন সংহার করা। নিজের দেশ রক্ষার জন্য অন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাথে সঙ্গ দেয়া, ইত্যাদি। অপরগাতকে ওজর বানিয়ে এ সব সন্ত্রাসী কাজ করা বৈধ হবে না। সারকথা হল, ইকরাহও কারো কাফের হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে। এটা একটা বিস্তারিত আলোচনার বিষয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ফিকাহর কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে।

৩. তাবিলের ওজর :

একজন মুসলমানের মধ্যে কুফরি কোনো বিষয় পাওয়া যাওয়ার পরও তাকে কাফের ঘোষণা করার ক্ষেত্রে 'তাবিল'ও প্রতিবন্ধক হতে পারে। যেমন কারো এই তাবিল ও ব্যাখ্যা করে গণতন্ত্রে অবতীর্ণ হওয়া যে, যদিও সে এই ব্যবস্থাকে গলত মনে করে,

কিন্তু তার ধারণা অনুযায়ী ইসলামী হুকুমত কায়েম করার অন্য কোনো পথ আর নেই। তাই সে এর মাধ্যমে শরীয় প্রবর্তনের চেষ্টা করবে।

এই তাবিল বা ব্যাখ্যার ব্যাপারে আমাদের আপত্তি রয়েছে এবং এই তাবিলের গলত প্রমাণের জন্য কয়েক ডজন প্রমাণ দেয়াও সম্ভব। আর যদিও এই তাবিলের সাথেও এই কদর্য কুফরি ব্যবস্থায় শরিক হওয়া একটি মারাত্মক অপরাধ, কিন্তু এই তাবিল বা ব্যাখ্যা অনেক সুরতে গণতন্ত্রে শরিক ব্যক্তিকে কাফের ঘোষণা করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অন্তর্গত দীনের দুশমন সম্প্রদায়গুলো এবং গণতন্ত্রে শরিক দীনি সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে পার্থক্য নিরুপিত হয়। আর এভাবে পার্থক্য করা এবং সবাইকে নির্বিশেষে একই পর্যায়ভূক্ত সাব্যস্ত করা হতে বিরত থাকাও জরুরি। মোটকথা, তাবিলও কাউকে কাফের বলতে প্রতিবন্ধক হতে পারে। তবে শরীয়তে এ বিষয়েও বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কোন জাতীয় তাবিল গ্রহণীয়।

কারো বিরুদ্ধে কাফেরের হুকুম দেয়া সাধারণ মানুষের কাজ নয়

মাওয়ানেয়ে তাকফির তথা যে সব বিষয় একজন মুসলমানকে কুফরিতে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কাফের হওয়া থেকে বাঁচায়, এ বিষয়ের আলোচনা আমরা এখানে অতি সংক্ষেপেই করলাম। যাতে আমাদের পাঠকবর্গ এই পার্থক্য খুব ভালোভাবে মস্তিস্কে বসিয়ে নিতে পারেন যে, বইয়ে কৃত সমস্ত আলোচনা মৌলিকভাবে এই গণতন্ত্র ব্যবস্থা এবং গণতন্ত্র ধর্মের কুফরি হওয়া প্রমাণ করছে। এতে শরিক ও জড়িত নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের উপর হুকুম দেয়া এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়। আর গণতন্ত্রকে কুফরি বলায় এটাও আবশ্যক হয়ে যায় না যে, এতে যে কোনো পর্যায়ে এবং যে কোনোভাবে জড়িত সমস্ত ব্যক্তি আমাদের নিকট সমানভাবে দীন থেকে খারেজ হয়ে গিয়েছে। এমনটা আমরা বলিওনি আর এমন অসতর্ক ও অতিরঞ্জন মত অবলম্বন করা মুজাহিদদের পদ্ধতিও নয়। এই বই হতে এমন কোনো মর্ম গ্রহণ করা একদমন ঠিক হবে না। হ্যাঁ, আমরা এটা অবশ্যই চাই যে, আমরা আমাদের প্রিয়তম উম্মতকে গণতন্ত্রের ভয়বহতা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত করি এবং গণতন্ত্রের ঈমান বিধ্বংসী প্রকৃতি রূপকে উন্মোচিত করি। যাতে তারা এই ক্ষতিকর ব্যাধি হতে নিজেদেরকে রক্ষা করে এবং এর বিরুদ্ধে তৎপরতা চালায়।

এখানে সুধী পাঠকদের সামনে প্রিয়তম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মোবারক ফরমানও থাকা উচিত। নবীজি ইরশাদ করেন–

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا

> যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে কাফের বলল, তো কুফর তাদের দুইজনের যে কোনো একজনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।[৪৭]

এই হাদীসের মর্ম হল, যাকে কাফের বলা হয়েছে, তার মধ্যে সত্যিই যদি কুফরি কোনো বিষয় বিদ্যমান থাকে, তবে তো সে কাফের। কিন্তু তার মধ্যে যদি কুফরি কোনো বিষয় না থাকে এবং সে নিশ্চত না হয়েই যদি তাকে কাফের বলে, তো এ ব্যক্তি নিজেই মারাত্মক গুনাহে লিপ্ত হয়েছে।[৪৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لايجتمع رجلان في الجنة احدهما قال لأخيه: يا كافر

> সেই দুই ব্যক্তি জান্নাতে একত্রিত হবে না, যাদের মধ্য হতে একজন আরেক মুসলমান ভাইকে কাফের বলেছে। *[মুসনাদ ইসহাক বিন রাহওয়াইহ]*

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মুসলমানকে কাফের বলে (যার মধ্যে কুফরির কোনো বিষয় ছিল না) তো যে ব্যক্তি এ কথা বলছে, সে এমন একটা কাজ করল, যা তাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

অতএব কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কুফরিতে লিপ্ত থাকে, তো হক্কানী ওলামায়ে কেরাম তার কাফের হওয়ার ফতওয়া না দেয়া পর্যন্ত সাধারণ মানুষ তাকে কাফের বলবে না। তবে সেই কুফরি আমলকে অবশ্যই কুফরি বলা যাবে।

এ পর্যায়ে আমরা তাকফিরের আলোচনার দিক থেকে মানুষকে তিন স্তরে ভাগ করতে পারি।

১. সাধারণ মুসলমান : কোনো মুসলমানের জন্যই (চাই সে মুজাহিদই হোক না কেনো) জায়েয নেই যে, সে এসব বিষয় পড়ে সাধারণ মানুষ অথবা কোনো আলেমের বিরুদ্ধে কাফেরের ফতওয়া দিয়ে বেড়াবে। এমন কাজ করা নিঃসন্দেহে তার ঈমানকে হুমকির মধ্যে ফেলতে পারে। সুতরাং যারা আলেম নন তারা শুধু

---

[৪৭] صحيح البخاري : الجزء ١٩. كتاب الادب' باب من كفر أخاه بغير تاويل فهو كما قال الصحيح لمسلم' الجزء الأول' كتاب الأيمان' باب بيان حال ايمان من قال لأخيه المسلم يا كافر

[৪৮] কুফর ফিরে আসার দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, যে ব্যক্তি এ কথা বলেছে, সে নিজেই কাফের হয়ে গিয়েছে। বরং এখানে গুনাহের ভয়াবহতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফাতহুল বারীতে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রণিধানযোগ্য মত ইহা লিখেছেন যে–

والحاصل أن المول له ان كان كافر كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له. وان لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول و اثمه. كذا اقتصر على هذا التاويل في رجع. وهو من أعدل الاجوبة

এতটুকু করবেন যে নিজেকে, নিজের পরিবারকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে এই কুফরি থেকে রক্ষা করুন, অন্যদেরকে বিরুদ্ধে ফতওয়া দিতে যাবেন না।

২. আলেম :

হযরত ওলামায়ে কেরামও নিজেদেরকে এর থেকে বাঁচান এবং এর কুফরির বিষয় মানুষের সামনে আলোচনা করুন। তবে নির্দিষ্ট কোনো দল অথবা কোনো আলেমের বিরুদ্ধে ফতওয়া দেয়া, সব আলেমের কাজ নয়। কারণ এই কাজের জন্য ইলমের গভীরতা এবং বিশেষ এক পর্যায়ের 'রুসুখ' থাকতে হবে। যা খুব আলেমেরই লাভ হয়ে থাকে।

৩. মুহাক্কিক আলেম :

কাউকে কাফের বলা যে কারো কাজ নয়। এটা অনেক স্পর্শকাতর একটা মাসআলা। অতএব মুহাক্কিক আলেমরাই কেবল এ বিষয়ের বেশি হকদার যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে নিন্দকারীদের নিন্দার পরোয়া করবে না। তারা যেন কিয়ামতের দিন কিতমানে হক তথা সত্য লুকানোর অপরাধে পাকড়াওয়ের বিষয় ভয় করেন। আবেগ, প্রবৃত্তির অভিলাষ এবং ব্যক্তি দুর্বলতা– সব কিছু একদিকে রেখে ইলমী নিয়ম এবং ফতওয়ার আদব ও উসুল অনুযায়ী সর্ব অবস্থায় হক কথা বলে যাবেন। ক্ষমতাসীন ও স্বঘোষিত ইলাহ ও প্রভুদের যত খারাপও অসহ্যই লাগুক না কেন? সবাইকে একদিন মা'বুদে হাকিকীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কামিয়াব সেই যে তাঁর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেন এবং দুনিয়ার সব ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে যান। জীবন ও মৃত্যু আজো তিনিই দান করেন। প্রতিটি বস্তুর উপর তাঁরই রাজত্ব। কারাগারে বিষের ইনজেকশন প্রয়োগকারী, ওলামায়ে কেরাম ও মুজাহিদদেরকে শহীদ করে রাস্তায় নিক্ষেপকারীরা কিছুই নয়।

গণতন্ত্র এবং কতিপয় ওলামায়ে কেরাম

এখানে এ প্রশ্নটি অবশ্যই করা যেতে পারে যে, এই গণতন্ত্র যদি কুফরি হয়, তবে কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম এতে শরিক কেনো? তাদের হুকুম কি?

যে সব ওলামায়ে কেরাম এই গণতন্ত্র ব্যবস্থার সাথে জড়িত এবং এখন পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তাদের সম্পর্কে আমরা এতটুকুই বলব যে, তাদের কাছে গণতন্ত্র ব্যবস্থার কুফরি হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছিল না। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা একটা ওজর, আর ওজর থাকলে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কাফের বলা যায় না। আবার তাদের মধ্যে হতে কতিপয় বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এই সাক্ষ্যই বিদ্যমান রয়েছে যে, শেষে তারা এই গণতন্ত্র থেকে মুক্ত করেছেছিলেন।

কারো কুফরি প্রকাশ হওয়া না হওয়া, কুফরি কারো বেলায় আগে প্রকাশ হওয়া কারো বেলায় পরে প্রকাশ হওয়া– এটা কারো তাকওয়া ও ইলমের জন্য বিপরীত বা প্রতিদ্বন্দ্বি (মুনাফী) বিষয় নয়। এক্ষেত্রে এ কথা বলা অনর্থক যে, গণতন্ত্র যদি কুফরিই হত, তবে বড় বড় সমস্ত আলেম এটাকে কুফরি বলেন না কোনো?

মনে রাখবেন, আল্লাহ তায়ালা হক এবং বাতিলকে স্পষ্ট করার জন্য এবং দীনে মুবিনের উপর উড়ে আসা ধুলিবালি পরিস্কার করার জন্য প্রত্যেক যুগেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বদেরকে নির্বাচন করেছেন। এটা আল্লাহর মহাঅনুগ্রহ, যিনি তা পেয়েছেন।

সাইয়িদিনা হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, যাকে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম হক ও বাতিল পার্থক্যকারীর (ফারুক) খেতাব দিয়েছেন। কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কিতালের ঘোষণা করেন, হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তখন বললেন, যারা কালেমা পড়ে আপনি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবেন? পরে তিনি নিজেই বলতেন, আল্লাহ তায়ালা হযতর আবু বকরের বক্ষ উন্মোচন করে দিয়ে ছিলেন। এই ঘটনার কারণে হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফযিলত কমতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিয়ম হল, প্রথম পর্যায়ে কোনো একজন ব্যক্তি বা একটি দলের সিনায় রহমতের তাজাল্লি ফেলেন।

ইসলামের ইতিহাস হাতে নিয়ে দেখুন। খেলাফতকে নবুওয়াতের তরিকায় আনার জন্য হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, খলকে কুরআনের ফিতনায় হযরত আহমাদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ক্রুসেডারদের ফিতনার বিরুদ্ধে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আলমে ইসলামকে তাতারি ফিতনা থেকে বাঁচানোর জন্য শাইখুল ইসলাম, রণাঙ্গনের মুজাহিদ, হকের উপর কারাগার এবং কারাগার থেকে প্রিয়জনের সান্নিধ্যে গমনকার, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের সাচ্চা জানেশীন... ইমাম ইবনে তাইমিয়া, দীনে আকবারের বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদে আলফে সানী, উপমহাদেশে রাষ্ট্রীয় পতনকে ইলম ও ইয়াকিনের কুওয়াত দ্বারা সুদৃঢ়কারী শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, মুসলিম ভারতে শরীয়তের খাতিরে জিহাদ ও কিতালের ভিত্তি স্থাপনকারী সাইয়িদ আহমাদ বেরলভী রহ., ক্ষমতাধর দুশমনের মোকাবেলায় জনশক্তির ওজর খণ্ডন করে শামেলীর ময়দানে অবতরণকারী কাসিম নানুতবী রহ., শিয়াবাদ ও তার আড়লে লুকায়িত কুফরিকে উন্মোচনকারী হক নাওয়াজ ঝঙ্গুভী রহ., কুরআন এবং সুন্নাহর তরজে খালেস ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারী আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ, আহলে ইলমরাও যখন এর আমলি কিয়াম তথা কার্যত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন এবং খেলাফতকে দরস-তাদরিস

থেকেও বের করে দেয়া হয়েছিল- আনা রব্বুকুমুল আলা'র কথক ফেরাউন, আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করে তার অহঙ্কার পেন্টাগন ও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারকে ধ্বংসস্তূপে দাফনকারী শহীদে উম্মত উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ, পারভেজ মুশাররফ এবং তার সেনাবাহিনীর কুফরিকে চ্যালেঞ্জকারী ইমামে ওয়াক্ত- গাজী আবদুর রশিদ শহীদ রহ.... তালিকা তো অনেক দীর্ঘ। কিন্তু আমার জাতি এই কতিপয় ব্যক্তিত্বের অনুগ্রহের ঋণই যদি পরিশোধ করতে পারত!

এসব ইতিহাস আমাদেরকে এ কথা বোঝার জন্য যথেষ্ট যে, প্রত্যেক যুগে যে কোনো ফিতনর বিরুদ্ধে সূচনাতে যে কোনো একজন ব্যক্তিকেই চয়ন করা হয়। এরপর আসমানে তার কবুলিয়াতের এলান করা হয়। সুতরাং সৌভাগ্য তাদের জন্য, যারা হক ও বাতিল স্পষ্ট হওয়ার পর বাতিলে বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে হকওয়ালাদের সঙ্গী হয়। আর দুর্ভাগ্য তাদের কপালে জোটে, যারা কেবল হঠকারিতাবশত হককে কবুল করা হতে বিরত থাকে।

সুতরাং গণতন্ত্রকে কেবল এ কারণে কুফরি না মানা যে, বড় বড় আলেমরা এটাকে কুফরি বলেননি, এটা কোনো দলিল নয়। আবার এর জন্য ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে গাল-মন্দ শুরুকরব, তাও ঠিক না।

আল্লামা যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

ان الكبير من أئمة العلم اذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتساع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه تغفر زلاته ولا نضله ونطرحه وننسى محاسنه نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجوله التوبة من ذلك

আকাবির ওলামা এবং আয়েম্মায়ে ইলমের মধ্য হতে যাদের অধিকাংশ রায় সঠিক, যাদের হক পর্যন্ত পৌঁছার পিপাসা, ইলমের ব্যপকতা, মেধা ও বোধ-বুদ্ধির গভীরতা, দীনদারী, তাকওয়া এবং ইত্তেবায়ে হকের জযবা জানা যায়, তাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলোকে ছাড় দেয়া হবে। তাকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট বলা হবে না এবং তাকে উপেক্ষাও করা হবে না। আর তার এই (ভুল-ভ্রান্তির কারণে তার) অবদানকেও ভুলে যাওয়া যাবে না। আবার তার বিদআত ও তার ভুল-ভ্রান্তির ইত্তেবা-অনুসরণও

> করব না। আল্লাহর নিকট আশা রাখব, আল্লাহ তায়ালা তার এসব ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দিবেন।[৪৯]

সুতরাং যে সব ওলামায়ে কেরাম এই গণতন্ত্রে জড়িত ছিলেন এবং এই দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন, তাদের সম্পর্কে আমরা এটাই বলব যে, গণতন্ত্রের কুফরি হওয়ার বিষয়টি তাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছিল না। এ আলোচনাকে দীর্ঘ করা আমাদের দাওয়াতের জন্য উপকারীও নয়, আমাদের আলোচ্য বিষয়ও নয়। এ ক্ষেত্রেও আমাদেরকে আমাদের আসলাফের ভারসাম্যের আঁচল ছাড়া উচিত নয়। এমন ক্ষেত্রে তারা শুধু এতটুকুই উত্তর দিতেন যে–

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ

> সেটা ছিল একটি উম্মত, যারা বিগত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে, তা তাদের জন্য আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য। *[সূরা বাকরা : ১৪১]*

আসল বিষয় হল, আমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে এই কুফরি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করব।

তাকফিরের মাসআলায় ওলামায়ে কেরামের মাঝে নম্রতা ও কঠোরতার তাৎপর্য

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ বিষয়টিকে খুব সহজ ভাষায় বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন–

এই ভিন্নতা (ইখতিলাফ) লেখকদের (আরবাবে তাসানিফ) অবস্থার ভিন্নতার ভিত্তিতে হয়েছে। যেই লেখক যেই গোমরাহ ফেরকার মুখোমুখি হয়েছেন এবং তাদের গোমরাহীর গভীর পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ হয়েছে, তাদের ফাসেদ আকিদা ও আমল দ্বারা দীনের ক্ষতি হওয়ার ব্যাপারে তিনি জেনেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন, তিনি সে ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন এবং এমন তীব্রভাবে খণ্ডন করেছেন যে এটাকেই মিশন বানিয়েছেন এবং তার নাম-নিশানা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। আর যেই লেখক এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হননি এবং গোমরাহীর গভীর পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ হয়নি, তারা সতর্কতাবশত, মুসলমান ও আহলে কিবলা মনে করে

---

[৪৯] العمل الاسلامي بين دواعي الاجتماع ودعاة النزاع. اعداد : مركز الدراسات والبحوث الاسلامية في باكستان مع تقديم الشيخ أسامه بن لادن رحمه الله ٦٢

মূলের উপর ভিত্তি করে কাফের বলা হতে বিরত থেকেছেন। *[ইকফারুল মুলহিদীন : ২৮৯]*

সাধরণ মানুষের জন্য ওলামায়ে কেরামের অনুসরণ করার বিধি

এখন সমস্যা হল এমন নাজুক পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ কি করবে? সাধারণ মানুষ দেখে যে, গণতন্ত্রের ঝাণ্ডা উত্তোলনকারীদের মধ্যে এমন ব্যক্তিগণও রয়েছেন, যাদেরকে আলেম বলা হয়। তাদের অনুসারীদের সংখ্যাও কম নয়।

এ সম্পর্কে মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত দামি কথা বলেছেন। তিনি মাআরিফুল কুরআনের সূরা মায়েদার এই আয়াতগুলোর তাফসীরের পর 'মারিফ ও মাসায়িল'-এ বলেন–

এখানে যেভাবে তাহরিফকারী (বিকৃতিকারী) এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানাবলীতে গলত জিনিস মিশ্রনকারীদের জন্য ধমকি রয়েছে, তেমনিভাবে সেসব ব্যক্তিদেরকেও কঠিন অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা এমন লোকদেরকে ইমাম (নেতা) বানিয়ে বিষয় ও গলত রেওয়ায়াত শুনতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এতে মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উসুলি হিদায়াত হল, যদিও জাহেল আওয়ামের জন্য দীনের উপর আমল করার পথ শুধু এটাই যে, তারা কেবল ওলামায়ে কেরামের ফতওয়া এবং তলিমের উপর আমল করবে। কিন্তু এই যিম্মাদারী থেকে সাধারণ মানুষও মুক্ত নয় যে, ফতওয়া গ্রহণ এবং আমল করার পূর্বে স্বীয় নেতাদের সম্পর্কে এতটুকু খোঁজ-খবর এবং নিশ্চিত অবশ্যই হবে, যতটুকু একজন অসুস্থ ব্যক্তি ডাক্তার ও চিকিৎসকের নিকট যাওয়ার পূর্বে হয়ে থাকে। কোন ডাক্তার ভালো, তার ডিগ্রী কি কি, যার তার নিকট চিকিৎসা নিয়েছে তারা কেমন উপকার পেয়েছে... সম্ভাব্য খোঁজ-খবর নেয়ার পরও যদি সে কোনো ভূয়া বা অনভিজ্ঞ ডাক্তারের ফাঁদে পড়ে অথবা সে কোনো ভুল করে, তবে জ্ঞানীদের নিকট সে তিরস্কারযোগ্য বিবেচিত হবে না। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি খোঁজ-খবর নেয়া ছাড়া কোনো (আতায়ী) এর ফাঁদে গিয়ে পড়ে এবং বিপদ গ্রস্ত হয়, বুদ্ধিমানদের নিকট সে নিজেই নিজের আত্মহননের জন্য দায়ী। একই অবস্থা সাধারণ মানুষের জন্য ধর্মীয় বিষয়েও।

অনৈসলামিক জীবনব্যবস্থা পৃথিবীকে কী দিয়েছে

যুক্তির আলোকেও যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দেখা হয়, তো এটি যে একটি মানবতা বিরোধী জীবনব্যবস্থা, ইনসানিয়াত দুশমন নিযাম, তাতে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা থাকে না। এতে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা হয়ে থাকে। এই

সংখ্যালঘু শ্রেণীই প্রতিটি দেশে শাসন করে। আর জনগণের অবস্থা সেই কুলুর বলদের মত, যারা বছরকে বছর ধরে কুলুর ঘাণি টানতে থাকে। তারা মনে করতে থাকে যে, অচিরেই গন্তব্যে পৌঁছব। কিন্তু চোখ খুলতেই দেখে, যেখান থেকে যাত্রা শুরুকরে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

এই ব্যবস্থায় নাম যদিও জনগণের শাসন, কিন্তু বাস্তবতা হল পৃথিবীতে বিদ্যমান একটি সংখ্যালঘু শ্রেণী এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণকে ভেড়া-বকরির মত তাড়াতে থাকে। পশ্চিমাদের অবস্থা এই যে, তাদের প্রতিটি শিশু মাল্টিন্যাশনালের সুদখোরদের কাছে ঋণগ্রস্থ। ভূমি তাদের মালিকানা থেকে হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছে। খাদ্য উপকরণ খ্রিস্টবাদের দুমশনদের দখলে। এমনকি পান করার পানির উপরও মাল্টিন্যাশনালের এজারাদারি রয়েছে। খোদ আমরিকান জনগণকে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে এই শক্তিগুলো সেই কুকুরের মত বানিযে রেখেছে, যাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য স্বীয় মালিকদের (মাল্টিন্যাশনাল) স্বার্থ রক্ষা করা। মালিকের দুশমনের বিরুদ্ধে ভেউ ভেউ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়া...। শুধু বিনিময়ে যে, তাদের মালিক তাদের সামনে দুইয়েক খানা হাড্ডি নিক্ষেপ করে থাকে।

আমেরিকান জনগণও মাল্টি ন্যাশনালের জন্য গৃহপালিত কুকুরের কাজ করে যাচ্ছে। তাদের মনিব যেখানে চায় সেখানেই তাদেরকে নিক্ষেপ করে। এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবদান, যেখানে প্রকৃত শাসক শতকরা দুইজন যারা মূলত সংখ্যালঘু শ্রেণীর হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল, এরা শুধু শাসিত জাতির দেহের উপরই শাসন করে না বরং তাদের চিন্তা, দর্শন এবং জীবনের চাওয়া পাওয়াও গণতন্ত্রের দাসত্বের সাথে আবদ্ধ থাকে। শাসিত জাতিরকে শুধু শ্লোগান, প্রতিশ্রুতি এবং কল্পনার জগতে বন্দি রাখার হয়।

গণতন্ত্র ব্যবস্থার এই আধুনিক ইতিহাস অধ্যায়ন করুন এবং বলুন যে ইউরোপ-আমেরিকাসহ এই ব্যবস্থা সাধারণ মানুষকে কি দিয়েছে? আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে তো পরকালকে ধ্বংস করেছেই, পৃথিবীতেই বা কি পেয়েছে...? লাঞ্ছনা, অবমাননা, মানবতার দুশমন জাতির দাসত্ব, চার্চের উপর ইহুদীদের হস্তক্ষেপ, দুটি বিশ্বযুদ্ধ, কয়েক কোটি মানুষ হত্যা, আমেরিকায় কয়েক কোটি রেডইন্ডিয়ানের বংশবধ, অস্ট্রেলিয়ার আদি বাসিন্দাদের নির্মূল, ইহুদী দাতাদের মুখাপেক্ষীতা, মানুষের সামাজিক বিষয়ে ধর্মীয় শিক্ষার যবনিকা এবং স্বাধীনতার নামে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ছিন্ন।

এটি এমন এক জালেম ব্যবস্থা, ক্ষমতাধর শক্তি যার মাধ্যমে সাধারণ জনগণকেকুলুর বলদের মত তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কুলুর বলদের চোখে পট্টি বেঁধে যেমন কুলুতে জুড়ে দেয়া হয়। সে মনে করতে থাকে যে পথ মাড়িয়ে গন্তব্যের

দিকে যাচ্ছি। কিন্তু চোখ খুলতেই দেখতে পায় যেখান থেকে যাত্রা শুরুকরেছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আধুনিক যুগের মানুষদেরও একই অবস্থা। যারা ইহুদী দাতাদের তৈরিকৃত ব্যবস্থার কুলুতে বছরকে বছর ধরে জুড়ে রয়েছে, কিন্তু বেফায়দা। এই ব্যবস্থা পরিচালনাকারীরা জনগণকে এই ধোঁকায় দিতে থাকে যে, গন্তব্য সন্নিকটে। কিন্তু চার পাঁচ বছর পর জনগণ চোখ খুললে দেখতে পায়, যেখান থেকে যাত্রা শুরুকরেছিল, এখনো সেখানেই রয়েছে। বরং আরও পিছিয়ে গিয়েছে।

গণতন্ত্র থাকুক কিংবা স্বৈরতন্ত্র, ব্যবস্থা তো একটাই... জনগণকে বেকুফ বানিয়ে ক্ষমতাধর শক্তিগুলোকে আরও ক্ষমতাবান বানানো। যে কোনো মানুষ যদি পিছনের দিকে তাকায়, তো সে এই ব্যবস্থা থেকে কি পেয়েছে, তা দেখতে পাবে।

খেলাফত হারানোর পর থেকে এই উম্মত আধুনিক এই ব্যবস্থায় এতিম অসহায়ের মত জীবন যাপন করছে। তাদে কুশল জিজ্ঞাসা করার মত কেউ নেই। যে-ই আসে, সান্ত্বনা দেয় এবং ফিরে চলে যায়। গণতন্ত্রের সৌন্দর্য আবার নতুন রূপ নিয়ে বাজারে আবির্ভূত হয়। জনগণের পবিত্র আবেগকে স্পর্শ করে, উত্তেজিত করে। এরপর আবার দংশন করে পালিয়ে যায়।

মুসলিম বিশ্বের উপর এমন এক কদর্য শ্রেণীকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা আমাদের ভাষার চেযে তাদের শ্বেতপ্রভুদের ভাষা, সভ্যতা এবং তাদের ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী। যেই জাতির খেলাফতে ইসলামীয়ার ছাতার নিচে জীবন যাপন করা ফরয ছিল, সেই জাতি আজ জাতি সংঘের বিশ্ব কুফরি সরকারের অধীনে জীবন যাপন করতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক সুদি অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলোর অধীনে তাদের কায়কারবার ও ব্যবসা বাণিজ্য চলছে... আল্লাহকে ছেড়ে গায়রুল্লাহকে জীবনব্যবস্থা তৈরির অধিকার দেয়া হয়েছে... আল্লাহর কুরআনকে এত তুচ্ছ প্রমাণিত করা হয়েছে যে, মানুষের তৈরিককৃত পার্লামেন্ট তা অনুমোদন না পর্যন্ত আল্লাহর সত্য কিতাবের কানুনকে আইনের অংশ হতে পারে না। আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনে ফয়সালাকারী আদালতগুলোকে পুলিশ ও সেনাশক্তির মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

এই ব্যবস্থা আলমে ইসলামকে কি দিয়েছে? ইসলামী শান শওকতের স্থলে আমেরিকা ও ভারতের দাসত্ব। শিল্প-প্রযুক্তিতে উৎকর্ষতার স্থলে অর্থনৈতিক দুরাবস্থা। বিশ্ব শাসন করা তো দূরের কথা, নিজ দেশেও তাদের প্রভু ইংরেজরা তাদের উপর রাজত্ব করছে। ইংরেজের সৃষ্টি করা সেই শ্রেণী, যাদের অনেকের তো বংশক্রমও রক্ষিত নেই, তাদেরকেই মুসলিম বিশ্বের উপর এমনভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা জোঁকের মত রক্ত চোষার উপর আছে। দেশ লুণ্ঠন করে, জাতিকে বিক্রি করে। জাতীয় আত্মসম্মানকে বিশ্ববাজারে নিলাম করে। এরপর 'সসম্মানে' বিদেয় হয়।

এই গণতন্ত্র ব্যবস্থাই– যা ওলামায়ে কেরামকে সমাজে তুচ্ছ ও অবজ্ঞেয় বানিয়ে রেখেছে। আর ফাসেক ফুজ্জার ও পাপিষ্ঠদেরকে সম্মানিত, সভ্য এবং বিশিষ্ট (এলিট) সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহর আইনের ব্যাপারে যে মূর্খ, জাহেল, সেই হল জজ, বিচারপতি। আর আল্লাহর আইনের আলেমকে ফয়সালা করার অধিকারই দেয়া হয়নি। এই ব্যবস্থা ভদ্রজনদের থেকে ভদ্রতা ছিনিয়ে নিয়েছে...। স্বাধীনতার নামে সমাজকে নির্লজ্জ, অশ্লীলতা এবং নগ্নতার অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছে। চারিত্রিক সুকুমারবৃত্ত থেকে বঞ্চিত করেছে। কুলীন, বংশীয় এবং ভদ্র পরিবারগুলোর নারীদেরকে ঘরের বাইরে বের হতে বাধ্য করেছে। যেই নারীকে ইসলাম ঘরের রাণী এবং রাজকন্যার মর্যাদা দিয়েছিল, এই ব্যবস্থা তাদেরকে পুরুষের পশুপ্রবৃত্তির মনরঞ্জনের উপকরণ ব্যবস্থাকারী একটি মেশিনে পরিণত করেছে। এটাই সেই মানবতার শত্রু ব্যবস্থা, যা মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর সুখ-শান্তি ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছে।

মুসলমানদের থেকে দুই বেলার রুটি কে ছিনিয়ে নিয়েছে? পৃথিবীতে যখন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল, উপমহাদেশের মুসলমানদের শিল্পকর্ম গোটা বিশ্বে বিস্তৃত ছিল। ওই সময় গোটা ইউরোপ খাদ্যের জন্যও আমাদের কৃষিকাজের মুখাপেক্ষী ছিল। কিন্তু গণতন্ত্র শিল্প ও কৃষি, কিছুই ছাড়েনি। দেশের বড় বড় শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কৃষিক্ষেত্র ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমরা কৃষি দেশ হওয়া সত্ত্বেও চাল, গম এবং চিনির জন্য আমাদেরকে কেঁদে মরতে হয়। অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে, উপার্জনও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একজন সাধারণ দেকানির দোকানও ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

সাধারণ মানুষেল নিকট পান করার পানি নেই। ক্ষুধায় ছটফট রত শিশুর খাদ্য নেই। রেশন থাকলেও রান্না করার গ্যাস নেই। অথচ ক্ষমতাসীনদের বাচ্চারা পীজা বার্গারের পিছনেই দৈনিক হাজার হাজার টাকা ওড়াচ্ছে। পানির পরিবর্তে জুস পান করছে। তবে কি এই দেশের জনগণ মানুষ নয়? এরা কি জাতির জননীদের গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া পোকা মাকড়?

জনগণ তাদের অধিকারের দাবিতে পথে নামলে লাঠির বাড়ি খায়। ভারতীয় পুলিশদের মতই শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত বয়বৃদ্ধদেরকে পিচঢালা পথে টেনে হিচড়ে লাঞ্ছিত করে। সেনাবাহিনী আমাদেরই সন্তানদেরকে রাজপথে দাঁড় করিয়ে বুলেটে ঝাঝড়া করে দেয়..। যেনো এটা পাকিস্তান নয়, অধিকৃত কাশ্মীর...। তারা দেশ লুণ্ঠন করে, বোন মেয়েদেরকে বিক্রি করে...। তারা দেশের সাথে গাদ্দারী করে, আর জেল খাটি আমরা...। চোরেরা আমাদের ঘর খালি করে, ডাকাতরা আমাদের ঘর লুট করে, পুলিশ ও সেনাবাহিনী এরপরও তাদেরকেই নিরাপত্তা দেয়। আর আদালতে লাঞ্ছিত হই আমরা...।

আমেরিকা এই জাতির সন্তানদের উপর ড্রোন ও মিজাইল বর্ষণ করে, ভরা বাজারে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। আর পুলিশ ও সেনাবাহিনী ডলারের বিনিময়ে তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়, নিরাপদে সসম্মানে নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়। লাশ পড়ে আমাদের আর ক্ষমতা লাভ করে তারা। আমাদের চুলা জ্বলে না আর তাদের এক একটি কিচিনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়। জনগণের ঘর অন্ধকার আর তাদের প্রাসাদের আলোয় চোখ ধেঁধে যায়। জনগণের সামান্য ঝুপড়িও ছিনিয়ে নিতে চায় আর তাদের সন্তানদের জন্য বড় বড় শহরে ডিফেন্স হাউজিং অথরিটির নামে প্রাসাদ। এরা সাবাই একই রসূনের মূল। এরা সবাই একজন আরেকজনের মোহাফেজ। সেনাবাহিনী রাজনীতিকদের, রাজনীতিকরা সেনাবাহিনীর। গণতন্ত্র, বিচার বিভাগ, সবই এদের।

হে আল্লাহ! বাহ্যত এরা নিজেরা যুদ্ধ করে কিন্তু জনগণকে চোষার বেলায় এরা সবাই এক। থানায় সাধারণ জনগণ লুণ্ঠিত হয়। আদালতে জনগণ লাঞ্ছিত হয়। ট্যাক্স আদায়কারা ডাকাতি করে। বিদ্যুৎ বিল রূপে যেন হাত বোমা নিক্ষেপ করে যায়। গ্যাস মালিকরা গ্যাস দেয় না। কিন্তু এসব শাসকদের বাসার বিল জনগণ থেকেই উসুল করে। ব্যাংকগুলো বাড়ি থেকে এবং মহিলাদেরকে গহনা পর্যন্ত বঞ্চিত করেছে। এরা তো সেই লোক যারা ভূমিকম্প ও ঘূর্ণঝরে দুর্গতদের নামে আসা অনুদানও নিজেরো খেয়ে ফেলে।

পুরনো মুখগুলো গিয়ে নতুন মুখগুলো এলে কি সাধারণ মানুষের দুঃখ ও সমস্যা দূর হবে? সামান্যও কি হ্রাস পাবে? ব্যুরোক্রেসি (Bureaucracy) বা আমলাতন্ত্র, যাদের মুখে মুসলমানদের লেগে গিয়েছে, তা কি ফিরে আসবে? রাজনীতিবিদদের পরস্পরে যে একজন আরেকজনের আত্মীয়, জামাতা, শ্যালক, ভগ্নিপতি, এরা কি এমনি এমনি এই জনগণের জান ছেড়ে দিবে?

কখনোই না, কখনোই না। সব অনিষ্টের মূল হল এই ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা থাকা অবস্থায় শ্মশ্রুমণ্ডিত কোনো ব্যক্তিও যদি দেশের গদিতে বসে, তবুও আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ এই ব্যবস্থা বিশ্ব শয়তানী ব্যবস্থার সাথে জড়িত। এই ব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখার জন্য সেখান থেকে সাহায্যের প্রয়োজন হয়। যে ব্যক্তিই এখানে বসবে, সেই এই ব্যবস্থার দাস হয়ে থাকবে। মদের পারমিট বণ্টন করতে থাকবে...। ঘুষের বাজার রমরমা করবে...। গণতন্ত্রের গোলাম আল্লাহর সাথে যুদ্ধ অর্থাৎ সুদি কারবার জারি রাখবে...। এর নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সক্রিয় রাখবে...।

আমাদের নতুন মুখের প্রয়োজন নেই...। এরা আমাদের সন্তানের মুখে খাবার দিবে না...। মনে রাখবেন, শৈশবে যারা এক বেলা অনাহারে থাকেনি, উপোষ থাকার যন্ত্রণা সহ্য করেনি, তারা তোমাদের অনাহার-অনিদ্রার কষ্ট কি করে বুঝবে...?

অক্সফোর্ড আমেরিকায় পড়ুওয়া শাসকদের এসব সন্তানেরা... এরা সেখান থেকে জগতকে রঙিন বানানোর বিদ্যা অর্জন করে আসে...। শৈশব থেকেই সেই পরিবেশে মদ ও যৌবন তাদের মানবিক ভদ্রতা, নৈতিক উৎকর্ষতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ এমনকি আত্মীয়তার পবিত্রতাকেও খতম করে দিয়ে থাকে...। এরা শুধুই প্রবৃত্তির দাস। এর জন্য তারা সব কিছুই করতে পারে...। হাটে বাজারে যে বস্তুর মূল্য আছে, এরা তারই সওদাগার হতে পারে।

এজন্য প্রত্যেককেই এ বিষয়টি খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, নতুন মুখ আর নতুন শ্লোগান এলেই দেশের ভাগ্য বদলিবে না। নতুন কোনো মুখ যদি এই ব্যবস্থারই কথা বলে, তো বুঝবেন, এ নতুন ডাকাত। আমেরিকা যাকে জনগণকে আরও বেশি লুট করার পারমিট দিয়েছে। কারণ উর্ধ্বমূল্য ও বেকারত্বর সম্পর্ক বৈশ্বিক ইবলিসি ব্যবস্থার হাতে। যে ব্যবস্থা পুরো মুসলিম উম্মাহকে অক্টোপাসের মত গ্রাস করে ফেলেছে। আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং তাদের চাপিয়ে দেয়া প্রচলিত এই ব্যবস্থা... আমেরিকা, জাতিসংঘ এবং তাদের বদমায়েশিতে চাপিয়ে দেয়া এই ব্যবস্থাই সব অনিষ্টের মূল। আমাদের জীবন উপকরণ তাদের নিয়ন্ত্রণে...। পরিশ্রম আমাদের, ফল তাদের...। ভূমি আমাদের, ফসল তাদের।

সব অনিষ্টের মূল হল এই ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাই তোমাদের দুশমন। তোমাদরে দীনের দুশমন। তোমাদের সন্তানদের দুশমন। নতুন মুখ দেখে আর নতুন শ্লোগান শুনে প্রতারিত হবেন না।

এগুলো সেই গিফট যা এই ব্যবস্থা দিয়েছে। যাতে শতকরা দুই ভাগ সংখ্যালঘু শ্রেণীর মানুষই পাল্টাপাল্টি করে শাসন করে। এটাই সেই গণতন্ত্রের প্রতিশোধ, যা বিশ্ব দাতাসংস্থা (মাল্টিন্যাশনাল) তাদের দুই দুশমন (রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান এবং মুসলমান) থেকে নিচ্ছে। মানবতা এই শয়তানি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আল্লাহর রাষ্ট্র ব্যবস্থার (খেলাফত) ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত তাদের এই প্রতিশোধ গ্রহণ বন্ধ হবে না।

গণতন্ত্র এমন মরীচিকা, মানুষ যাকে পানি মনে করে তার পিছনে ছুটতে থাকে। কিন্তু পানি হলেই তো তা হাতে পাবে! এটা এমন অন্ধকার গোলক ধাঁধা, যাতে প্রবেশ করার পর মানুষ তার গন্তব্যের পথই হারিয়ে ফেলে।

মানবতাও আজ তার পথ হারিয়ে ফেলেছে। আর খেলাফতের আলোয় পথ আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত এরা কখনোই সঠিক পথে আসতে পারবে না। এ সময় বিশ্বমানবতাকে এই অন্ধকার অমানিশা ও গোলক ধাঁধা থেকে উদ্ধার করতে পারে এক মাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থা। কুরআন সুন্নাহর ব্যবস্থা। খেলাফত ব্যবস্থা। এক মাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থা, যা ফেরেশতাদের সরদার সকল নবীদের সরদারের নিকট এনেছেন। বাকি সবই মিথ্যা, ধোকা ও প্রতারণা।

আমাদে এমন একটা ব্যবস্থা প্রয়োজন যারা সম্পদের পাহাড় গড়াকে অবৈধ ঘোষণা করবে। এমন একটা ব্যবস্থা দরকার যাতে ধনী-গরিব, শাসক-শাসিত সবার সাথে ইনসাফ করা হয়। এমন ব্যবস্থা দরকার যাতে শাসক রাজা হয় না বরং জনগণের সেবক হয়। যার শরীরে লক্ষ টাকার কোর্ট নয় বরং তালি দেয়া কাপড় শোভা পাবে। যে তার জনগণের গ্রাস ছিনিয়ে নেয়ার পরিবর্তে নিজের পেটে পাথর বেঁধে জনগণকে খাওয়াবে। বিধবা অসহায়দের জন্য নিজ কাঁধে বোঝা বহন করে নিয়ে যাবে এবং তাদের খাবার তৈরি করে দিবে...। যে রাতে মদের নেশায় বুঁদ হয়ে জাতিকে বিক্রি করবে না। বরং নিজের ঘুম বিসর্জন দিয়ে রাতের বেলায় জাতির জন্য আহাজারি করবে। তার প্রজারা যেন ক্ষুধার্ত অবস্থায় না ঘুমায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা যেনো তাকে পাকড়াও না করেন, এ চিন্তায় সব সময় পেরেশান থাকেন।

সুতরাং ওঠো, জাগো। আমাদেরকেই এখন এই ব্যবস্থা উপড়িয়ে ফেলতে হবে। শুধু মিছিল করে কোনো লাভ হবে না। শুধু শ্লোগানে এই হিংস্রদেরকে গদি ছাড়া করা যাবে না। অবুঝ শিশুদের আত্মহত্যাও এদের অন্তরকে গলাবে না। ওঠো, জাগো এবং তোমাদের বুকের ভেতর যে বহ্নিশিখা জ্বলছে, তা তাদের প্রাসাদ পর্যন্ত পৌছিয়ে দাও।

হে জাতির যুবক ভাইয়েরা আমার! কত দিন নিজের আগুনে নিজের যৌবনকে জ্বালাবে পোড়াবে? বাড়ি থেকে বের হও, স্কুল কলেজ ও মাদরাসা থেকে বেরিয়ে আসো এবং এই তাগুতি ব্যবস্থাকে ভস্ম করে দাও। আমেরিকান ও ভারতীয় এজেন্ট থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার এটাও উত্তম সুযোগ। খেলাফত পুনর্জীবন... খেলাফত প্রতিষ্ঠা এই উম্মতের উপর মুসতাহাব বা সুন্নাত নয়, ফরয। খেলাফতহীন এই উম্মত এতিম।

পঞ্চম অধ্যায়
ইসলামী জীবনব্যবস্থার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ

গণতন্ত্র অথবা 'মজলিসে শূরা' নয়ঃ চাই ইসলামী খেলাফত

আমাদের এই আলোচনা থেকে কেউ এ কথা বুঝবেন না যে, গণতন্ত্রের প্রতিই শুধু আমাদের সব বিরাগ ও বিরক্তি। গণতন্ত্র বাদ দিয়ে এই ব্যবস্থায় যৎসামান্য রদবদল করে নতুন এক ব্যবস্থা দেশে চালু করা– যার বাহ্যিক পরিভাষা হবে ইসলাম, আমরা তা গ্রহণ করে নেব– এমন মনে করা ভুল। এমন যে কোনো ব্যবস্থা যাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তকে বিনাবাক্যে আইন হিসেবে স্বীকার করা হবে না, কুরআন এবং হাদীস বিচার ব্যবস্থার উৎস ও মূল (Authority) সাব্যস্ত হবে না (এমনকি সালফে সালেহীনের যুগের প্রচিলত পুরনো ইসলামী পরিভাষাও আমরা বাদ দেব না) গণতন্ত্রের মত এগুলোরও একই হুকুম। সুতরাং গণতান্ত্রিক সংসদের নাম পরিবর্তন করে যদি 'ইসলামী মজলিসে শূরা'[৫০] রেখে দিল, আইনে আরও কতিপয় ইসলামী ধারা সংযোজন করল এবং দাড়িওয়ালা কোনো ব্যক্তিকে দেশের প্রধান বানানো হল– এমন নিযাম ও জীবনব্যবস্থার হুকুমও গণতনেত্রর মতই। এমন ব্যবস্থার দাড়িওয়ালা পরিচালকও এই আধুনিক প্রতিমার রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হবে। এরা বরং দাড়ি ছাড়াদের থেকে আরো অধিক ভয়ঙ্কর হবে।

সুতরাং এ কথা জানা আবশ্যক যে, সীরাতে মুস্তাকী একটাই। দুনিয়াতে বাস্তবায়ন হওয়ার মত ব্যবস্থা একটাই...। সেটা হল ইসলামী নিযাম...। ইসলামী জীবনব্যবস্থা...। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম।

ইসলামের বিপরীতে অন্য সব জীবনব্যবস্থা বাতিল। ভ্রান্ত। আল্লাহর রাসূল খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর উম্মত সহস্র বছর বুকের তাজা রক্ত দিয়ে তা রক্ষা করেছে।

---

[৫০] *আফসোস, জিয়া মজলিসে শূরার শরয়ী পরিভাষাও হেয় করার জন্য এই কদর্য সংসদকে মজলিসে শূরা নাম দিয়েছে। এখানে এই পরিভাষা রদ করা উদ্দেশ্য। অন্যথায় খোদ শূরা ও মশওয়ারা তো ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থারই মৌলিক মূলনীতি সমূহের অংশ।*

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এ বিষয়ের উপর ইজমা রয়েছে যে, বিশ্বের বুকে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা এই উম্মতের উপর ফরয। উম্মতের আহলুর রায় (ওলামায়ে কেরাম এবং জাতির নেককার জেষ্ঠ ব্যক্তিগণ) যদি এই ফরয আদায় না করে, তবে গোটা উম্মত গুনাহগার হবে। গণতন্ত্রের দাসত্বের পূর্বে কোনো মুসলমান এ কল্পনই করতে পারত না যে, এই উম্মত খেলাফত ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে। খেলাফত কি পরিমাণ ফরয, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর হযরত সাহাবায়ে কেরামের এই মোবারক আমল দ্বারা তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহ তিন দিন পর্যন্ত দাফন করা হতে এজন্য বিলম্ব করা হয় যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম মদীনার এক মহল্লায় (সাকিফা বনী সাআদ) খলিফা নির্বাচনের জন্য পরামর্শ করছিলেন। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ব্যাপারে যখন সবাই এক মত হলেন, তাঁকে যখন খলিফা নির্বাচিত করা হল, এরপর গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাফন করা হয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, খেলাফতের এই গুরুত্ব সাহাবায়ে কেরাম হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই শিখে ছিলেন। এর দ্বারা আপনারা অনুমান করতে পারেন যে, হযরত সাহাবায়ে কেরাম খেলাফতবিহীন এতটুকু সময়ও বেঁচে থাকা পছন্দ করেননি যে, আগে নবীজির দাফনকার্য সম্পন্ন করা হোক।

এজন্য সালফে সালেহীন খলিফা নির্বাচনে তিন দিন পর্যন্ত বিলম্ব করার অবকাশ দিয়েছেন। তিন দিনের ভেতর যদি খলিফা নিযুক্ত না হয় তবে নামায রোযার মত খেলাফত প্রতিষ্ঠা করাও প্রতিটি উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাবে। ইহা ছাড়ার কারণে পুরো উম্মত গুনাহগার হবে। কারণ খেলাফত ফরযে কেফায়া হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত উম্মতের ইজমা রয়েছে। আর আহলে ইলমগণ এটাও জানেন যে, ফরযে কিফায় নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর (তিন দিন) আদায় করা না হলে, তা ফরযে আইন হয়ে যায়। অর্থাৎ এখন এটাকে প্রতিষ্ঠা করা প্রতিটি বুদ্ধিমান প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের উপর ফরয হয়ে যায়।

খেলাফত ছাড়া জীবন যাপন করা কেমন?

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে তা বর্ণনা করেছেন–

...وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

যে ব্যক্তি খলিফার হাতে বায়আত না হওয়া অবস্থায় মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।[৫১]

من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية

যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, তার উপর কোনো ইমাম (খলিফা) নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।[৫২]

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

যে ব্যক্তি দল এবং ইসলাম থেকে আলাদা হল এবং সেই অবস্থায়ই মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।[৫৩]

খোলাফত ছাড়া জীবন যাপন করা কেমন, তা হাদীসগুলোতে স্পষ্টই রয়েছে। বাকি এ বিষয়ে আলোচনা করা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। বিধায় এতটুকুতেই শেষ করা হল।

খেলাফতের (শরীয়ত প্রবর্তন) জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ

এক দল লোক রয়েছে, যারা বড় উচ্চকণ্ঠে এ কথা বলে যে, শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য এখানে অস্ত্র হাতে নেয়া উচিত নয়। (প্রত্যেক জায়গার সরকারি লোক তাদের দেশের সম্পর্কে এটাই বলে থাকে। এমনকি ভারতের সরকারি আলেমরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে পর্যন্ত অস্ত্র হাতে নেয়াকে হারাম বলে।) তাদের বক্তব্য হল (তাগুতি) আইনের অধীনে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমেই এখানে ইসলাম প্রবর্তন করা সম্ভব। এমনকি অনেকে তো এ কথা পর্যন্ত বলেন যে, এই 'পবিত্র' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও অস্ত্র হাতে নেয়া জায়েয নেই। অথচ তাদের দাবির পক্ষে তাদের নিকট কোনো দলিল-প্রমাণ নেই।

সর্বপ্রথম আমরা এটা দেখি যে, শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য সশস্ত্র আন্দোলনকে শরীয়ত কোন নামে জানে? কুরআন, হাদীস এবং ফিকাহ'র কিতাবগুলোর ভাষ্য দেখলে সহজেই জানা যায় যে, শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য সশস্ত্র আন্দোলনকে শরীয়তে

---

٥١ الصحيح لمسلم : الجزء ٩ كتاب الامارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة و مفارقة الجماعة

٥٢ السنة لابن أبي عاصم : الجزء 3. باب في ذكر السمع والطاعة. مسند أبي يعلي : حديث رقم ٧٣٧٤

٥٣ الصحيح لمسلم : الجزء ٩ كتاب الامارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة و مفارقة الجماعة

'কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ' বলা হয়। যার সামান্য পরিমাণ ইলম রয়েছে, এ বিষয়ে তার কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই।

আয়েম্মায়ে আরবাআ এবং সমস্ত সালফে সালেহিনী এ বিষয়ের উপর একমত (ইজমা) যে, কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ এই উম্মতের উপর ফরয। আর যে ব্যক্তি ফরয অস্বীকার করে, সে ইসলাম থেকে খারেজ।

এবার আপনারাই চিন্তা করুন যে, 'শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য সশস্ত্র আন্দোলন করা আমরা জায়েয মনে করি না' এ কথা কে বলতে পারে? পবিত্র কুরআনের এক আয়াত নয় বরং গোটা কুরআনই তার মাননেওয়ালাদেরকে এ কথার দাওয়াত দিচ্ছে যে, তারা যেনো ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক না করে। আর আহলে ইলমের নিকট এ বিষয়টি গোপন নয় যে, এক আল্লাহর ইবাদত গায়রুল্লাহর আইন-বিজয়ী থাকা অবস্থায় হতেই পারে না। আর বুঝমান প্রতিটি মুসলমানই এ কথাটি বুঝতে পারবেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইবলিসি ব্যবস্থার বিজয় ও ক্ষমতা বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর নিযাম বাস্তবায়নই হতে দিবে না। কারণ এতে তাদের লাগামহীন প্রবৃত্তি পূজার যবনিকাপাত ঘটবে। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য কিতাল ফরয করেছেন। জ্বি হ্যাঁ, মুস্তাহাব বা সুন্নাত নয় (যদিও একজন খাঁটি রাসূল প্রেমিকের জন্য সুন্নাত হওয়াই যথেষ্ট ছিল) বরং ফরয করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

> আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। *[সূরা আনফাল : ৩৯]*

আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

> আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেনো ততক্ষণ পর্যন্ত কিতাল করি, যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর (নিযামের বিজয়) স্বীকার করে।[৫৪]

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! গণতন্ত্রে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য নিজ মুখে এত বড় কথা কেনো বল? পাহাড়ের উপর রাখা হলেও তো পাহাড় আল্লাহর ভয়ে কেঁপে

---

٥٤ صحيح البخاري : الجزء ١٠. كتاب الجهاد والسير. باب دعاء النبي صلي الله عليه وسلم الناس الي الاسلام والنبوة... صحيح مسلم : كتاب الايمان باب الأمر بقتال الناس حتي يقول لااله الاالله...

উঠবে। 'শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য কিতাল (তথা সশস্ত্র যুদ্ধ) আমরা জায়েয মনে করি না অথবা আমরা এই বিশ্বাস লালন করি না' এই কথার অর্থ মর্ম এবং হুকুম কি, দয়া করে তা আহলে ইলমের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবেন।

এখন আসুন দেখি এদের সম্পর্কে ফুকাহায়ে আহনাফের শীর্ষ ইমাম আবু বকর জাসসাস রহিমাহুল্লাহ কি বলেন–

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي شَرِيعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى مَنْ قَصَدَهُ إِنْسَانٌ بِالْقَتْلِ أَنَّ عَلَيْهِ قَتْلَهُ إِذَا أَمْكَنَهُ

আর তা এটাই বুঝাচ্ছে যে, প্রতিরোধ না করার নির্দেশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের শরীয়তে প্রমণিত নেই। ওয়াজিব হল, কোনো মুসলমানকে যখন কেউ হত্যা করার ইচ্ছা করে, তাকে হত্যা করা (অর্থাৎ নিজের পক্ষ হতে প্রতিরোধ করা) জরুরি। যদি তার পক্ষে এটা সম্ভব হয়...।[৫৫]

এরপর গিয়ে বলেন–

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَاكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ } فَأَمَرَ بِتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَغْيِيرُهُ إِلَّا بِقَتْلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِمُقْتَضَى ظَاهِرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.....وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ الْحَشْوِيَّةِ إِلَى أَنَّ عَلَى مَنْ قَصَدَهُ إِنْسَانٌ بِالْقَتْلِ أَنْ لَا يُقَاتِلَهُ وَلَا يَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى يَقْتُلَهُ ......وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ الطَّائِفَةُ مِنْ حَظْرِ قَتْلِ مَنْ قَصَدَ قَتْلَ غَيْرِهِ ظُلْمًا وَالْإِمْسَاكُ عَنْهُ حَتَّى يَقْتُلَ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ ، لَوَجَبَ مِثْلُهُ فِي سَائِرِ الْمَحْظُورَاتِ إِذَا أَرَادَ الْفَاجِرُ ارْتِكَابَهَا مِنْ الزِّنَا وَأَخْذِ الْمَالِ أَنْ نُمْسِكَ عَنْهُ حَتَّى يَفْعَلَهَا ، فَيَكُونَ فِي ذَلِكَ تَرْكُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَاسْتِيلَاءِ الْفُجَّارِ وَغَلَبَةِ الْفُسَّاقِ وَالظَّلَمَةِ وَمَحْوِ آثَارِ الشَّرِيعَةِ ؛ وَمَا أَعْلَمُ مَقَالَةً أَعْظَمَ ضَرَرًا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ الْمَقَالَةِ ، وَلَعَمْرِي إِنَّهَا أَدَّتْ إِلَى غَلَبَةِ الْفُسَّاقِ عَلَى أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِيلَائِهِمْ عَلَى بُلْدَانِهِمْ حَتَّى تَحَكَّمُوا فَحَكَمُوا فِيهَا بِغَيْرِ

---

[৫৫] احكام القران للجصاص: الجزء ٥. باب القيام بالشهادة والعدل

حُكْمِ اللهِ ، وَقَدْ جَرَّ ذَلِكَ ذَهَابَ الثُّغُورِ وَغَلَبَةَ الْعَدُوِّ حِينَ رَكَنَ النَّاسُ إِلَى هَذِهِ الْمَقَالَةِ فِي تَرْكِ قِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْإِنْكَارِ عَلَى الْوُلَاةِ وَالْجُوَارِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

আর এর পক্ষে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস দলিল, যা হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো মন্দ কাজ হতে দেখলে তার উচিত তা হাত দ্বারা বাধা দেয়া। হাত দিয়ে বাধা দেয়ার শক্তি না থাকলে মুখ দ্বারা বাধা দিবে। মুখ দ্বারা বাধা দেয়ার শক্তিও যদি না রাখে, তাহলে মনে মনে ঘৃণা করবে। আর এটা ঈমানের নিম্নস্তর।'

যাহোক, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্দ কাজকে হাত দিয়ে প্রতিরোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর মন্দ কাজ প্রতিরোধ করা যখন একমাত্র কতলের মাধ্যমেই সম্ভব, তখন তার প্রতিরোধকারীর জন্য কতল করা জরুরি। হাদীসের বাহ্যিক মর্ম এটাই দাবি করে।....

আর হাশবিয়া ফিরকার মাযহাব হল, কোনো ব্যক্তিকে যদি কেউ হত্যা করার ইচ্ছা করে, তবে সে ওই হত্যাকারীর সাথে যুদ্ধ করবে না এবং তার প্রতিরোধও করবে না। বরং বিনা প্রতিরোধেই খুন হয়ে যাবে। বিষয় যদি এমনই হয় যেমন এই ফেরকার মাযহাব, প্রতিরোধ করা ছাড়াই খুন হয়ে যাবে। তবে এই হুকুম তো প্রতিটি নিষিদ্ধ কাজের বেলায়ই প্রয়োগ হবে। কোনো পাপী গুনাহ করতে চাইল, বা সম্পদ লুট করতে চাইল, আমরা তাকে তা করতে দেব। এভাবে তো আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার তরক হয়ে যাবে। পাপী ও জালেমরা বিজয়ী হবে। শরীয়তের নাম চিহ্ন মুছে যাবে। আমার জানা মতে ইসলাম এবং মুসলমানের জন্য এর চেয়ে ক্ষতিকর কথা আর কিছুই নেই।

তাদের এই কথা মুসলমানদের সমস্ত বিষয় এবং তাদের নাগরিকদের উপর ফাসেকদের দখল সুগম করে দেয়। এক পর্যায়ে বাজে লোকেরা শাসক হয়। তারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য আইন দিয়ে ফয়সালা করে। তাদের এই কথার

কারণে ইসলামী সীমান্ত নিশ্চহ্ন হয়ে যায় এবং দুশমনরা বিজয় লাভ করে।[৫৬]

ইমাম আবু বকর জাসসাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ কথা বলেছেন যে–

وَإِزَالَتُهُ. فَفَرْضٌ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ إِزَالَةُ ذَلِكَ بِيَدِهِ أَنْ يُزِيلَهُ؛ وَإِزَالَتُهُ بِالْيَدِ تَكُونُ عَلَى وُجُوهٍ: مِنْهَا أَنْ لَا يُمْكِنَهُ إِزَالَتُهُ إِلَّا بِالسَّيْفِ. وَأَنْ يَأْتِيَ عَلَى نَفْسِ فَاعِلِ الْمُنْكَرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ.

كَمَنْ رَأَى رَجُلًا قَصَدَهُ أَوْ قَصَدَ غَيْرَهُ بِقَتْلِهِ أَوْ بِأَخْذِ مَالٍ أَوْ قَصَدَ الزِّنَا بِامْرَأَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْتَهِي إِنْ أَنْكَرَهُ بِالْقَوْلِ أَوْ قَاتَلَهُ بِمَا دُونَ السِّلَاحِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَهُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ}. فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ تَغْيِيرُهُ بِيَدِهِ إِلَّا بِقَتْلِ الْمُقِيمِ عَلَى هَذَا الْمُنْكَرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَهُ فَرْضًا عَلَيْهِ.

অন্যায় কাজ বন্ধ করার কয়েকটি সুরত হতে পারে। এক. তরবারি (অস্ত্র) ছাড়া বন্ধ করা সম্ভব নয়। যদি কেউ অন্যায়কারীর কাছে আসে, এ মতাবস্থায় যে সে অন্যায় কাজে লিপ্ত রয়েছে, এ ক্ষেত্রে তার জন্য আবশ্যক হল, সে তাকে তরবারির মাধ্যমে বাধা দিবে। যেমন কেউ দেখতে পেল, এক ব্যক্তি তাকে কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করবে, অথবা তার সম্পদ ছিনতাই করবে, অথবা কোনো মহিলার সাথে অপকর্ম করছে। আর সে এ কথা জানে যে, তাকে মুখে বাধা দিলে সে শুনবে না। অন্যায় কাজ হতে ফিরে আসবে না। এমনকি ধস্তাধস্তি করেও তাকে ফিরাতে পারবে না। এমন পরিস্থিতিতে তার জন্য আবশ্যক হল, সে তাকে (অন্যায় কাজে লিপ্ত ব্যক্তি) হত্যা করবে। কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখে, সে যেনো সেই অন্যায় কাজকে হাত দ্বারা বন্ধ করে।' সুতরাং অন্যায়কারীকে হত্যা করা ছাড়া যখন অন্যায় বন্ধ করা সম্ভব হবে না, তখন তাকে হত্যা করা তার উপর (যে দেখছে) ফরয।[৫৭]

---

[৫৬] –প্রাগুক্ত

[৫৭] احكام القران للجصاص: الجزء ٣. باب فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

এরপর তিনি বলেন–

وَلَمْ يَدْفَعْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَفُقَهَائِهَا سَلَفِهِمْ وَخَلَفِهِمْ وُجُوبَ ذَلِكَ إِلَّا قَوْمٌ مِنَ الْحَشْوِ وَجُهَّالِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ . فَإِنَّهُمْ أَنْكَرُوا قِتَالَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ بِالسِّلَاحِ . وَسَمَّوْا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ فِتْنَةً إِذَا احْتِيجَ فِيهِ إِلَى حَمْلِ السِّلَاحِ وَقِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ

এই উম্মতের সালফে সালেহীন, ওলমা ও ফুকাহায়ে কেরামের মধ্য হতে কেউই এর (প্রতিরোধের) উজুবকে অস্বীকার করেনি। শুধু হাশবিয়া ফেরকা এবং কতিপয় গণ্ডমূর্খ আহলে হাদীস ছাড়া...। তারা বিদ্রোহী দলের সাথে কিতাল করাকে এবং সশস্ত্র আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারকে অস্বীকার করেছে। তারা এমন আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার, যাতে অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়, ফিতনা সাব্যস্ত করেছে....।[৫৮]

এ পৃষ্ঠাতে তিনি আরও বলেছেন–

لِأَنَّهُمْ أَقْعَدُوا النَّاسَ عَنْ قِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ وَعَنْ الْإِنْكَارِ عَلَى السُّلْطَانِ الظُّلْمَ وَالْجَوْرَ . حَتَّى أَدَّى ذَلِكَ إِلَى تَغَلُّبِ الْفُجَّارِ بَلْ الْمَجُوسِ . وَأَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ حَتَّى ذَهَبَتْ الثُّغُورُ وَشَاعَ الظُّلْمُ وَخَرِبَتْ الْبِلَادُ وَذَهَبَ الدِّينُ وَالدُّنْيَا وَظَهَرَتْ الزَّنْدَقَةُ وَالْغُلُوُّ وَمَذَاهِبُ الثَّنَوِيَّةِ وَالْخُرَّمِيَّةِ وَالْمَزْدَكِيَّةِ وَالَّذِي جَلَبَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَيْهِمْ تَرْكُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالْإِنْكَارِ عَلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ

কারণ তারা (হাশবিয়া এবং কতিপয় গণ্ডমূর্খ আহলে হাদীস) মানুষকে (এমন কথা শুনিয়ে যে অন্যায় কাজ বন্ধ করার জন্য শক্তি ব্যবহার করা জায়েয নেই, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদেরকে এ কাজ করতে হবে।) ইসলামের সাথে বিদ্রোহকারীদের সাথে কিতাল করা এবং শাসকের জুলুম নির্যাতন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া থেকে বসিয়ে দিয়েছে। যার ফলে দুশ্চরিত্র, অগ্নিপূজক এবং ইসলামের

---

৫৮ –প্রাগুক্ত

> দুশমনদের (বর্তমান সময়ে যিন্দিক শিয়া, কাদিয়ানী, আগাখানি প্রমূখ) বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এই ধারা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ইসলামী মানচিত্রের সীমানা সঙ্কোচিত হচ্ছে। নৃশংসতা ব্যপকতর হচ্ছে। ইসলামী দেশগুলো ধ্বংস হচ্ছে। পতনের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে ধর্ম ও পৃথিবী। যিন্দিকেরা (যেমন শিয়া, কাদিয়ানী, আগাখানি, স্যেকুলার এবং যারা প্রকাশ্যে আল্লাহর হদ ও জিহাদ অস্বীকার করে) গালি শিয়া এবং সানাবিয়া, খরমিয়া, মজদাকিয়া ক্ষমতায় এসেছে। এগুলো আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার ছাড়ার কারণে এবং জালেম শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ না করার কারণেই হয়েছে।[৫৯]

আজ যদি ইমাম আবু বকর জাসসাস রহিমাহুল্লাহ আমাদের এই যুগের হাশবিয়াদেরকে দেখতেন, যারা মিম্বার এবং মিহরাবে দাঁড়িয়ে কাদিয়ানী মতবাদ প্রচার করে, দাবি করে এবং ফিকহে হানাফী দ্বারা দলিল দেয় যে, এই দেশে (এরা চাই ভারতে হোক কিংবা আমেরিকা ও ব্রিটেনে হোক, কিংবা ইসরাইলেই হোক না কেনো) আমরা সব ধরনের সশস্ত্র আন্দোলনের বিরোধী। এখানে যখন ইসলামী পুলিশ, ইসলামী সেনাবাহিনী এবং ইসলামী আদালত বিদ্যমান রয়েছে, তখন আইন হাতে তুলে নেয়ার এবং লাঠি হাতে রাস্তায় নামার কারো প্রয়োজন কি? যেনাকারী ও বাজে মহিলাদেরকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিহত করার দরকার কি? নিজের কিংবা অন্য কারো ইজ্জতের উপর আক্রমণকারী পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করার অধিকার কোথায়? কারো জনবসতিকে আহমাদাবাদ এবং সুরত বানিয়ে দেয়া হলে, তাদের মসজিদগুলোকে মন্দিরে পরিণত করা হলেও বা সশস্ত্র আন্দোলন করা বৈধতা কোথায়?

সুতরাং সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে জেনে রাখা উচিত যে, যারা শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য সশস্ত্র আন্দোলনকে লাঠিয়াল ইসলাম অথবা তালেবানী ইসলাম বলে উপহাস করে এবং শক্তি প্রয়োগকে অবৈধ মনে করে, তারা আহলে সুন্নাত নয়। তারা হাশবিয়া চেতনার দল। এদের কারণেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের উপর পাপী, দুশ্চরিত্র, যেনাকারী, মদ্যপায়ী, সতিত্ব বিক্রেতা ও নারীর সওদাগর শাসক এবং জেনারেলরা বিজয়ী হয়েছে। এরা হাশবিয়া গ্রুপ। এরা কাদিয়ানীদের দোসর। তাই এদের কথা শোনা যাবে না, মানা যাবে না।.... বাহ্যত এদেরকে যেমনই দেখা যাক না কেনো?

---

[৫৯] –*প্রাগুক্ত*

আপনি নিজেই ভাবুন! তাদের এই কথা যদি মেনে নেয়া হয় তো আত্মসম্মান কি করে সহ্য করবে যে, কারো বোন, মেয়ে অথবা স্ত্রীর সাথে কোনো জালেম জুলুম করছে, তার শ্লীতাহানী করছে, আর এই আত্মসম্মানহীন ব্যক্তি তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কাকুতি মিনতি করতে থাকবে যে, দেখো ভাই, লোকটা হারাম কাজ করছে। আল্লাহ এবং তার রাসূল এমন ঘৃণ্য কাজ করতে নিষেধ করেছেন...? আপনিই বলুন, পৃথিবীর বুকে এর চেয়ে বেশরম ও আত্মমর্যাদাহীন মানুষ আর কেউ হতে পারে? আল্লাহর রাসূল সত্য বলেছেন–

> পূর্ববর্তী নবীদের বাণী হতে যে বিষয়গুলো পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে এটাও একটা যে, যখন তোমার মধ্যে লজ্জা থাকবে না, তখন তোমার যা ইচ্ছা কর।[৬০]

একই পয়েন্ট ইমাম আবু বকর জাসসাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন যে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য যদি শক্তি প্রয়োগ ছেড়ে দিতে হয়, তবে এই নিয়ম অন্য সব মন্দ কাজের বেলায়ও মানতে হবে। অর্থাৎ তাদের সামনে যত যাই হবে, শুধু 'শান্তিপূর্ণ আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার'–এর দাওয়াত দিতে থাকবে।

যখন এ কথা প্রমাণিত হল যে, আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়া ফরয, যখন এ ছাড়া অন্য আর কোনো সুরতে কাজ হবে না। তো জেনে রাখুন দুনিয়াতে সব চেয়ে বড় মুনকার হল কুফরি। আর এই কুফরকে খতম করার জন্য এবং দাপট নিশ্চহ্ন করার জন্য অস্ত্র হাতে নেওয়াও ফরয।

এমনকি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, ওই সব কাফেররা যখন তোমাদের কথা মানে না, তোমরা তাদের সাথে কিতাল কর।

তোমরা সর্বোত্তম উম্মত

পবিত্র কুরআনে উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে অন্যান্য উম্মতের উপর এ কারণেই শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

> তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ

---

٦٠ صحيح البخاري: الجزء ١١. كتاب أحاديث الانبياء' باب حديث الغار

কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।
[সূরা আল ইমরান : ১০৩]

আসুন, মুফাসসিরে কুরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট এই আয়াতের তাফসীর পড়ি। যাতে আমাদের সবার অন্তর থেকে সব ধরনের ওয়াসওয়াসা এবং শয়তানী কুমন্ত্রণা বের হয়ে যায়। সেই সাথে আমাদের যেন এই কথা জানা হয়ে যায় যে, কোন সেই আমল যার কারণে এই উম্মতকে অন্যান্য উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। আর কোন সেই আমল যা ত্যাগ করার কারণে এই উম্মত আজ দুয়ারে দুয়ারে হোঁচট খাচ্ছে। এই আয়াতে কারিমার তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন–

تأمرونهم أن يشهدوا أن لااله الاالله ويقروا بما أنزل الله. وتقاتلونهم عليه و'لااله الاالله' أعظم المعروف. والتكذيب هو أنكر المنكر

তোমরা তাদেরকে নির্দেশ দিতে থাক যে, তারা এর সাক্ষ্য দিক যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আর আল্লাহ তায়ালা যা নাযিল করেছেন, তা স্বীকার করে। আর তোমরা তাদের সাথে এর উপর কিতাল করতে থাক (অর্থাৎ তারা যখন এটা মানবে, তেমারা তাদের সাথে কিতাল কর।) এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সবচেয়ে বড় কল্যাণের কাজ। আর এই কালেমা অস্বীকার করা সবচেয়ে বড় মন্দ কাজ। *[তাফসীরে কাবীর ৮/১৮০]*

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সূত্রে এই আয়াতের তাফসীর ইহা বর্ণনা করেছেন যে–

خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ

তোমরা মানুষদের (কাফেরদের) জন্য উত্তম মানুষ। (কারণ) তোমরা (তাদের সাথে কিতাল করে) তাদের গর্দান শিকল পড়িয়ে তাদেরকে আনো (যার কারণে তারা যখন তোমাদের সাথে থাকে এবং কাছে থেকে ইসলাম দেখে, তখন এর ব্যবহার ও ইনসাফ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে) ইসলাম কবুল করে। (এভাবে তাদের সাথে তোমাদের কিতাল করা তাদের জন্য রহমতের

> কারণ হয়ে যায়। এজন্য তোমারা এসব কাফেরদের জন্য সবচেয়ে উত্তম মানুষ।[৬১] *[সহীহ বুখারী : ৪১৯১*

এটা আল্লাহর আইন, যিনি আহকামুল হাকিমীন। ইহাকে উপহাসের বস্তু বানানো অথবা যার মন চাইল মানল আর যার মন চাইল এর বিরোধিতা করল, এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, এমন বলা আল্লাহর আইনের অবমাননা।

পৃথিবীর কোনো দেশে গিয়ে যদি আপনি সেখানকার আইনের বিরোধিতা করেন, তো আপনাকে এমন না করার জন্য আবেদন করা হবে না। বলা হবে না, এমন কাজ কর না। বরং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে আপনাকে বাধা দেয়া হবে। আর যদি এ কথা বলেন যে, আমি এ দেশের আইন শৃঙ্খলা মানি না, তবে বুঝবেন, মানুষের তৈরিকৃত আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে কত ধানে কত চাল হয়!

সুতরাং আপনি নিজেই ইনসাফের সাথে ফয়সালা করুন যে, মানুষের তৈরিকৃত আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে যখন ক্ষমা করা হয় না, তো আল্লাহর আইন কি নাউযুবিল্লাহ ইবলিসের আইনের চেয়েও তুচ্ছ ও অবজ্ঞেয় হয়ে গেল? যার মনে চাইবে মানবে, আর যার মনে চাইবে না পশ্চাতে ছুড়ে ফেলবে? তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য কুরআন বিশ্বাসীদের নিকট শক্তিও থাকবে না? দুনিয়ার সামনে তার আইনকে অপমানিত করা হবে! হেয় ও অবজ্ঞা করা হবে, যারা ইচ্ছা এই আইন দিয়ে ফয়সালা করাবে, আর যার ইচ্ছা ইবলিসের ব্যবস্থা অনুযায়ী ফয়সালা করাবে, এই জন্যেই কি আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন?

আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার ত্যাগ করা

ইমাম ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

> হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়ত পৌঁছেছে যে, একবার হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হজ করেন। তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন– كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ এরপর বলেন, যে ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়া পছন্দ করে, তার উচিত সে যেনো আল্লাহর বর্ণিত এই শর্ত পুরা করে। (অর্থাৎ আমর বিল মারুফ এবং

---

٦١ صحيح البخاري: الجزء ١٤. كتاب تفسير القران' باب كنتم خير أمة أخرجت للناس

নাহি আনিল মুনকার।)[৬২] *[তাফসীরে ইবনে কাসির, সূরা আলে ইমরান : ১১০]*

ইমাম ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি সামনে গিয়ে বলেন–

আর যেই মুসলমান এই বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত থাকল, তো সে ওই আহলে কিতাবের মত হয়ে গেল, আল্লাহ তায়ালা যাদের তিরস্কার করেছেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

তারা পরস্পরকে মন্দ থেকে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত, তা কতইনা মন্দ! *[প্রাগুক্ত]*

ফায়দা : এখানে এ কথাটি আবারও স্মরণ রাখবেন যে, হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পবিত্র কুরআনের আয়াত كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ তিলাওয়াত করেন। সুতরাং এখানে আমর বিল মারুফ দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলামের হুকুম আর নাহি আনিল মুনকার দ্বারা উদ্দেশ্য কুফর থেকে বাধা প্রদান। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'আল ইতকান ফি উলূমিল কুরআন' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আবুল আলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

কুরআনের প্রতিটি আমর বিল মারুফ দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলাম। আর নাহি আনিল মুনকার দ্বারা উদ্দেশ্য মূর্তির (গায়রুল্লাহ) উপাসনা।[৬৩]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

কেন তাদেরকে রব্বানী ও ধর্মবিদগণ তাদের পাপের কথা ও হারাম ভক্ষণ থেকে নিষেধ করে না? তারা যা করছে, নিশ্চয় তা কতইনা মন্দ! *[সূরা মায়েদা : ৬৩]*

---

[৬২] (رواه ابن جرير)

[৬৩] (الاتقان في علوم القران: الجزء ٢. النوع التاسع والثلاثون في معرفة الوجوه والنظائر. للعلامة عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي (المتوفي ٩١١هـ)

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তাদেরকে দাঊদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখে লা'নত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ থেকে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত, তা কতইনা মন্দ! *[সূরা মায়েদা : ৭৮-৭৯]*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

والذي نفس محمد بيده . ليخرجن من أمتي اناس من قبورهم في صورة القردة والخنازير . داهنوا أهل المعاصي . سكتوا عن نهيهم وهم يستطيعون

শপথ সেই সত্ত্বার, যার কব্জায় মুহাম্মাদের জীবন! আমার উম্মতের কতিপয় মানুষ কবর থেকে বানর ও শূকরের আকৃতিতে বের হবে। (এরা হবে সেই মানুষ) যারা পাপীদের সঙ্গে চাটুকারিতার মাধ্যমে কাজ করবে (তাদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে না)। আর শক্তি থাকা সত্ত্বেও নাহি আনিল মুনকারের ব্যাপারে চুপ থাকবে।[৬৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إن القوم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه . والمنكر فلم يغيروه . عمهم الله بعقابه

কোনো জাতি যখন কোনো জালেমকে জুলুম করতে দেখেও বাধা দেয় না। তারা অন্যায় কাজ হতে দেখেও তা প্রতিরোধ করে না,

---

[৬৪] تفسير الدر المنثور في التأويل بالمأثور : الجزء ٣. في تفسير سورة المائده : ৭৯৭৮. للعلامة عبدالرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي. تفسير روح المعانى في تفسير القران العظيم والسبع المثاني : الجزء ৫. في تفسير سورة المائده : ৭৯৭৮ للعلامة شهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسيني الألوسيز

আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর ব্যাপক (আ'ম) আযাব চাপিয়ে দিবেন।[৬৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ، فليسومونكم سوء العذاب ، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم . لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم....

তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ অবশ্যই দিবে এবং মন্দ কাজ হতে অবশ্যই বাধা দিবে। অথবা আল্লাহ তায়ালা তোমদের উপর নিকৃষ্ট মানুষ চাপিয়ে দিবেন, যারা তোমাদেরকে নিষ্ঠুর শাস্তি দিবে। তখন তোমাদের ভলো মানুষেরা দুআ করবে, কিন্তু তাদের দুআ কবুল করা হবে না। তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ অবশ্যই দিবে এবং মন্দ কাজ হতে অবশ্যই বাধা দিবে। অথবা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর এমন মানুষ পাঠিয়ে দিবেন, যারা তোমাদের ছোটদের প্রতি দয়াশীল হবে না এবং বড়দেরকে সম্মান করবে না।[৬৬]

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউশা বিন নুন আলাইহিস সালামের নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে, তোমার কওমের চল্লিশ হাজার নেককার এবং ষাট হাজার গুনাহগারকে ধ্বংস করব। হযরত ইউশা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহ! গুনাহগারদেরকে ধ্বংস করবেন, তা তো বুঝলাম। কিন্তু নেককারদের ধ্বংস করবেন কেনো?

আল্লাহ তায়ালা উত্তর দিলেন, আমি যাদের প্রতি রাগান্বিত হতাম, এরা (এসব নেককাররা) তাদের উপর রাগান্বিত হত না। এরা তাদের (গুনাহগার) সাথে পানাহার করত।[৬৭]

---

[৬৫] مسند أبي يعلى : الجزء الاول. مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أحمد بن علي بن المثنى أبويعلى الموصلي التميمي

[৬৬] العقوبات لابن أبي الدنيا : الجزء الاول

[৬৭] الأمر بالمعروف النهي عن المنكر لابن أبي الدنيا. عبدالله بن محمد ين عبيد الرسي البغدادي (২০৮-২৮১هـ)

أوحي الله الي نبي من أنبياء بني اسرائيل : قل لقومك : لا يدخلوا مدخل أعدائي ولا يطعموا مطاعم أعدائي ولا يركبوا مراكب أعدائي فيكونو أعدائي كما هم أعدائي

আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলের এক নবীর নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে, আপনি আপনার কওমকে বলুন, তারা যেন আমার দুশমনদের প্রবেশের স্থানে প্রবেশ না করে। আমার দুশমনদের পানাহারের জায়গায় পানাহার না করে। আমার দুশমনদের বাহনে যেনো আরোহনও তারা না করে। (যদি এমন করে) তাহলো তারা আমার অন্যান্য দুশমনদের মতই দুশমন হয়ে যাবে।[৬৮]

عن مالك بن دينار قال : قرأت في التوراة من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه

হযরত মালিক বিন দিনার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি, যার প্রতিবেশি কোনো খারাপ কাজ করে, আর সে তাকে তা থেকে বাধা দেয় না, তবে তাকেও ওই খারাপ কাজের শরিক মনে করা হবে।[৬৯]

আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারের প্রতিদান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

জালেম শাসকের বিরুদ্ধে ইনসাফের কথা বলা উত্তম জিহাদ।[৭০]

এর দ্বারা উদ্দেশ্য সেই হক যা ওই শাসকের কাছে খারাপ লাগে। কিন্তু 'আইনের সীমা'র ভেতর থেকে যদি 'হক' বলার অনুমতি তাগুতি আইন দিয়ে থাকে, এরপর যদি হক কথা বলেন, তবে সে এই হাদীসের ফযিলত পাবে না। কারণ এই হাদীসে ফযিলত বলছিল, এটা এমন হক, যা বলার কারণে জীবন যাওয়ার আশঙ্কা রণাঙ্গন

---

[৬৮] –প্রাগুক্ত

[৬৯] –প্রাগুক্ত

[৭০] سنن أبي داؤد : الجزء ১১. كتاب الملاحم. باب الامر والنهي

থেকেও বেশি থাকে। কেননা ইসলামে প্রতিদানের আধিক্যতা কষ্ট ও বিপদের আধিক্যতার কারণে হয়ে থাকে।

> يكون في أمتي قوم يصيبون من الأجر مثل ما أصاب أولهم يقاتلون أهل الفتنة وينكرون المنكر
>
> আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটা কওম থাকবে, যারা পূর্বের উম্মতের মত প্রতিদান পাবে। (এরা হবে সেই সব লোক, যারা) ফিতনাকারীদের সাথে কিতাল করবে এবং অন্যায়কারীদেরকে বাধা দিবে।[৭১]

আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের সর্বোচ্চ স্তর : কিতাল

ইমাম কাফাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

অন্যান্য উম্মতের উপর এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল, এই উম্মত আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের সর্বোচ্চ স্তর অর্থাৎ কিতালের উপর আমল করে। কারণ আমর বিল মারুফ কখনো অন্তর দ্বারা হয়, কখনো মুখ দ্বারা হয় আর কখনো হাত দ্বারা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী স্তর হল কিতাল। কেননা কিতালে জীবনকে হুমকির মধ্যে ফেলতে হয়। সব চেয়ে মারুফ ও ভালো কাজ হল দীন, তাওহীদ এবং রেসালাতের উপর ঈমান আনা। আর সবচেয়ে মুনকার ও মন্দ কাজ হল আল্লাহর দীন অস্বীকার করা। তো জিহাদের মাধ্যমে দীনকে সবচেয়ে ক্ষতিকর জিনিস (কুফর) থেকে রক্ষা করা হয়। যাতে মানুষ সবচেয়ে বড় লাভ, দীন পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। বিধায় ইবাদতের মধ্যে জিহাদের মর্যাদা মহান হওয়া অনাবশ্যক। তো জিহাদ যখন (যা ইবাদাতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং মহান) আমাদের শরীয়ত অর্থাৎ শরীয়তে মুহাম্মাদীতে অন্যান্য শরীয়তের তুলনায় অধিক গুরুত্ব ও শক্তির সাথে পাওয়া গিয়েছে, বিধায় নিসন্দেহে এটা অন্যান্য উম্মতের উপর আমাদের উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। *[তাফসীরে কাবীর : ৮/১৯৩]*

ইমামুল হারামাইন রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইরশাদ করেন–

আমার নিকট এ ব্যাপারে অধিক উত্তম মত হল যা উসিলবিদগণ বলেছেন। তা হল, জিহাদ একটি ‘কহরি দাওয়াত’। (অর্থাৎ ইসলাম এমন একটি দাওয়াত, এমন একটি আহ্বান, যার পিছনে একটা শক্তি কার্যকর থাকে।) এ জন্য যত বেশি সম্ভব

---

[৭১] الفردوس بمأثور الخطاب : الجزء ٥. ص৪৫৪' لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمداني الملقب الكيا (٤٤٥-٥٠٩هـ)

(জিহাদ) করা উচিত। পৃথিবতে হয় মুসলমানরা থাকবে না হয় যিম্মিরা (যে কাফের ইসলামী হুকুমতকে ট্যাক্স দিয়ে থাকে) থাকবে।[৭২]

এই উম্মতের নিদর্শন : বক্ষে কুরআন কাঁধে তলোয়ার

শরহে সিয়ারে কাবীর গ্রন্থে রয়েছে, তাওরাতে এই উম্মতের এই বৈশিষ্ট্যবর্ণনা করা হয়েছে–

أناجيلهم في صدورهم' وسيوفهم على عواتقهم

কিতাবুল্লাহ থাকবে তাদের বুকে আর তলোয়ার থাকবে তাদের কাঁধে।[৭৩]

যেই দাওয়াত ও শরীয়তে জিহাদের প্রকৃতি-মানসিকতা সবচেয়ে বেশি এবং উচ্চ মানের পাওয়া যাবে, সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াত এবং সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ শরীয়ত। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে এভাবে বলেছেন–

সমস্ত শরীয়তের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ শরীয়ত হল যাতে জিহাদের হুকুম রয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা, যিনি তাঁর বান্দাদেরকে কিছু কাজ করার আর কিছু কাজ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দৃষ্টান্ত এমন যে, যেমন এক ব্যক্তির গোলাম অসুস্থ। সে তার কাছের মানুষদের মধ্যে হতে একজনকে ওই গোলামকে ওষুধ খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এখন সে যদি ওই অসুস্থ গোলামকে জোর করে তার মুখে ওষুধ ঢেলে দেয়, তবে তার এই কাজকে অসৌজন্যমূলক মনে করা হবে না। তবে স্নেহ ও ভালোবাসার দাবি হল, আগে তাকে ওষুধের উপকারিতা বর্ণনা করা, যাতে সে খুশি মনে তা পান করে।

কিন্তু এমন অনেকেই রয়েছে, যাদের ভেতর ক্ষমতার মোহ, নেতৃত্বের লোভ, প্রবৃত্তির তাড়না, অনৈতিক স্বভাব এবং শয়তানি কুমন্ত্রণা প্রবল থাকে। পূর্ব পুরুষের প্রথা-ঐতিহ্য তাদের ভেতর গভীরভাবে বদ্ধমূল থাকে। এই শ্রেণীর লোকেরা এ ধরনের উপকারিতার বাণী কানে তোলে না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, তা নিয়ে চিন্তা করে না এবং তার উপকারিতা নেয়ে ভাবে না। এই শ্রেণীর মানুষদের ক্ষেত্রে দয়ার দাবি হল, শুধু উপকারিতার কথা বলেই ক্ষ্যান্ত না হওয়া বরং তাদের সাথে কঠোরতাও করা, তিতা ওষুধ যেমন

---

[৭২] روضة الطالبين وعمدة المفتين : الجزء الاول. ص : ٢٠٩' محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي

[৭৩] شرح الكبير : الجزء الأول. باب فضيلة الرباط' للامام الأئمة أبوبكر محمد بن أبي سهل السرخسي شمس الأئمة

জোরপূর্বক পান করানো হয়। আর এটাই তাদের প্রতি দয়া। আর পরাজিত করার পথ হল, যে বেশি দুষ্ট হবে, তাকে তেমন শক্তি দিয়েই হত্যা করা। অথবা তাদের ক্ষমতা ও শক্তিকে নির্মূল করা। তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া, যাতে তারা একদম কাবু হয়ে যায়।

এই সুরতে তাদের অনুগামী ও বংশধরেরা সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের সাথে ঈমান গ্রহণ করবে। (যেমন মক্কা বিজয়ের পর হয়েছিল। –লেখক) কারণ নেতারা কেবল তাদের নেতৃত্ব রক্ষার জন্যই তাদের প্রজা ও অনুগামীদেরকে হক ও সত্য থেকে বিরত রাখে। এ বিষয়টিই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমের কায়সারের নিকট লিখে পাঠিয়েছিলেন যে তোমার হাতেই (তোমার) সেবকদের বিপদ। এজন্য অনেক সময় মানুষকে পরাজিত করা তার ঈমান গ্রহণের কারণ হয়। এদিকেই হাদীসের ভেতর ইঙ্গিত রয়েছে।

عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, কিয়ামতের দিন যাদেরকে শিকল পড়িয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।[৭৪] তা ছাড়া আল্লাহ তায়ালার তাদেরকে হকের দিকে হিদায়াত দেয়া এবং জালেমদের থেকে নিস্কৃতি দেয়া মানুষের জন্য আল্লাহর পরিপূর্ণ রহমত।

হযরত শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এরপর বলেন–

কুরাইশ এবং আরবদের থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা সত্যের দিক থেকে সবচেয়ে দূরে ছিল। দুর্বলদের প্রতি নির্মম জালেম ছিল এবং নৃশংসভাবে পরস্পরের রক্তপাত ঘটাতে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে জিহাদ করেন এবং তাদের অবাধ্যদেরকে, যারা ছিল ক্ষমতাবান এবং বজ্জাত, তাদেরকে হত্যা করেন। অবশেষে আল্লাহর হুকুম প্রাকাশ হয় এবং সবাই নবীজির ফরমাবরদার হয়ে যায়। এদের বিরুদ্ধে যদি শরীয়তে জিহাদের নির্দেশ না থাকত, তবে তারা কিভাবে রহমত (ঈমান গ্রহণ করা। –লেখক) লাভ করত? এরপর আল্লাহ তায়ালা যখন আরব-আজমের উপর নারাজ হলেন, তাদের সম্পদ ও রাজত্ব নিশ্চহ্ন করার নির্দেশ দেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সাহীবদেরকে হুকুম দিলেন, তোমরা এ পথে লড়াই কর, যাতে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূরণ হয়। (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দীন বিজয়ী করে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। –লেখক) তাঁরা এ বিষয়ে ফেরেশতাদের মত হয়ে গেলেন। তারা আল্লাহর নির্দেশ পুরা করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন।

---

[৭৪] صحيح البخاري : ١٠ 'كتاب الجهاد والسير' با الأساري في السلاسل

কেউ এই প্রশ্ন করতে পারেন যে, মানুষকে হত্যা করা এটা কেমন ভদ্রতা? এর জবাবে শাহ সাহেব রমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

তাদের এই আমল (কিতাল) সমস্ত আমলের মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ। তাদের সাথে হত্যা সম্বন্ধযুক্ত হয় না। বরং এর সম্বন্ধ নির্দেশদাতার সাথে হয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ

> তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হত্যা করেছেন। *[সূরা আনফাল : ১৭]*

এ ছাড়া জিহাদ এবং দাওয়াত বিষয়ে মুহাদ্দিস ও ফুকাহায়ে কেরাম অনেক সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এখানে তার অবকাশ নেই। এখানে কেবল জিহাদের ফযিলতের কারণগুলো আলোচনা করা হচ্ছে।

জিহাদের ফাযায়েলের কারণসমূহ

এই আমল উত্তম হওয়ার অসংখ্য কারণ কুরআন এবং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমরা শুধু জিহাদের ফাযায়েলের কারণগুলো আলোচনা করব।

জিহাদের ফাযায়েলের কারণসমূহের দিকে ইঙ্গিত করে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'ازالة الخفاء' গ্রন্থে বলেন–

জিহাদের ফাযায়েলের ভিত্তি কয়েকটি উসুলের উপর :

১. জিহাদে তাদবীরে ইলাহী (আল্লাহর ব্যবস্থাপনা, পৃথিবীতে আল্লাহর নিযাম ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করা) এবং তার ইলহাম (আল্লাহ তায়ালা যখন পৃথিবীতে কোনো কাজ করাতে চান, তা তার কোনো বান্দার অন্তরে উদয় করে দেন যে, তুমি এই কাজকর) উভয়টি বিদ্যমান রয়েছে। (অর্থাৎ ইবাদতও।) এজন্য জিহাদ করা অফুরন্ত রহমত লাভের কারণ। আর এই যুগে (অর্থাৎ শাহ সাহেবের জামানায় যখন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহলে বর্তমান সময়ের ব্যাপারে কেমন মনে করেন? –লেখক) জিহাদ ত্যাগ করা বড় নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকা।

২. জিহাদ একটি কঠিন এবং ক্লেশজনক আমল। এই আমলে অনেক কঠিন কষ্ট সহ্য করতে হয়। জান-মাল কুরবান করা এবং বাড়ি-ঘর ছাড়তে হয়। এমন কঠিন আমল কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে, আল্লাহর দীনের উপর যার অকপট ঈমান

রয়েছে এবং দুনিয়ার বিপরীতে আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছে। আর আল্লাহর উপর রয়েছে পরিপূর্ণ ভরসা এবং আস্থা।

৩. এমন ইচ্ছা (জিহাদ) অন্তরে ঠাঁই তখনই নেয়, যখন ফেরেশতাদের সাথে তাদের সাদৃশ্যতা অর্জিত হয়। (শাহ সাহেব এটাকে মুজাহিদদের মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছেন, শর্ত বলেননি)।

৪. জিহাদ শাআয়িরে ইলাহী (নামায মসজিদ ইত্যাদি) দীন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির সমস্ত কাজ হেফাজতের মাধ্যম।

শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এগুলোকে জিহাদকারীদের ফাযায়েলের কারণ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই বন্দাদের এত ফযিলত ও মর্যাদার কথা কেনো বলেছেন? যারা জিহাদ করেন, আল্লাহর নিকট তাদের এত বেশি ফযিলত যে, ফেরেশতাদের সাথে তাদের সাদৃশ্যতা হয়। শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এগুলোকে মুজাহিদদের ফযিলতের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, শর্ত হিসেবে নয়।

আফসোস, মুসলমানরা শাহ সাহবের বর্ণনাকৃত ফাযায়েলকে জিহাদের শর্ত মনে করে বসে আছে।

হিন্দুস্তানের মুসলমানদের উপরও জিহাদ ফরযে আইন

দিল্লির জমিনের উদর থেকে কি আর কোনো শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী পয়দা হয় না, যিনি হিন্দুদেরকে খেলাফতের বিস্মৃত সবক স্মরণ করিয়ে দিয়ে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করবেন?

দিল্লি থেকে উঠে বালাকোটে রক্ত-মাটিতে একাকার হয়ে যাওয়া জামাতের কোনো ওয়ারিশ কি আর বেঁচে নেই, যে নাকি কুফরি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাস্তায় জীবন কুরবান করার চেতনা লালন করে?

ইউপির মাটিতে কি এমন কোনো মা নেই, যিনি তার সন্তানদেরকে সেই ঘুম পাড়ানি গান শোনাবেন, যা শুনে যুবকেরা পর্যটনকেন্দ্র ও খেলার মাঠ ছেড়ে শামেলীর ময়দান প্রস্তুত করবে?... (শামেলীতে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।

বিহারের মাটি কি এতই অনুর্বর হয়ে গিয়েছে যে, আজিমাবাদের মুজাহিদদের মত আরেকটি জামাত তৈরি করার যোগ্যতা নেই?

বাংলার মাটির উপর কোন কাফেরের নজর লেগেছে যে, আরেকজন সিরাজুদ্দৌলার দর্শন থেকে বঞ্চিত?

দক্ষিণ হিন্দুস্তানের মুসমানরা শেরে মাইসুরের সেই বাক্যকে ভুলিয়েই দিয়েছে, যা শুনলে আজো কাফেরদের আত্মা কেঁপে ওঠে...!

গুজরাটের মাটি, যেখানে মুসলমানদের প্রথম পা পড়েছে, যেখানে কুফর ও শিরকের শ্লোগানের বিপরীতে তাকবিরের ধ্বনি প্রথম গুঞ্জরিত হয়েছে। সেখানকার কি হল যে, তাকবির তো এখনও হচ্ছে কিন্তু সোমনাথ কেঁপে উঠছে না কেন...???

এই প্রশ্নগুলো এমন, যা ইতিহাসের একজন ছাত্রের হিন্দুস্তানের মুসলমানদেরকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার রয়েছে। আজ যখন পৃথিবীর সর্বত্র জিহাদের আওয়াজ বুলন্দ হচ্ছে, প্রতিটি দেশের মুজাহিদ আফগানিস্তানে জিহাদে শরিক হওয়ার পর নিজ নিজ দেশে আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করার জন্য জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। তখন বিশ্ব জিহাদী নেতৃত্ব হিন্দুস্তানের ওলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে এ কথা জিজ্ঞাস করার অধিকার রাখে যে, হিন্দুস্তানের মুসলমান, প্রত্যেক যুগে ইসলামের দুশমন শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেছে। ওলামায়ে হিন্দ ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, পৈশাচিক নির্যাতন নিপীড়ন সত্ত্বেও জিহাদ ছাড়েনি। কিন্তু আজ কি হল যে, জিহাদের ময়দান হিন্দুস্তানের মুসলমান শূন্য। অথচ হিন্দুস্তানে জিহাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ ফযিলত বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ করেন–

> عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللهُ مِنَ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام
>
> আমার উম্মতের দুটি জামাতের উপর আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুনকে হারাম করেছেন। একটা হল সেই জামাত, যারা হিন্দুস্তান থেকে জিহাদ করবে। আরকেটি হল সেই জামাত যারা হযতর ঈসা বিন মারয়াম আলাইহিমাস সালামের সঙ্গী হবে।[৭৫]

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন–

> وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ
>
> (হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন–) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে

---

[৭৫] سنن النسائي: الجزء ١٠ 'كتاب الجهاد' باب تنني القتل في سبيل الله تعالي غزوة الهند

গযওয়ায়ে হিন্দের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। আমি (অর্থাৎ আবু হুরায়রা রাযি.) যদি সেই জিহাদ পাই, তবে এই জিহাদে আমার জান-মাল সব ব্যয় করব। যদি শহিদ হই তবে 'আফজালুশ শুহাদা' ও উত্তম শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হব। আর যদি ফিরে আসি, জাহান্নাম মুক্ত আবু হুরায়রা হব।[৭৬]

সতর্কবাণী

হিজাদে হিন্দের এই ফযিলত কেবল তারাই পাবে যারা আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করার জন্য হিন্দুস্তান থেকে জিহাদ করবে। আর যদি কেউ নিছক জাতীয় অথবা দেশপ্রেমের কারণে যুদ্ধ করে, তারা এই ফযিলত পাবে না।

সুতরাং হিন্দুস্তানের হে মুসলমানেরা! রহমাতুললিল আলামীন যেই জিহাদের এত ফযিলত বর্ণনা করেছেন, সেই জিহাদ করা কতই না সৌভাগ্যের বিষয়! আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে এই সুযোগ দান করেছেন, আপনারা এই ফযিলত হাসিল করুন। আর হযরত আবু হুরায়ারা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাক্যমালা বলছে– যারা এই জিহাদে শহীদ হবে, তারা উত্তম শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যারা গাজী হয়ে ফিরবে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে।

দিল্লির জামে মসজিদের 'আযমত' আপনাদের অতীত স্মৃতিকে তাজা করে যে এই মাটিতে হিন্দুদের মন্দিরের ঘুণ্টি এবং শিঙ্গার বিজয় নয় বরং তাকবিরের ধ্বনিই চুতুর্দিকে গুঞ্জরিত হওয়া উচিত...।

জামে মসজিদের সামনের লালকিল্লা হিন্দুদের হাতে তোমাদের পরাজিত হওয়া এবং দাঙ্গায় কচুকাটা হওয়ার কারণে রক্তাশ্রু ঝরাচ্ছে। যেই কিল্লায় ব্যালথাকারের পূর্বপুরুষ তোমাদের আসলাফের নিকট জীবন ভিক্ষার জন্য আসত, আজ সেই লাল কিল্লাকে তোমাদের তরুণদের জন্য টর্চারসেলে রূপান্তর করা হয়েছে...।

তোমাদের বিজয়ের প্রতীক কুতুব মিনার, তোমাদেরকে কি এ কথা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট নয় যে, যেই জমিনে একবার মুসলমানদের কদম পড়ে, সেখানে অহর্নিশ মসজিদের শাসনই থাকা উচিত। মসজিদ এবং মসজিদওয়ালাদেরই সেখানে বিজয়ী এবং শাসক থাকা উচিত? কারণ তারাই শুধু আল্লাহকে মানে। বাকি সবাই আল্লাহদ্রোহী। সুতরাং আল্লাহদ্রোহীরা কখনো আল্লাহবিশ্বাসীদের উপর শাসন করতে পারে না, রাজত্ব করতে পারে না। আল্লাহর দুশমনেরা আল্লাহর দোস্তদের থেকে

---

[৭৬] *–প্রাগুক্ত*

অধিক সম্মানিত হতে পারে না। তোমরা রক্তপাত ও মৃত্যুর ভয় কেনো কর? তোমরা তো সেই জাতি যারা পানিপথে একাধিকবার ময়দান শোভিত করেছ...।

আল্লাহ তোমাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন। তোমরা নিজেরাই ফয়সালা কর যে, পানিপথের রক্তপাত ভালো ছিল নাকি আহমাদাবাদ ও সুরতে ঘটে যাওয়া দাঙ্গা...?

হিন্দুদের সামনে মাথা নতকারীরাই বেশি জ্ঞানী, নাকি যারা শামেলীর ময়দানে গিয়ে কালের ফেরাউনের সামনে সিনাটান করে দাঁড়িয়েছিল...?

পদ-পদবী ও ক্ষমতা নিয়ে যারা মুসলমানদেরকে গোলাম বানিয়েছে, তারা তোমাদের আইডল, নাকি যারা তোমাদের আযাদী ও ইজ্জতের জন্য ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছেন... কালাপানিতে জীবন কাটিয়েছেন... জ্বলন্ত লৌহদণ্ডের ছেঁকা সহ্য করেছেন... যারা তাদের মাদরাসাকে হুমকির মধ্যে ফেলেছেন... নিজেদের পদ কুরবানি করেছেন... সহায় সম্পত্তিহারা হয়েছে... কিন্তু এরপরও কাফেরদের গোলামী কবুল করেননি???

বল, কারা তোমাদে আইডল, কারা তোমাদের আদর্শ...!

দুর্বলতা তো তোমাদের আপত্তি হতে পারে না। তোমরা তো এখনো মাইসুরের বাঘকে ভোলোনি...। নিঃশ্বাস চলাচলের নাম তো জীবন নয়...। জীবন তো সম্মান ও আত্মসম্মানের নাম। এ দুটো যদি থাকে আর নিঃশ্বাস ফুরিয়ে যায়, জাতি তবু মরে না, চিরদিনের জন্য অমর হয়ে থাকে...। কিন্তু এ দুটি যদি মারা যায়, তবে সে জাতি বেঁচে থেকেও মৃত... যদিও হাজার বছর নিঃশ্বাস চলাচল করে।

তোমাদের গুরুজন শেরে মাইসুর তো তোমাদেরকে এই রহস্যই বুঝাতে চেয়েছেন। ভারতীয় পুলিশের বুয়েনেটের ছায়ায় কয়েকটা শারিরীক ইবাদত করার নামই যদি ধর্মের স্বাধীনতা হয়, তবে দিল্লি এবং লক্ষ্মৌ'র সেসব আল্লাহওয়ালাদেরও এই স্বাধীনতা ছিল, যারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে বালাকোটে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদতের পিয়ালা পান করেছেন, দূর দেশে সমাধিস্থ হয়েছেন...!

হে যুবক ভাইয়েরা! তোমরা কি বাবরী মসজিদের শাহাদতের দিনকে ভুলতে পারবে? এর পরে ঘটে যাওয়া দাঙ্গা... প্রতিটি ঘরে ঘরে তোমাদের যুবকদের লাশ আর লাশ... হিন্দুদের বিজয়ের দিন... একটু স্মরণ কর! সেদিন হিন্দুদের কেমন আনন্দের দিন ছিল...! মনে হচ্ছিল তারা তোমাদের থেকে হাজার বছেরের গোলামী বদলা নিচ্ছে...। না কখনোই না... তোমরা ভুলতে চাইলেও সেই দিনের কথা ভুলতে পারবে না...। নিজেদেরকে ধোঁকা দিয়ো না...। সেই স্পৃহার কথা স্মরণ কর যখন তোমরা ভারতীয় পুলিশের গুলির সামনে সিনা টান করে অগ্রসর

হচ্ছিলে...। সেই জাগরণ... সেই উদ্যম... সেই ক্রোধ... সেই ঝড়... যা তোমাদের বক্ষে জেগেছিল, তা আবার জাগাতে হবে...। তাদেরকে জিহাদের মাত্র একটা স্ফুলিঙ্গ দেখাতে হবে...। জ্বি হ্যাঁ...! গোটা বিশ্বের মুসলমান আজ এই কুফরি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। আফগানিস্তানকে দেখো...। তালেবান শুধু আল্লাহর মদদের উপর ভরসা করে দুনিয়ার প্রভু আমেরিকা এবং তাদের প্রযুক্তিকে তুষ বানিয়ে দিয়েছে...। গোটা বিশ্বের মুসলমান এই পবিত্র মাটি থেকে জিহাদ শিখেছে এবং নিজ নিজ দেশে আল্লাহর নিযাম ও আইনকে বুলন্দ করার জন্য হিজাদের ময়াদন জীবন্ত করেছে। জিহাদের ময়দান এখন হিন্দের মুসলমানদের অপেক্ষায়... হিন্দের নওজোয়ানদের অপেক্ষায়...।

হে নওজোয়ান! সে সব ভীতুদের কথায় কান দিয়ো না যারা হিন্দুস্তানের শক্তির ভয় দেখায়। জিহাদের শক্তি যদি আমেরিকাকে নাকানিচুবানি খাওয়াতে পারে, তবে হিন্দুদের মত ভীতুরা তোমাদের সামনে কয় দিন দাঁড়াতে পারবে? তা ছাড়া এই বাহু তো তোমাদেরকে বহুবার পরীক্ষা করেছে! এরা শুধু অসহায় দুর্বল শিশু, নারী এবং বৃদ্ধ মুসলমানদেরকে মারতে পারে...। হিন্দু মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে তালেবান এবং ইসলামের মুজাহিদদের মোকাবেলা করা শিক্ষা দেয়নি...। মনে রেখো, হিন্দু একটি ধূর্ত দুশমন। যারা তোমাদেরকে ধূর্ত শ্লোগান দ্বারা তোমাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। ময়দানে এরা তোমাদের মোকাবেলা করতে পারবে না। জাগো...! জাগো...! আল্লাহর জন্য জাগো...! হিন্দুদের গোলামীর শৃঙ্খল থেকে বের হওয়ার জন্য ইজ্জতের রাস্তায় বেরিয়ে আসো...। দিল্লি হিন্দুদের নয়, তোমাদের...। সেখানে হিন্দুদের তরঙ্গা নয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাণ্ডা উড়বে। আমাদের প্রিয়তম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী বাস্তবায়নে সময় সন্নিকটে। তোমরা হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে আর হিন্দুনেতাদেরকে জিঞ্জির পরাতে থাকবে। তোমাদের বুযুর্গ-গুরুজন নেয়ামতুল্লাহ শাহ অলি রহমাতুল্লাহি আলাইহির ভবিষ্যতবাণী– সীমান্ত প্রদেশ এবং উপজাতি কবিলার আত্মমর্যাদাবোধওয়ালা মুসলমান বাহাদুর বাঘের মত উঠবে এবং দিল্লি, দক্ষিণ, পাঞ্জাব এবং গোটা ভারতকে জয় করবে...। জ্বি হ্যাঁ, সীমান্ত ও উপজাতি অঞ্চলে ইনশাআল্লাহ লশকর তৈয়ার হচ্ছে, যারা গোটা উপমহাদেশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত প্রবর্তন করবে।

হে হিন্দুস্তানের যুকেরা! আমাদের সবার মনিব প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথা বলেছেন, তা অবশ্যই সত্য প্রমাণিত হবে। সমস্ত হিন্দু শক্তি এবং ভারতের এসব টেকনোলজি আমার প্রিয়তম সত্য নবীর কথাকে ভুল প্রমাণিত করতে পারবে না। হিন্দুস্তানের মাটিতে আবারও মুহাম্মাদে

আরাবীর ঝাণ্ডা উড়বে। মুজাহিদরা এই মাটি জয় করবেন। তারা এখানে আবার ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবেন...।

তাই এই ফযিলত অর্জন করার জন্য, নিজেকে এই জিহাদে শরিক করার জন্য, জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়। জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সুরতে জিহাদের প্রশিক্ষণ নেয়া প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরয। হিন্দুস্তানের উপর জিহাদ আজ ফরয হয়নি, ইংরেজরা যেদিন হিন্দুস্তান দখল করে, সে দিনই ফরযে আইন হয়েছে। এরপর হিন্দুদের হাতে মুসলমানদের রক্তপাত এই ফরযকে আরও মজবুত করেছে। এরপরও যদি কারো সন্দেহ থেকে থাকে তো বাবরি মসজিদের শাহাদত তো সব দলিলই পূর্ণ করে দিয়েছে...।

আমাদেরকে গণহত্যা করা অথবা আমাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা... আমাদের সহায় সম্পত্তি লুট করা কিংবা আমাদের বোন মেয়েদের সম্ভ্রমহানি করা... এগুলো কয়েকজন কট্টোরপন্থি হিন্দুদের কাজ নয়। এগুলোর সাথে ভারতী রাষ্ট্র অর্থাৎ এন্টেলিজেন্স, বিউরোক্রেসি (Bureaucracy-আমলাতন্ত্র), পুলিশ এবং সেনাবাহিনী– সবাই জড়িত। আমাদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাধার জন্য কখনো কংগ্রেস আমাদের শুভাকাঙ্খি হয়ে ময়দানে আসে। কখনো অন্য কোনো দলকে সামনে আনা হয়। মনে রাখবেন, الكفر ملة واحدة। সমস্ত কাফের এক ও অভিন্ন। সুতরাং এরা শুধু ধোঁকা দেয়ার জন্য মায়াকান্না করে। তা ছাড়া ভেতরে ভেতরে সবাই আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য অথবা আমাদের রক্তধারাকে হিন্দু বানানোর জন্য এক।

আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে, হিন্দুরা এমন নীচু শত্রু, শক্তিই যাদের একমাত্র ভাষা। কমজোর শত্রুদের সাথে দলিল-প্রমাণ বা সংলাপ করা তাদের ধাতে নেই। যে মার খাচ্ছে তাকে আরো মারো... যে দলিত হচ্ছে তাকে আরো নিষ্পেষিত কর...। এগুলোর দ্বারা তারা খুব তৃপ্তি পায়, সুখ অনুভব করে। তোমরা কি ভারতের প্রাচীন বাসিন্দাদের অবস্থা দেখোনি? হিন্দুরা প্রথমে তাদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায়, তাদের অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। বাকিদেরকে জোরপূর্বক হিন্দু বানায়। তাদের জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাদের ইতিহাসকেই বিকৃতি করে ফেলেছে। শেষে তাদেরকে সুইপার এবং চামার সাব্যস্ত করে অচ্ছুত বানিয়ে রেখেছে। তারা যখন এই অবস্থানকেই অবচেতনভাবে মেনে নিয়েছে এবং ব্রাহ্মণরা যখন নিশ্চিত হয়েছে যে, বিদ্রোহের আর কোনো লক্ষণ নেই, এবার তারা এদের জন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে চাকরি কোটা এবং কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়েছে...। যারা তাদের ধর্মও গ্রহণ করে নিয়েছে, তাদের সাথেই ব্রাহ্মণদের এই আচরণ। এবার আপনারা আপনাদের ব্যাপারে তাদের ঘৃণা এবং দুশমনির মান পরিমাণ

অনুমান করতে পারেন। এরা হল মুসলমানদের আদি দুশমন...। আমাদের আর তাদের ইতিহাসই হল শত্রুতার ইতিহাস...।

আমার ভাইয়েরা ধোঁকা খেয়ো না... প্রতারিত হয়ো না...! ক্ষমতা তাদের হাতে। তাদের পলিসি হল, শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রণ...। এই ময়দানে তারা তোমাদেরকে কখনোই সামনে এগুতে দিবে না। উপরে উঠতে দিবে না। তোমরা মুসলমান হয়ে কি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হতে পার? সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে কি তোমাদের স্থান হয়? এ ক্ষেত্রেও তারা তোমাদেরকে ধোঁকা দেয়। গুরুত্বপূর্ণ কিছু উচ্চপদে মুসলমানি নামধারী কাদিয়ানীদেরকে বসায়। যাতে মুসলমানরা তৃপ্ত থাকে, নিশ্চিন্ত থাকে। অথচ যাদেরকে ডিসপ্লে করা হয় এরা তো হিন্দুদের থেকেও নিকৃষ্ট, হিন্দুদের থেকেও বড় মারাত্মক। যারা মুসলমানদের মত নাম ধারণ করলেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমন এবং প্রিয় নবীজির সাথে ধৃষ্টতাকারী। এদের ঘরে ঘরে মন্দির, এরা মুসলমান হতে পারে কি করে?

এজন্য ব্রাহ্মণদের গোলামি থেকে মুক্তি, ভারতীয় জুলুম থেকে আযাদী এবং নিজেদের হারানো সম্মান ও প্রতাপ ফিরে পাওয়ার পথ একটাই– যা ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন। এই উম্মতের যিল্লতির কারণ জিহাদ ত্যাগ করা। যত দিন পর্যন্ত এরা আবার জিহাদের ময়দানে ফিরে না আসবে, তত দিন পর্যন্ত এদের যিল্লতি ও লাঞ্ছনার বিভিষিকা দূর হবে না।

ওই দেখো...! মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি খেত্তা থেকে জিহাদের ডাক তোমাদেরকে পয়গাম দিচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর নতুন ভোর উদয় হয়েছে। শরীরে বিস্ফোরক বেঁধে কাফেরদের সারির ভেতর প্রবেশকারী আত্মমর্যাদাশীল বোনেরা তোমাদের আত্মমর্যাদাকে জাগিয়ে দিচ্ছে যে, হে হিন্দুস্তানের ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা জিহাদের ভেতর এমন শক্তি রেখেছেন, কাফেরদের বিয়াল্লিশটি দেশ মিলেও তার মোকাবেলা করতে পারবে না। প্রভুত্বের দাবিদার আমেরিকা তার অত্যাধুনিক ড্রোন এবং স্যাটেলাইট থাকা সত্ত্বেও তার হেডকোর্য়ার্টার পেন্টাগন এবং কাবুলে বেসক্যাম্প বাগরামকে রক্ষা করতে পারে না...। মাত্র কয়েকজন ফিদায়ী নওজোয়ান আল্লাহর মদদে তা ধ্বংস করতে পারে।

ইয়ামান এবং সিরিয়াকে দেখো...! দজলা ও ফুরাতের (ইরাক) মাটি থেকে ভেসে আসা তারানা শোনো...! আফগানিস্তানের পর্বত কন্দর থেকে তাকবির ধ্বনিরত তোমাদের মুজাহিদ ভাই, অস্ত্র সজ্জিত হয়ে, হাতের তালুতে জীবন নিয়ে, জান্নাতের বিনিময়ে জীবন বিক্রেতা...। নওল কিশোরও রয়েছে, তারুণ্যদীপ্ত যুবকও রয়েছে, তোমাদের মা-বোনেরাও রয়েছে, রয়েছে শুভ্র শ্মশ্রুর এই উম্মতের বয়জেষ্ঠরাও...।

সবাই তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। এরা সবাই হিন্দের মুসলমানদের সাথে রয়েছে। মুহাম্মাদের রবের কসম! একবার তোমরা জিহাদের জন্য দাঁড়িয়ে যাও, দেখবে, ফিলিপাইন থেকে মারাকিশ পর্যন্ত সমস্ত মুজাহিদ তোমাদের সাথে রয়েছে। মক্কা-মদীনার রাজপুত্ররা, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন, মিশর ও লিবিয়া, আলজেরিয়া ও মারাকিশ– সবাই একত্রিত হয়ে এদিক থেকে আসতে থাকবে, যেখান থেকে প্রতি যুগে হিন্দুস্তানে ইসলামের ঝাণ্ডা উড়ানো হয়েছে। খোরাসান, আফগানিস্তান শুধু তোমাদের আহ্বানের অপেক্ষায়। এরপর দেখবে, তোমরা যেখানে অশ্রু ফেলবে, এরা সেখানে রক্ত ঝরাবে। যে সব হাত তোমাদের নিঃস্পাপ শিশু ও নিরাপরাধ মা-বোনদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে, এরা সে সব হাত কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। বদর ও হুনাইনের রবের কসম! এরা নিকৃষ্ট হিন্দুদের জনবসতিকে পানিপথ বানিয়ে দিবেন। আপনারা একবার আপনাদের ভাইদেরকে ডাক দিয়ে দেখুন...। এরা তো তাদের জীবন বিক্রি করেছেই এজন্য যে, যাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লারেম উম্মত হৃত সম্মান ফিরে পায়...। কাফেরদের গোলামী থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর বান্দা হয়। কাফেরদের জীবনব্যবস্থার সাথে বিদ্রোহ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত সত্য জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন যাপনকারী হয়....।

আর বিলম্ব নয়...। আর একজন বোনের ওড়নায় হাত দেয়ার পূর্বেই... জেগে ওঠো...। আর একবার মুসলমানদেরকে একত্রিত করে তেল ঢেলে জীবন্ত পুড়ে মারার পূর্বেই... তোমাদের ভাইদেরকে ডাক দাও...। হে মুহাম্মাদ বিন কাসিম ও গজনবীর সন্তানেরা...! হে আওরঙ্গজেব ও আবদালীর জানেশীনরা...! ওঠো... জেগে ওঠো...। তোমাদের যিল্লতি ও লাঞ্ছনার উপাখ্যান তো অনেক লিখিত হয়েছে। এবার তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের দুশমনদের প্রতিটি জনবসতিকে পানিপথ বানিয়ে দাও। সময়ের দাবি আরেকটি পানিপথ মঞ্চস্থ করা। প্রিয়, এখনি ওঠো...। আল্লাহর ঘর অনেক ধ্বংস করা হয়েছে...। এটা জিহাদের যুগ... জেগে ওঠার যুগ...। জেগে ওঠো... মূর্তিভরা এ সব মন্দিরকে সোমনাথ বানিয়ে দাও...। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রিয় সুন্নাতকে যিন্দা কর। অস্ত্র হাতে নাও আর ব্রাহ্মণদের সামনে ঘোষনা কর...

تکبیر سے کانپ اٹھا صنم خانہ بھارت

اٹھے تھے مسلمان جب اللہ کے سہارے

اک اک بھڑک اٹھے گی جل جائے گا بھارت

برسیں گے مری توپ سے آتش کی شرارے

توحید کے فرزند ابھی شمشیر بکف ہیں

آئیں تو مقابل ذرا ہندو کے دلارے

ہمیں رب شہدائے امت کی قسم ہے

بھارت کو دکھادیں گے جہنم کی نظارے

কে কার জন্য যুদ্ধ করে

ঈমানদাররা শরীয়ত প্রবর্তনের (খেলাফত) জন্য যুদ্ধ করে। আর যারা এই শরীয়ত প্রবর্তনকে অস্বীকার করে অথবা বিরোধিতা করে, তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে।

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

> যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। *[সূরা নিসা : ৭৬]*

আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে যুদ্ধকারীদের স্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করে দিয়েছেন। যারা আল্লাহকে এক বিশ্বাস করে, তার নাযিলকৃত আইন ও সংবিধান সত্য স্বীকার করে, যেই মহান ব্যক্তিত্বের উপর এই আইন ও সংবিধান নাযিল করা হয়েছে, তার উপর ঈমান এনেছে, তবে এটা কি করে হতে পারে যে, তারা এগুলোর জন্য কিতাল করবে না? এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়িয়ে যাওয়া ব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যুদ্ধ করবে না? সুতরাং যার অন্তরে ঈমান থাকবে, সে অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় কিতাল করবে। এমনিভাবে যারা আল্লাহর বিপরীতে অন্য কাউকে ইলাহ ও মা'বুদ মেনেছে, আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে অন্য আইন গ্রহণ করেছে, তারাও অবশ্যই তাগুতের ব্যবস্থার জন্য কিতাল করবে।

বিধায় বিশ্বে চলমান সন্ত্রাসের যুদ্ধে কারো কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, যে যেই নিযাম ও ব্যবস্থা (দীন) বিশ্বাস করে, মানে, সে তার জন্যই যুদ্ধ করছে। যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত এবং তার আনীত ব্যবস্থার উপর ঈমান এনেছে, এবং এর বিপরীত প্রতিটি শরীয়ত ও জীবনব্যবস্থাকে বাতিল মনে করে, তারা শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য কিতাল করছে। আর যারা শরীয়ত প্রবর্তন চায় না, খেলাফত ব্যবস্থা চায় না, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবস্থা

প্রবর্তনে তাদের মৃত্যুদৃশ্য দেখতে পায়, তারা নিজেদের তৈরিকৃত জীবনব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করছে।

উভয় দলের (শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য লড়াইকারী এবং শরয়ীত বিরোধী জীবনব্যবস্থার জন্য লড়াইকারী) ভাষণ বিবৃতি গভীর ভাবে পড়লে এই যুদ্ধ আরো সহজে বুঝে আসবে। অমুসলিম দেশ হোক কিংবা মুসলিম দেশ, উভয় দলের ভাষণ-আচরণ, দাবি-শ্লোগান এবং জীবন যাপন পদ্ধতি দেখে যে কোনো সুবিবেচক মানুষ অতি সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, কে কার জন্য যুদ্ধ করছে?

বাংলাদেশ হোক বা পাকিস্তান, আফগানিস্তান হোক বা ইরাক, সিরিয়া-ইয়ামান হোক বা মিশর এবং পশ্চিমা ইসলামী দেশ, يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারী) এর শ্লোগান, দাবি এবং জীবন পদ্ধতি এক। আর يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ (তাগুতের পথে যুদ্ধকারী) এর শ্লোগান, দাবি এবং লাইফ স্টাইল সবার অভিন্ন।

সুতরাং এই যুদ্ধে কারা হক আর কারা বাতিল, এই বিতর্ক একেবারেই অনর্থক। সারা বিশ্বের তাগুতদের রক্ষিদেরও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী দল (মুজাহিদ) কি চায়? এদের সঙ্কল্প কি?

অনুরূপভাবে তাদেরকেও নিরাশ হতেই হবে যারা এই উম্মতকে জিহাদ থেকে বিরত রাখতে, কুফরির প্রতি অনুগত থাকতে এবং তাগুতের ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার পাঠ দিয়ে যাচ্ছে। এই উম্মত যেই জিহাদকে শহীদদের মাটি, সুসংবাদের ভূমি– আফগানিস্তান থেকে শিখেছিল, তা এখন অনেক স্তর অতিক্রম করে এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, ইহুদী সুদখোরদের বানানো সুদি ব্যবস্থা মুজাহিদদের বন্দুক এবং আত্মোৎসর্গকারীদের আক্রমণে বনিয়াদীভাবেই হুমকির মুখে।

অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জাগরণের যে ঢেউ শুরুহয়েছে, তাকে খেলাফতের চেয়ে নিচের কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বারা ঠান্ডা করা যাবে না। এই উম্মতকে এখন ইবলিসের দাঁড় করানো ব্যবস্থা, দাজ্জালি শ্লোগান এবং অন্তসারশূন্য প্রতিশ্রুতির দ্বারা ভুলানো যাবে না। এই জাগরণের একমাত্র মনজিল খেলাফত...। হয় শরীয়ত না হয় শাহাদত...। খেলাফত পুনর্জীবিত হবেই হবে...।

তাই হক্কানী ওলামায়ে কেরামের নিকট বিনীত দরখাস্ত, জিহাদের রাহনুমায়ীর জন্য, জিহাদকে শরীয়তের রেখাতে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এবং খেলাফতকে সঠিকার্থে দাঁড় করানোর জন্য, তাদেরকে জিহাদের ময়দানে আসতে হবে। মুজাহিদদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, আল্লাহ করলে বিশ্ব কুফরি শক্তিগুলো বেশি দিন ময়দানে মুজাহিদদের মোকাবেলা করতে পারবে না। আল্লাহ

তায়ালা এই উম্মতের উপর রহম করবেন এবং সারা বিশ্বে কুফর লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

এমনিভাবে সাধারণ মুসলমানদেরকেও মুজাহিদদের পাশে দাঁড়ানো উচিত এবং শয়তানের আওয়াজ, মিডিয়ার দূষিত প্রোপাগাণ্ডা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে খেলাফত কায়েমের জন্য নিজেদের জান মাল এবং জবান– সবই ওয়াকফ করা উচিত। খেলাফত কায়েম করা মুজাহিদদের উপর যতটা ফরয, সমান ফরয প্রতিটি মুসলমানের উপরই। কিয়ামতের দিন এর ব্যাপারে সবাইকেই প্রশ্ন করা হবে। আর হক্কানী ওলামায়ে কেরামের সব চেয়ে বড় দায়িত্ব হল, খেলাফতের পক্ষে সাধারণ মানুষের মানসিকতা তৈরি করা, জনমত গড়ে তোলা এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠার পথে যারা প্রতিবন্ধক, তাদের হুকুম স্পষ্টভাষায় বর্ণনা করা।

প্রচলিত বিশ্বব্যবস্থা বিদ্যমান থাকাকালীন মুসলমানরা সুদ থেকে বাঁচতে পারবে না। এই ব্যবস্থায় না মুসলিম ব্যবসায়ী তার ব্যবসাকে বাঁচাতে পারবে, না কৃষক তার জমিন থেকে কোনো কিছু উপার্জন করতে সক্ষম হবে। ক্রমাগত বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে। ন্যায় বিচার অরোণ্যরোদন হবে। কুফরি ব্যবস্থা নিরাপত্তা দেয়ার সামর্থ্যই রাখে না। এই ব্যবস্থা মুসলমানদেরকে যদি কিছু দিতে সক্ষম হয়, তা হল আত্মহত্যা, গণকবর, জনবসতির ধ্বংসস্তূপ। এই উম্মতের কন্যাদেরকে ধরে নিয়ে ৮৬ বছর কাফেরদের কয়েদখানা বন্দিত্ব, তাও এক মিলিয়ন চল্লিশ কোটি মুসলমান বিদ্যমান থাকা অবস্থায়...। এই ব্যবস্থায় নির্লজ্জতা ব্যপকতর হয়, অশ্লীলতা ডালভাত...। রূপ-সৌন্দর্য সস্তা, আত্মসম্মানহীনতার জয়জয়কর...। এই ব্যবস্থা জুলুমকে আর্ট এবং শিল্প বানায়...। ঈমান বিক্রয়ের বিনিময়ে ক্ষমতা দেয়...। যে লজ্জা ও আত্মসম্মান উপহার দেয়, তাকে বিশ্ব এওয়ার্ডে ভূষিত করে...।

তাই স্মরণ রাখবেন, এই যুদ্ধ হল জীবনব্যবস্থার যুদ্ধ। আমরাও এর উপর ঈমান রাখি যে, আমরা এবং সারা দুনিয়ার আমাদের সকল সাথী কারো সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করে না। বরং আমাদের যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর দুনিয়া আল্লাহর ব্যবস্থা অনুযয়ী পরিচালিত হবে। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কুরআন বাস্তবায়তি হবে। আমরা এ কথাও দ্ব্যার্থহীনভাবে স্বীকার করছি যে, আমাদের দুশমনও (বিশ্ব সাম্রজ্যবাদ ও তার জোট) তার উদ্দেশ্যে একদম পরিস্কার। তারাও এজন্য যুদ্ধ করছে যে, দুনিয়াতে এই ইবলিসের তৈরিকৃত গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা, বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থা এবং তাগুতি লাইফ স্টাইল বাকি থাকুক। মানুষ আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে ইবলিসের ইবাদত করুক। বিশ্বের কোনো প্রান্তেই এমনকি গুহা-জঙ্গল ও পাহাড়েও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হোক। কারণে এতেই যে এই ইবলিসি জীবনব্যবস্থার মৃত্যু।

তাই প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা আমার! এই যুদ্ধ কুফর এবং ইসলামের...। এই যুদ্ধ মুহাম্মাদী নিযাম এবং ইবলিসি মিশনের...। এই যুদ্ধ হল লাইফ স্টাইলের...। জ্বি হ্যাঁ, এই যুদ্ধ, লাইফ স্টাইল এবং জীবন পদ্ধতির যুদ্ধ...।

বলুন, এই পৃথিবীকে কিভাবে চালানো হবে... বিচার ব্যবস্থা কেমন হবে... অর্থ ব্যবস্থা কেমন হবে... যার দ্বারা শুধু মুসলমানরাই নয় বরং গরীব কাফেররাও তাদের অধিকার পাবে...?

এগুলো কে ভালো বলতে পারে? তারা, যারা নাকি নিজের মাকেও ব্যক্তি স্বার্থে বিক্রি করে। যারা নিজের মেয়েদেকে উপহার দিয়ে ইবলিসি মিশন সফল করে...। নাকি সেই সত্ত্বা, যিনি এই উম্মতের আনন্দের জন্য সব কষ্ট বুকে ধারণ করেছেন...। যিনি এই উম্মতকে সুখি করার জন্য সব ক্ষত অন্তরে লুকিয়ে রেখেছেন। আপনিই ফয়সালা করুন, ইবলিসের তৈরিকৃত জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী চলে মানুষ সফলতার শীর্ষে পৌঁছতে পারবে নাকি আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা শরীয়ত প্রবর্তন করে?

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! ধোঁকা খাবেন না, প্রতারিত হবেন না। মিডিয়ার কথা কানে তুলবেন না। আপনারা মুসলমান, আপনার জবান কেনো কুফরির পক্ষে চলবে? আপনার সহমর্মিতা কিভাবে ইবলিসি দাজ্জালি শক্তি পাবে? কিয়ামতের দিন কি জবাব দিবেন? কি করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখোমুখি হবেন? রাসূল প্রেমকিদের কাতারে তাকে কিভাবে উঠানো হতে পারে, যে নাকি একটি কথার মাধ্যমে হলেও আমেরিকা অথবা এই তাগুতি গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার জন্য যুদ্ধকারী শক্তির পক্ষে সহযোগিতা করে? ধোঁকা... প্রতারণা... প্রবঞ্চনা... গলাবাজি....। আল্লাহর দোহায় লাগে, এসব গলাবাজিতে কান দিবেন না....। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ জামানায় শয়তানেরা মানুষের আকৃতিতে এসে ওয়াজ করবে, ভাষণ দিবে। সুতরাং তোমরা তাদের বংশ পরিচয় জেনে নিয়ো।

টিভিতে কারা চাপাবাজি করে? কেউ শিয়া, কেউ কাদিয়ানি, কেউ পারভেজি...। কেউ আধুনিক মুরতাদ (স্যেকুলার), কেউ যিন্দিক...। কেউ ইরানে পড়েছে, কেউ ইসরাইলে দুই বছরে কাটিয়ে এসেছে...। কেউ ডেনমার্কের দূতাবাস থেকে ফান্ড নেয়, কেউ আমেরিকায় গিয়ে ইহুদীদেরকে সিজদা করে...। কারো পুত্র গ্রিনকার্ড নিয়ে আমেরিকায় কাফেরদের কুকুর ধোওয়ায়, কেউ আমেরিকা ও ব্রিটেনের ভিসার জন্য 'মুসলিহাত'এর চাদর পরিধান করে হক বাতিলকে মুখে ও কলমে এলিয়ে ফেলতে চায়। কারো শিক্ষক ওহিদুদ্দিন খান, কেউ বা গামেদির খলিফা...। আল্লাহর দোহায়... ধোঁকা খাবেন না, এটা ঈমানের বিষয়... পরকালের ব্যাপার...। ওই দিন কেউ কোনো কাজে আসবে না, উপকারে আসবে না। পথভ্রষ্টরা

পথভ্রষ্টকারীদেরকে গালমন্দ করবে, ধিক্কার দিবে, কিন্তু তা কোনোই কাজে আসবে না...। ওয়ায়েজিন, মুবাল্লিগীন, কায়েদীন... সবাই সেদিন ভোল পাল্টাবে...। সাফ সাফ বলে দিবে, আমরা তো তোমাদেরকে বিপথে নেইনি, তোমাদের ভেতরই তো ভেজাল ছিল, তোমাদের অন্তরেই তো খাদ ছিল।

প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা! অন্তরের খাদ ও ভেজাল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। অন্তরের এই খাদ পরিস্কার করার উত্তম পদ্ধতি হল জিহাদ। অলসতা অনেক হয়েছে, আর বিলম্ব করেন না...। নফসের এই ধোকায় পড়েন না যে, ইমাম মাহদী আসলে জিহাদ করব। পবিত্র কুরআন এই বাহানাকেও অন্তরের খাদ বলেছে।

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً

> তারা যদি সত্যি জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা রাখত তবে কিছুটা হলেও তো প্রস্তুতি নিত। *[সূরা তাওবা : ৪৬]*

সুতরাং জিহাদের প্রস্তুতি তো নিন। এ সময়ের জিহাদের যে প্রস্তুতি এবং যে মাধ্যমে জিহাদ করা হচ্ছে, তার প্রস্তুতি গ্রহণ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। ইমাম মাহদীর যুগে কি অস্ত্র হবে, আমরা তার যিম্মাদার নোই। সে সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞাসাও করা হবে না। আমাদেরকে এ কথাই জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কি করে এসেছো। ঠিক আছে, আপনার কথাই মেনে নিলাম যে, ইমাম মাহদীর সময় তো ক্লাশিংকফ থাকবে না... সুতরাং তা চালানো শিখে লাভ কি? তাহলে আমার প্রশ্ন, তরবারি চালানো কি শিখেছেন? চার পাঁচ কিলো ওজনের তরবারি হাতে তুলে কতক্ষণ ঘুরাতে পারেন? এক হাতে তরবারি আর এক হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে কিভাবে যুদ্ধ করতে পারবেন? অগ্নিঝরা দুপুরে তপ্ত মরুভূমিতে কয়দিন পায়ে হাটতে পারবেন? কখনো বরফ ঢাকা পাহাড়ে থেকে দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা কি রয়েছে? টিভির স্ক্রিন ছাড়া কখনো কি স্বচক্ষে রক্তে রঙিন রনাঙ্গণ দেখেছেন?

হে এক আল্লাহ বিশ্বাসীরা! কথাগুলো আসলে এমনই। যাদেরকে জিহাদ করতে হয় তারা এ কথা চিন্তা করে না যে আগামীকাল ক্লাশিংকভ থাকবে কি থাকবে না। তারা শুধু এটা দেখে যে, তাদের রব আজ কি হুকুম করেছেন। তাদের উপর কি ফরয করেছেন। ব্যাস, তারা শুধু নিজেদের জীবন কিতালের রাস্তায় আল্লাহর নিকট বিক্রি করে দেন। জান্নাতের বিনিময়ে... জান্নাতের দৃশ্য এবং প্রিয়তম প্রভুর দর্শনের আশায়... মহান রবের সাক্ষাতের ব্যাকুল আগ্রহে... মালিকের সাথে ব্যবসা করে... লাভজনক ব্যবসা... যে ব্যবসায় কোনো প্রকার লস নেই... বড় লাভবান ব্যবসা। আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য... আল্লাহর দুশমনদের ব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করার

জন্য... বিলম্ব করো না...। উভয় জগতের বাদশা যেন আবার রাগ করে ঘোষণা না করেন–

إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ

নিশ্চয় তোমরা প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছ, সুতরাং তোমরা বসে থাকো পেছনে (বসে) থাকা লোকদের সাথে। *[সূরা তওবা : ৮৩]*

কারো বসে থাকায় আল্লাহর জিহাদের কোনো ক্ষতি হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা কারোই মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং ওঠো, হে উম্মতে মুহাম্মাদীর নওজোয়ানরা ওঠো...! যেই নবীর ভালোবাসার দাবি কর, তার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বেরিয়ে আসো...। এর মোকাবেলায় দাঁড়ানো ব্যবস্থার রক্ষীরা তাদের ব্যবস্থাকে বাঁচানোর জন্য সর্বত্র লড়াই করে যাচ্ছে...। তারা সবাই জোট বেঁধেছে... ইহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং তারাও যারা মুখে মুখে নবীজির কালেমা পড়ে কিন্তু অন্তর... তাদের জীবন... নবীজির দুশমনদের সঙ্গে রয়েছে...। এরাও শয়তানের ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে যাওয়ার শপথ করেছে...।

প্রিয়, তোমরাও তোমাদের প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিযাম ও জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার শপথ কর...। বিশ্ব জুড়ে একটাই শ্লোগান উচ্চকিত কর.... হয় শরীয়ত, না হয় শাহাদত... হয় শরীয়ত, না হয় শরীয়ত। প্রিয়, সফলতার পথ এটাই ।

ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی اله صلاة أنت لها اهل وهو لها اهل

স মা প্ত

সময়ের অন্যতম ইসলামি স্কলার মাওলানা **আসেম ওমর** দা.বা. ও শাইখ ড. **আব্দুল্লাহ আযযাম** রহ. এর সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি মূল্যবান বই–

- ইমাম মাহদীর শত্রু-মিত্র/ মাওলানা আসেম ওমর
- ইসলাম ও গণতন্ত্র/ মাওলানা আসেম ওমর
- আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি/ শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.
- এসো কাফেলাবদ্ধ হই/ শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.
- যুবক ভাইদের প্রতি বিশেষ বার্তা/ শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.